ঝাড়খণ্ডের ঋষি

কঠোর সাধনাসিদ্ধ ঋষির দীর্ঘ পরিক্রমার পরিপ্রেক্ষিতে
প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ও ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার সার্থক অবদান

পূর্ব্ব-খণ্ড

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীভুবন মোহন মজুমদার, বি, এস্, সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার চৌধুরী

মুদ্রক :
শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত
পুর্বাশা লিঃ, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা-১৩

প্রথম মুদ্রণ :
কার্তিক, ১৩৬৩

প্রচ্ছদপট মুদ্রক :
মোহন প্রেস
২, করিশ চার্চ লেন
কলিকাতা—৯

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

দাম তিন টাকা

দেবঘর-সন্নিহিত কুণ্ডা দেবীনিবাসে অবস্থিতি-কালে

স্বকীয় অনুভূতির অনুসরণে

এই মহামানবের সাধনা-সিদ্ধ দীর্ঘ জীবনায়ন

কথা-সাহিত্যে রূপায়ন করিতে

সাহিত্য-ধর্মী লেখককে যিনি

প্রেরণা দিয়া ধন্য করিয়াছিলেন

সেই স্বনামধন্য সিদ্ধ মনীষি

নিত্য-ধামে অধিষ্ঠিত ঋষির

সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিষ্য ও উত্তরসাধক

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

মহারাজের করকমলে

মহাপুরুষের অবদান-মণ্ডিত

সুপবিত্র লীলা-কুসুমটি

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পিত হইল।

লেখকের কথা

উপনয়নের পর দণ্ডী-ঘর থেকেই সত্যের সন্ধানে দুর্গমপথে পরিক্রমাকারী পরম পথিকৃতের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের দুর্জয় সাধনা অবলম্বনে রচিত দিব্য কাহিনীটির উপর এখানেই উপস্থিত দাঁড়ি টানা হয়েছে। এই দীর্ঘ উপাখ্যানটি পরিক্রমাকারী তাপসেরর "ঝাড়খণ্ডে ঋষি-রূপে" প্রতিষ্ঠার ঘটনাবহুল পটভূমিকা বা পূর্বাভাস মাত্র। এই মহামনীষীর প্রৌঢ় ও পরিণত বয়সের জীবনাদর্শও অমৃতময় অবদানের অভিজ্ঞান স্বরূপ উত্তর খণ্ডটি প্রস্তুতির পথে। কাহিনীটি 'সংহতি' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কার্তিক, ১৩৬৩

বিনীত
শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

—এই লেখকের কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থ—

রাণী লক্ষ্মীবাই (ঝাঁসীর রাণী)	৩৲
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অমৃতবাণী	২৷৹
স্বয়ংসিদ্ধা আদি পর্ব	৩৲
প্রথম পর্ব	৩৲
দ্বিতীয় পর্ব	৪৷৹
স্বয়ংবরা	৪৷৹
কন্যাপীঠ	৩৷৹
আধুনিকা	৩৷৹
বিজয়িনী	৩৷৹
রাগিনী	৪৲
জাতিস্মর	৪৷৹
অগ্রগামী	৪৲
গোটা মানুষ	২৷৹
দুই-ভাই	১৷৹
অপরাজিতা	৪৲
মহাজাতি সংঘ	৪৲
পেশোয়া বাজীরাও (নাটক)	২৲
ঝাঁসীর রাণী (নাটক)	২৲

প্রথম পর্ব

অবতরণিকা

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁর কাহিনী ও অমৃতবাণী দেশের সর্বত্র ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। যুগ-প্রবর্তক মহামানবের আবির্ভাব সার্থক হয়েছে—একদা তাঁর আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে এসেছিলেন কৌতুহলী হয়ে, তারপর দুর্লভবস্তুর সন্ধান পেয়ে সংসারাশ্রমের সম্পর্ক ছিন্ন করে পরম গুরুজ্ঞানে পরম পুরুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের পর তাঁরাই তাঁর অবদান-মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্য এবং বিশ্বাসী ভক্তরূপে সমাজের সকল স্তরে প্রচারে অবহিত হয়েছেন। ধূপের কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু তার অপরূপ সুগন্ধে জনমন মুগ্ধ। এমন সহজ সরল ভাষায় আধ্যাত্মিক কথা এর আগে আর কেউ বলেন নাই। ধর্ম নিয়ে কিসের কলহ—সব ধর্ম সমান তাঁর মতে। আর কি জোরালো যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর কথা প্রতিপন্ন করেছেন। যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে যুগ যুগ ধরে মানুষ কত ভাবে কত কঠোর সাধনা করে এসেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্য কত গ্রন্থ পাঠ করেছেন, ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই নিয়ে কত তর্ক চলে এসেছে, কিন্তু ইনি এক কথায় তেজদৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেন—হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন ; ইচ্ছা করলে তাঁকে দেখা যায়, পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে মনের সকল সংশয় দুর করা যায়। শুধু মুখের কথা নয়, তাঁর পরম শিষ্য উচ্চশিক্ষিত অসামান্য প্রতিভাশালী জড়বাদী নরেন্দ্রনাথের সংশয় দুর করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই, জড়বাদী নরেন্দ্র ঈশ্বরবাদী বিবেকানন্দ রূপে গুরুর প্রসাদে প্রতীচ্যের নানাস্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচার করে বিশ্বের নমস্য হতে পেরেছিলেন।

ঈশ্বরানুভূতির রীতিমত একটা আলোড়ন তুলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মহাপ্রস্থান করলেন, দেশের শিক্ষিত সমাজ, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহী গোষ্ঠী এবং বিশিষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অবস্থাপন্নদের মধ্যেও চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে যায়। যাঁরা ঠাকুরের কথা শুনেছেন, অথচ কোনদিন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বা কলকাতায় তাঁর অবস্থিতিকালে কোনও ভক্তের আলয়ে উপনীত

হয়ে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হবার সুযোগ পান নি—তাঁরাই মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এত বড় এক মহাপুরুষ—স্বয়ং আচার্য কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা যাঁকে দর্শন করে, আলাপ করে, শ্রীমুখের বাণী শুনে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁরাই কেবল বঞ্চিত রহে গেলেন! যাই হোক, সেই থেকে সাধু পুরুষদের প্রতি এই শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবিড় হয়ে ওঠে। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণযুগে এদেশে যেমন শিক্ষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টিসম্পন্ন বহু কৃতী মনীষী প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনই অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ধর্মসাধক মহাপুরুষদেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তাঁরাও সময়োপযোগী উপদেশামৃত বর্ষণ করে জাতিকে সত্যোপলব্ধির সুযোগ দিলেন।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অনবদ্য অবদান অবলম্বন করেই যেন দেশ ও জাতির প্রয়োজন বুঝে আবির্ভূত হলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী। দিব্যকান্তি সৌম্যমূর্তি প্রসন্ন হাস্যমুখ অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ কলেবর এই মহাতাপসটিকে দেখলেই পরমপুরুষ পরমহংস শ্রীশ্রীঠাকু রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি মানসপটে ফুটে ওঠে। অতি বড় নাস্তিকের উদ্দেশ্যে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় কথাগুলি শুনলেই দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ঠাকুরের অমৃতবাণী কর্ণপটাহে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। এই মহাতাপস বালানন্দ ঠাকুরও একদা এক অবিশ্বাসী উচ্চ শিক্ষিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলেন :

> "ভগবান অবশ্য হ্যায়। মনুষ্য চেষ্টা করনেসে ভগবান-কো সাথ্ ভেট হোগা, ইসমে কোই সংশয় নেহি হ্যায়, কুচ্ছ সংশয় নেই হ্যায়। হাম ভগবানকো সাথ আপকো পরিচয় করায় দেনে সেকেগা, পরন্তু হামকো যুক্তি লে কর্ আপকো জরুর পরিশ্রম করনে পড়েগা।"

অবিশ্বাসী শিক্ষিত পদস্থ অনুসন্ধিৎসুর মুখের উপর এই ভাবে দৃঢ়স্বরে ভগবান সম্বন্ধে উপলব্ধিমূলক কথা বলতে পেরেছিলেন বলেই, কালক্রমে সেই উদ্ধত ব্যক্তির দম্ভ চূর্ণ হয়েছিল, অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস কুহেলিকার মত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তাঁর অন্তর মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের দীপ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কঠোর জড়বাদ একদা এই বাঙলা দেশে সংশয়বাদের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যখন

প্রত্যক্ষাতীত পরমার্থকে অস্বীকার করে ধর্মভীরু বিশ্বাসীদের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ-স্বরে প্রশ্ন তুলেছিল—'কোথায় তোদের ঈশ্বর ? ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে কোন্ প্রমাণে আমরা স্বীকার করব ?" তখন অবিশ্বাসীদের ঐ রূঢ় প্রশ্নের উত্তরে উপেক্ষিত ঈশ্বরবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে জীবন্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠ থেকে। তিনিও এই ভাবে দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন সেদিন :

> "হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদে ? ডাকার মত ডাকতে হয়। বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস চাই, জ্বলন্ত বিশ্বাস। এমন বিশ্বাস চাই যে,—কি, ভগবানের নাম করেছি, আমার আবার পাপ ? বিশ্বাসের চেয়ে জিনিস নেই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক পূর্ববর্তী হলেও তাঁর তিরোধানের কিছু পরে ঠাকুর বালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এই বাঙলা দেশে এবং সত্য কথা বলতে কি, বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দই তাঁর মহিমা মাহাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে পরমোৎসাহে তাঁর নাম প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববর্তী হলেও অপেক্ষাকৃত বিলম্বে তাঁর আত্মপ্রকাশের কারণ হচ্ছে, দুর্গম পর্বত-সঙ্কুল ভীষণ নর্মদা-কান্তারে প্রায় পঞ্চাশ বর্ষকাল ধরে তিনি কঠোর তপস্যা ও নর্মদা পরিক্রমায় লিপ্ত ছিলেন। তপঃ সিদ্ধির পর লোকালয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে সদাচারী নিষ্ঠাবান সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে ইনি আবির্ভূত হন। তখনো ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই—জবরদস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল চলেছে। কোম্পানীর স্বৈরাচারী কর্মচারীদের প্রচণ্ড প্রতাপে সমগ্র ভারতের যেন থরহরিকম্প অবস্থা। একটির পর একটি ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে ছলে বলে কৌশলে সার্বভৌম বৃটিশ শক্তির প্রভাবাধীনে এনে কুখ্যাত বড়লাট ডালহৌসি সারা ভারতে শিহরণ তুলেছেন। তথাপি, মধ্যভারতে মারাঠা শক্তির কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছিল—একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। মহারাজাধি-রাজ বিক্রমাদিত্যের সমৃদ্ধ রাজধানী উজ্জয়িনী এই সময় সিন্ধিয়া সরকারের

রাজ্যাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গোয়ালিয়র এই প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পেলেও পুণ্যসলিলা সিপ্রা ও দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম মহাকালের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপে উজ্জয়িনী তার প্রাচীন নাম-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। স্বধর্মনিষ্ঠ সারস্বত ব্রাহ্মণকুলেব প্রভাবে উজ্জয়িনী তখনো প্রতিষ্ঠাপন্ন। এই নগরীর একাংশে সারস্বত ব্রাহ্মণপল্লী। স্থানীয় এক বিশিষ্ট ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের ঘরে বালানন্দজী জন্মগ্রহণ করেন। পরমপুরুষ পরমহংসরূপে বিখ্যাত হবার আগে শৈশব ও কৈশোর জীবনে তিনি যেমন "গদাধর" নামে পরিচিত ছিলেন, বালানন্দজীও তেমনি শৈশবে "পীতাম্বর" নামে জনপ্রিয় এবং শৈশবকালীন দুঃসাহস, দুষ্টবুদ্ধি ও হঠকারীতার জন্য প্রতিবাসী মহলে কুখ্যাত হয়ে ওঠেন। আশ্চর্য্য যে, বাল্যকালে ভুতির খাল ও বুধুই মোড়লের শ্মশান প্রভৃতি ভীতিপ্রদ দুর্গমস্থানে গদাধরের অবাধ বিচরণের সঙ্গে উজ্জয়িনীর নিভৃত ও নিষিদ্ধ ভীষণ স্থানগুলিতে পীতাম্বরের অকুতোভয়ে পরিক্রমণের সৌসাদৃশ্যের কাহিনী শুনলে চমৎকৃত হতে হয়।

বাল্যলীলা

এক

মহাপুরুষদের শৈশবকালের খেলা-ধুলা, আচার-ব্যবহার, পড়া-শোনা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারেই কিছু না কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়; এবং সেইজন্য সেগুলি বাল্য বা শৈশব-লীলারূপেই অভিহিত হয়ে থাকে। গদাধরের বাল্য-লীলা সম্পর্কে প্রতিটি কাহিনী বৈচিত্র্যময় ও কৌতুহলোদ্দীপক এবং সেগুলি সর্ব্বজনবিদিত ও সুপরিচিত। পীতাম্বরের বাল্য-জীবনের কাহিনী-গুলির মধ্যেও এমনি বৈচিত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পীতাম্বর যখন আট বছরের শিশু, তখন থেকেই তাঁকে নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকে। এমনি তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর প্রিয়দর্শন আকৃতি যে, দেখা মাত্র তাঁকে কোলে তুলে নেবার আগ্রহ অদম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বালক সহজে কাউকে ধরা দিতে চান না; খাদ্য বা খেলনার প্রলোভন দেখিয়েও পীতাম্বরকে বাধ্য করা কঠিন। অথচ, শাস্ত্র পুরাণের কথা গল্পের মত করে বলতে আরম্ভ করলে তখন তাঁকে অতি সহজেই কাছে পাওয়া যায়। বালক নিজেই কথকের কাছে এসে অতি শান্ত শিষ্ট ছেলের মত গল্প শুনতে বসেন। পক্ষান্তরে, পাঠাভ্যাসে শিশুর অনাস্থা ও অমনোযোগিতা অভিভাবকদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। পড়ার কথা বললেই তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর হতে দেখা যায়; পাঠের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করলেই বালক সহসা এমনি অতর্কিতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেন যে, অনুসন্ধান করে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবকবর্গকে হিমসিম খেতে হয়। বালকের দুঃসাহসও বিস্ময়কর—বড় বড় গাছের চূড়ায় উঠে শাখায় শাখায় লাফালাফি দাবাদাবি করে বলিষ্ঠ বয়স্ক তরুণদের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার করেন। দিল্লীর মত উজ্জয়িনী নগরেও প্রাচীন যুগের বহু ধ্বংসস্তূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করে থাকে। প্রেতের ভয়ে তাদের ত্রিসীমায়ও কেউ যেতে সাহস পায় না। কিন্তু সেই সব স্তূপ মধ্যে জীর্ণ অট্টালিকাগুলি বালক পীতাম্বরের পরম প্রিয় স্থান—নির্ভয়ে একাকী সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করে জীর্ণ অট্টালিকাগুলির কক্ষে কক্ষে তাঁকে পরিভ্রমণ করতে দেখে অতি

বড় সাহসী ব্যক্তিদেরও হৃদকম্প হয়, অথচ বালক পীতাম্বর দিব্য নির্বিকার—ভয় ডরের চিহ্নও তাঁর চোখে মুখে দেখা যায় না।

বালক পুত্রের এই সব আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মা নর্মদা দেবী প্রায়ই আক্ষেপ করেন: ছেলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে, আর যে পারি না ঠাকুর!

পীতাম্বরের মাতার নাম নর্মদা দেবী—সারস্বত দ্বিজবংশের নিষ্ঠাবতী বিধবা। পিতার সংসারেই তিনি প্রতিপালিতা। পিতা দামোদর প্রতিবাসী পুরুষোত্তম নামক স্বধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবার হাতে আদরিণী কন্যা নর্মদাকে সম্প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পীতাম্বর যখন তিন বছরের শিশু, সেই সময় মহাকালের আহ্বানে জামাতা পুরুষোত্তম সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেন। শ্বশুরকুলে অন্য কোন অবলম্বন না থাকায় একমাত্র পুত্র পীতাম্বরকে নিয়ে পিতার আহ্বানে কন্যা পিতৃভবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পিতার সংসারেও বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন অন্য পরিজনও ছিল না। নর্মদা দেবী ভেবেছিলেন, এ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ পিতার পরিচর্য্যা এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে পুত্রের পাঠাভ্যাস সুষ্ঠুভাবেই চলবে। কিন্তু কন্যার যত্নে পিতার পরিচর্য্যা যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে থাকলেও, দৌহিত্রের পাঠাভ্যাস সম্পর্কে মাতামহের প্রচেষ্টা সার্থক হবার পথে পদে পদে বিঘ্ন ঘটতে লাগল। কিছুতেই তিনি পীতাম্বরকে পাঠাভ্যাস মনোযোগী করতে সমর্থ হলেন না। বালক পাঠশালার ছায়াও মাড়াতে চান না, পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো যেন তাঁর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে, বালক পীতাম্বরকে নিয়ে মাতামহ, মা ও পাড়ার প্রতিবাসীদের মধ্যে যেন একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। ওদিকে বালকের জিদও ক্রমশঃ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।

মাতামহের ক্ষোভ—সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, ভগবতী সরস্বতী মাতার ত্যজ্য পুত্র হয়ে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের কলঙ্কস্বরূপ হবেন, এ যে ধারণাতীত ব্যাপার! অথচ পীতাম্বরকে পড়ার জন্য বললে বা পীড়াপীড়ি করলে, তিনি অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন, একটি বর্ণও তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয় না; পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হলে শুধু ধীরে ধীরে ঘাড়টি নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে, পাঠাভ্যাস তিনি করবেন না—পাঠশালায় যাবেন না।

এই সূত্রে একদিন বৃদ্ধেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি পীতাম্বরকে কঠোর কণ্ঠে তিরস্কার করে জানিয়ে দিলেন: আজও তুমি যদি পাঠশালায় না যাও, তোমাকে আর আমাদের গৃহে স্থান দেওয়া হবে না। মূর্খ ছেলেকে কুলাঙ্গার জেনেই আমরা ত্যাগ করব।

বালক পীতাম্বর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে মাতামহের রূঢ় কথাগুলি শুনলেন; তারপর নীরবে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেলেন। মাতামহ ভাবলেন, এবার পীতাম্বর নিশ্চয়ই পাঠশালায় যাবেন। কিন্তু অপরাহ্নে পীতাম্বরকে বাড়ী ফিরতে না দেখে তাঁর মনে সন্দেহ প্রবল হলো। তৎক্ষণাৎ সংবাদ নিয়ে জানলেন যে, অন্যান্য দিনের মত এদিনও পীতাম্বর পাঠশালায় যান নাই।

তিনি গম্ভীরমুখে অন্তঃপুরে গিয়ে কন্যা নর্মদাকে বললেন: শুনেছ মা, তোমার ছেলে আজও পাঠশালায় যায় নি, আর—এখনো পর্য্যন্ত তার ফেরবার নামও নেই। কোথায় গিয়ে সারাদিন কাটালো কে জানে?

নর্মদা দেবী কপালে করাঘাত করে বললেন: আমার পোড়া বরাত। ভগবান এমন সোনারচাঁদ ছেলে দিলেন, কিন্তু মা সরস্বতী ও-ছেলেকে পায়ে ঠেললেন। বামুনের ঘরে এমন মূর্খ ছেলে দেখলে দশজনে বলবে কি? কত বলি, মন্ত্র পড়ানোর মত কত উপদেশ দিই, কিন্তু কিছুই যে ছেলে কানে নেয় না বাবা।

বৃদ্ধ দামোদর শর্ম্মা বলেন: আমাদের কত আশা ভরসার ধন এই ছেলে; রাজপুত্রের মতন চেহারা, আক্কেল বিবেচনারও কমতি নেই; কিন্তু পড়ার কথা উঠলেই মুখ নীচু করবে, আর তুলবে না।

ওদিকে দেখতে দেখতে রাত হয়ে এলো, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত পীতাম্বরের ফেরবার নামও নেই। তখন পিতা পুত্রী উভয়েই অস্থির হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধ তখন প্রতিবাসীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন, আর্তস্বরে বললেন: আমাদের পীতুকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাঠশালায় যাবার জন্য নিষ্ঠুরের মত তিরস্কার করেছিলাম, সেই অভিমানে সে কোথায় চলে গেছে—তোমরা বাপু সন্ধান করে দেখ।

প্রতিবাসীরাও ঘটনাটি জানতেন। তাঁরা বললেন: দেখুন শর্ম্মা ঠাকুর, আপনারা কেবল নাতীর ঐদিকটাই দেখছেন—সে পড়াশোনা পছন্দ করে

না, পাঠশালায় যায় না। কিন্তু তার যে কত গুণ, সে সব কি লক্ষ্য করেন নি? এই বয়সে তার আপন পর জ্ঞান নেই, কেউ কোন বিপদে পড়লে, পীতাম্বর নিজের শক্তির ওজন না বুঝেই তাকে বিপদ মুক্ত করবার জন্য ছুটে যায়। পরের উপকার করবার সুযোগ পেলে আর সে কিছু চায় না। এমন ছেলে কেউ কখনো দেখেছে? তারপর মনে ভয় ডর নেই, সত্যিই ও অদ্ভুত ছেলে। আর, এমন কি বয়স হয়েছে যে পড়াশোনার জন্যে এত গঞ্জনা দেওয়া? এমন ত দেখা গেছে আমাদের সমাজে—উপনয়ন সংস্কার পর্য্যন্ত ছেলে পড়াশোনায় মন দেয় নি, কিন্তু তারপর সে ছেলের বিদ্যের দৌড় সবাইকে অবাক করে দিয়েছে।

বৃদ্ধ তখন অনুতপ্তের মত কাতর কণ্ঠে প্রতিবাসীদের উদ্দেশে অনুরোধ জানাতে থাকেন: আমি এখন আমার ভুল বুঝছি। তোমরা আমার পীতুকে খুঁজে আনো, আর কখনো আমি তাকে পড়ার জন্যে তিরস্কার করব না।

কিন্তু সেই রাতে নগরের নানাস্থানে অনুসন্ধান করেও পীতাম্বরের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের ব্যর্থতার কথা শুনে পিতা পুত্রী উভয়েই শোকে অভিভূত হয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন। প্রতিবাসীরা অবশ্য প্রবোধ দিতে থাকেন: অধৈর্য্য হবেন না, সকাল হোক—আমরা তাকে খুঁজে আনবই। কেঁদে ত কোন লাভ নেই।

পরদিন প্রত্যুষেই প্রতিবাসীরা দামোদর শর্ম্মার বাড়ীতে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পীতাম্বরের অনুসন্ধান সম্বন্ধে পরামর্শ চলেছে। অন্তঃপুরে পিতা পুত্রী মৃতকল্প অবস্থায় পড়ে আছেন, সারা রাত্রি তাঁরা জলস্পর্শও করেন নাই। পল্লীর কতিপয় মহিলা এসে তাঁদের পরিচর্য্যা করছেন; এমন সময় বাহিরে বহু কণ্ঠের মিলিত হর্ষধ্বনি উঠল: পাওয়া গেছে, পীতাম্বরকে পাওয়া গেছে।

তখন উঠি-পড়ি অবস্থায় তাঁরাও বাহির মহলে ছুটলেন।

তখন দেখা গেল, কতিপয় কৃষাণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাদেরই একজনের কাঁধে চড়ে পীতাম্বর বাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত। সেই কৃষাণটিই সবিনয়ে বলল: তাজ্জব কাণ্ড কর্ত্তা। ভোরের সময় আমরা নদীর কিনারা দিয়ে ক্ষেতের দিকে যেতে যেতে দেখতে পেলুম—দাদা ঠাকুর জঙ্গলের মধ্যে খানিক তফাতে পোড়ো ভূতের বাড়ীর ছাদের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আমরা ত ওনারেই ভূত ভেবে ভয়ে চিল্লাতে থাকি। তখন দাদাঠাকুর যেন বাতাসে ভর করে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমাদের সাম্‌নে এসে হাসতে হাসতে বললেন—আমি ভূত নই, তোমাদের দাদা ঠাকুর; সারারাত ঐ বাড়ীতে কাটিয়েছি। এদিকে, দাদাঠাকুর রাগ করে বিবাগী হয়ে গেছেন, একথা আমরাও ত শুনেছি, তাই এনারে সাথে করে এনেছি। এখন দাদাঠাকুরকে সুধাও ত ভূতের বাড়ীতে কেমনে একাটি রাত কাটালেন।

তখন সমবেত সকলেই জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন—এই বয়সে এতটুকু ছেলে কি করে ভূতের ভিটেয় রাত কাটিয়ে এল। সীপ্রা নদীর বাঁকের কাছে জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ বাড়ীখানা জনসাধারণের কাছে ভূতের আস্তানা বলে ভীতিপ্রদ ছিল। দিবাভাগেও কোন সাহসী ব্যক্তি ওর কাছ ঘেঁসে যেতেও কুণ্ঠিত হন। সেই বাড়ীতে পীতাম্বর একলা রাত কাটিয়ে এসেছেন শুনে মা ও মাতামহ দুজনেই শিউরে উঠলেন ভয়ে।

স্নেহের নাতীকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন: করেছ কি দাদু। ভূতের বাড়ীতে সারারাত ছিলে? ভয় করেনি?

হাসিমুখে নির্ভীক বালক উত্তর করলেন: আমার ত ভয় ডর নেই দাদু! সারারাত একাটিই ত ছিলুম সেখানে, কিন্তু কৈ ভূতের দেখা ত পেলুম না। একটা ভূতও ভয় দেখাতে এলো না তো দাদু।

নির্ভীক বালকের কথায় সকলেই চমৎকৃত। দাদু তখন গাঢ়স্বরে বললেন: আর আমি তোমাকে কোনদিন বকবো না দাদু, তুমি আর এমন করে যেখানে সেখানে লুকিয়ে থেকে আমাদের ভাবিয়ো না। তোমার জন্যে আমরা সারারাত খাইনি, ঘুমাইনি, তা জান?

পীতাম্বরও গম্ভীর মুখে বললেন: মিছামিছি আমাকে বোকলে আমার মনেও বড় কষ্ট হয় দাদু, তাই তখনই চলে যাই—যেখানে দুই চক্ষু আমাকে নিয়ে যায়।

মা নর্মদা দেবী এই সময় এগিয়ে এসে বললেন: তাহলে তুই কি ঠাওরেছিস সে-কথা বল্? বামুনের ছেলে হয়ে পড়াশোনা যদি না করবি, তবে কি সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবার মতলব করেছিস্?

বিদ্রূপের সুরে মা যে কথা বললেন, বালকের কানে কি সেই কথাগুলি ঝংকার তুলে সত্যের সন্ধান দিল?

সেইদিন অপরাহ্ণে দামোদর কন্যাকে ডেকে বললেন : দেখ মা, আমি স্থির করেছি শীঘ্রই পীতুর উপনয়ন দেব, তাহলে ও সংযত হবে।

এমনি সময় বালক পীতাম্বর সর্ব্বাঙ্গে ছাই মেখে, একটি নেংটি পরে ও হাতে একটা কমণ্ডলু নিয়ে পরামর্শরত মা ও মাতামহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রাণাধিক পীতাম্বরের এই অপরূপ বাল-সন্ন্যাসী মূর্তি দেখে উভয়েই স্তব্ধভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন। পীতাম্বর, তখন হাসিমুখে মাতার পানে তাকিয়ে বললেন : মায়ী। দেখ্, হাম্ তো সাধু হো গিয়া।

দাদুর মনে তখনো উপনয়নের কথাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ভাসছিল। সেই কথাসূত্রে তিনিও সহাস্যে বলে উঠলেন : এক মাসের মধ্যেই আমি তোমাকে সাধু বানিয়ে ছাড়ছি দাদু!

দুই

দাদুর প্রচেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয়ে পীতাম্বরের উপনয়ন-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হলো। মুণ্ডিত মস্তক দণ্ডধারী গৌরকান্তি বাল-ব্রহ্মচারীর আননে এক দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠল। পীতাম্বর তখন ন'বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

দাদু ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন : কেমন দাদু, কিরকম সাধু বানিয়েছি বল?

ব্রহ্মচারীর প্রসন্ন আননে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল মাত্র, কোন উত্তর তিনি করলেন না। কিন্তু দণ্ডী ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বালকের আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। পাঠাভ্যাসে যাঁর মোটেই মনোযোগ ছিল না, সন্ধ্যা বন্দনার দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ ও নিবিড় নিষ্ঠা দেখে এবং তাঁর মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন উঠল—একি কাণ্ড। তবে কি এটা ওর সহজাত সংস্কার? পাঠশালার পাঠে যাঁর মন কোনদিন নিবিষ্ট হয় নি, শাস্ত্রগত আচার পালনে তাঁর এত নিষ্ঠা আন্তরিকতা ও আগ্রহ—যেন এ একটা রহস্যময় ব্যাপার।

দাদুও নির্বাক দৃষ্টিতে সন্ধ্যা-বন্দনা-রত ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পুরোহিতের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ স্বরে এই শিশুর মুখে সন্ধ্যা মন্ত্র উচ্চারণ শুনে দাদু সন্ধ্যা-বন্দনার শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে

বললেন : একি হলো দাহু ! ব্রহ্মচারী হবার সঙ্গে সঙ্গে সব যে পালটে গেল দেখছি ! এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ কে তোমাকে শেখালে দাহু ?

তথাপি ব্রহ্মচারীর মুখে কথা নেই, হাতের একটি আঙুল তুলে গৃহ-কোণে রক্ষিত শালগ্রাম শিলাকে দেখিয়ে দিলেন। দাহু বুঝলেন, ব্রহ্মচারী যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সঙ্গেই বাক্-সংযমে অভ্যস্ত হচ্ছেন ; তাই কথায় উত্তর না দিয়ে ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন—শালগ্রাম শিলার মধ্যে যে ভগবান বিরাজ করেন, তিনিই তাঁকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ শক্তি দিয়েছেন। দাহুর অন্তর আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

এইভাবে দণ্ডী-ঘরে ত্রিরাত্রি অতীত হলো। চতুর্থ দিন প্রত্যূষে নর্মদা-বক্ষে দণ্ড বিসর্জন দেবার কথা। কিন্তু দণ্ডীঘরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, ঘর শূন্য—দণ্ড নেই, ব্রহ্মচারী নেই, কেবলমাত্র কম্বলের আসনখানির উপর গৈরিকবর্ণের ঝুলিটি পড়ে আছে।

ব্রহ্মচারীর জননী নর্মদা ঠাকুরাণী আকুলকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন : এ কি হলো ? পীতু কোথায় গেল ? আজ যে তার দণ্ড ভাসাবার দিন।

দাহু খবর শুনে ছুটে এলেন ; তাইত, এ যে অদ্ভুত কাণ্ড। ঝুলি রেখে শুধু দণ্ডটি নিয়েই ব্রহ্মচারী দণ্ডীঘর থেকে এই প্রত্যূষে বেরিয়ে গেছেন ! তাঁর বুকের ভিতরটা ঝাঁত করে উঠল।

তখনি চারদিকে সন্ধান চলল। নর্মদা তীরে লোকজন ছুটল, আতি পাতি করে আগেকার মত চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল পল্লীর সকলে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

এইভাবে সারা উজ্জয়িনী নগরে এবং নগরের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে যখন পীতাম্বরের অনুসন্ধান চলেছে, সেই সময় নগর থেকে অনেকখানি দূরে দুর্গম বনপথ ধরে এক বাল-ব্রহ্মচারী দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, তেজোদৃপ্ত তনু, উভয় বাহুমূলে স্বর্ণ বলয়, গলায় হেম হার, যুগল কর্ণে স্বর্ণবৌলী, পরণে গৈরিক বাস, মুখে হাসি, হাতে আচার্য্য দত্ত দীর্ঘ দণ্ড।

জ্ঞানোদয়ের পর শৈশবকালেই পীতাম্বর মাতামহের মুখে নর্মদা-পরিক্রমণের গল্প শুনতেন। এই নর্মদা-পরিক্রমা সাধু জীবনের এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। শত শত ক্রোশ বিস্তৃত এই দুর্গম নর্মদা-ঝাড়ী। দুর্গম গভীর জঙ্গলকেই ঝাড়ী বলা হয়। এক একটি ঝাড়ী বহু দূর বিস্তীর্ণ এবং এক একটি নামে বিখ্যাত।

যেমন—অমরকণ্টক বা মহারণ্য, ওঁকার, শূলপানি। এই সব মহাবনের নাম শুনলেই গৃহীর বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মত এই জঙ্গলগুলির প্রত্যেকটি আগাগোড়া ভ্রমণ করে সমুদ্র পর্যন্ত গেলেই নর্মদা নদীকে প্রদক্ষিণ করা হয়। যাঁরা সিদ্ধ পর্যটক, তাঁরা আবার করেন কি—মহাবনের যে যে অংশ ত্যাগ করে এসেছেন অন্য দিক ধরে, একবার প্রদক্ষিণের পর তারা আবার সেই অংশগুলি পরিক্রমা আরম্ভ করেন, তারপর সেই সেই অংশ দিয়ে অন্য পথে অন্য দিক অবলম্বন করে এগিয়ে যান যতক্ষণ না নর্মদা নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে স্নেহের আহ্বান শুনতে পান। নদীর দর্শন পেলে তখন আর আনন্দ ধরে না, নর্মদা মায়ীর নামে জয়ধ্বনি তুলে ছুটে যান পুণ্যতোয়া নদীরূপিনী মাতৃবক্ষে আশ্রয় নিয়ে অবগাহন করে ধন্য হতে। তারপর নদীব গতির সঙ্গে সঙ্গে সাগর পর্যন্ত গিয়ে পরিক্রমা শেষ করেন।

বালকের বয়স যত বাড়তে থাকে, তাঁর মনে কেবলই এই পরিক্রমার কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরাণের গল্পের মত সাধুদের এই পরিক্রমার গল্পও চিত্তাকর্ষক হ'য়ে তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নর্মদা-পরিক্রমণকারী সাধুসন্তদের কি সম্মান, তাঁদের কি সুন্দর আকৃতি, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব! উৎফুল্ল হয়ে বালক তাঁর মাতামহকে কত প্রশ্ন করেন: আচ্ছা নানাজী, (ও অঞ্চলে ছেলেমেয়েরা মাতামহকে নানাজী বলে সম্বোধন করে—পিতামহকে বলে বাপুজী) তুমি কেন নর্মদা মায়ীকে পরিক্রমা কর নি ?

বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে বলেন: সে ভাগ্য আমার কোথায় দাদু, তাহলে কি আজ আর গৃহী হয়ে তোমাদের নিয়ে ঘর সংসার করতাম ? নর্মদা মায়ীর দয়া না হলে ও কাজটি কেউ করতে সাহস পায় না দাদু।

বালক পীতাম্বর শুধান: কেন নানাজী ?

বৃদ্ধ তখন পরিক্রমার ব্যাপারটি স্নেহের নাতীকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন—কাজটি কত কঠিন। এই যে সুন্দর মনোরম নগরটি দেখছ দাদু, আমরা যেখানে জন্মেছি, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট পুরীগুলির মতন এটিও একটি পুণ্যভূমি। সেকালে এর নাম ছিল অবন্তিকা, একালে এর নাম হয়েছে উজ্জয়িনী। এই ভূমিকে ধন্য করেছেন সলিলরূপিনী দেবী নর্মদা। এঁকে বেঁকে শত শত ক্রোশ বেয়ে এ নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। দু'পাশে

নিবিড় বন, এত ভীষণ আর গভীর যে, যুগ যুগ ধরে মহাবন নামে খ্যাত হয়ে এসেছে ; আর এ বনই হচ্ছে এই প্রদেশ ও নদী নর্মদার গৌরব ও সম্পদ। লোকজনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগরের চেয়ে এই বনভূমির উপরেই নদীমাতার অধিক স্নেহ ও অনুরাগ। এই বন ভেঙে যে সব ভক্ত তাঁর উদ্দেশে এগিয়ে যায় ভক্তি সম্বল করে, তিনিও স্নেহময়ী মায়ের মূর্তি ধরে সঙ্কটের সময় তাদের সাহায্য করেন—বাধা বিপত্তি দুর করে দেন।

বালক পুনরায় প্রশ্ন করেন : তুমি কি করে জানলে নানাজী ?

বৃদ্ধ বলতে থাকেন : যে সব ভাগ্যবান নর্মদা পরিক্রমা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের কাছেই শুনেছি। নিঃসম্বল অবস্থায় এই পরিক্রমা আরম্ভ হয়, পায়ে হেঁটে যাওয়া চাই, রোদে বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা কিম্বা পায়ে পাদুকা দেবার নিয়ম নেই। যেতে যেতে গাছের তলায় কিম্বা কোন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে পারা যায়—তাও রাতটুকুর জন্য। রাত্রি এলেই নর্মদা নদী যেদিকে সেটি অনুমান ক'রে—নদীর দিকে মুখ রেখে বিশ্রাম করতে হবে। যেখানে হিংস্র পশুর ভয়, গাছে উঠে তার ডালে বসে রাত্রিবাস না করে নিস্তার নেই। খুব প্রত্যুষে উঠেই আবার বনযাত্রা। পথে যদি ছোট খাটো নদী পড়ে, পার হবার জন্যে ডিঙ্গি বা নৌকায় উঠলে পরিক্রমা পণ্ড হয়ে যাবে—হয় জল বেয়ে হেঁটে, না হয় সাঁতার কেটে নদী পার হতে হবে। যদি কাছাকাছি লোকালয় পড়ে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় বা আতিথ্য গ্রহণ করবার রীতি নেই। বনের মধ্যে ফল মূল যা পাওয়া যায়—তাই সংগ্রহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে। তবে বনবাসিনী বন্যা নারীরা সময় সময় গাভী দোহন করে এনে পরিক্রমাকারীদের দুগ্ধ পান করিয়ে আনন্দ পান। অনেকের ধারণা, দেবী নর্মদার প্রতি ভক্তি রেখে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিক্রমা আরম্ভ করেন, দেবীর কৃপা থেকে তাঁরা কোন দিনই বঞ্চিত হন না—ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, আপদে বিপদে দেবী নর্মদাই নানা প্রকারে কোন না কোন মূর্তি ধরে সঙ্কট মোচন করে থাকেন।

মাতামহের মুখে এ-সব কথা শুনতে শুনতে বালকের অন্তর আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। ভাবেন—দেবী যখন এত দয়াময়ী, একাগ্র মনে তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে বেরুলে, তিনি যখন আপদ বিপদে সহায় হন, তখন লোকে কেন এ কাজে এগিয়ে যান না ? হঠাৎ একটা কথা মনে উঠতে তিনি

পুনরায় প্রশ্ন করেন : আচ্ছা নানাজী, বনে বনে ঘুরে নদী-মায়ীর তীরে গিয়ে তার সঙ্গে সাগর পর্য্যন্ত গেলেই সাধনার কাজ হয়ে গেল—আর তাঁকে ধ্যান ধারণা সাধনা তপস্যা কিছুই করতে হবে না? বা-রে! এত সহজে সাধু যখন হওয়া যায়, তখন—

বৃদ্ধ সহাস্যে বলেন : কাজটা যত সহজ ভাবছ দাদু, তা নয়। আগেই ত বলেছি, শুধু একটি বার ঘুরে এলেই ঠিক পরিক্রমা হয় না। নদী-মায়ীর তীরের দিক থেকে কোন একটি স্থান থেকে ভ্রমণ আরম্ভ করে বরাবর সমস্ত বনভূমি ভেদ করে যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে, সে পর্য্যন্ত আগে যাওয়া চাই।

বালক অমনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন : কোথা থেকে নর্মদা মায়ীর উৎপত্তি হয়েছে—সে কথা ত আমাকে বলনি নানাজী? সে—কোথায়?

বৃদ্ধ বলেন : সে স্থানটির নাম হচ্ছে অমরকণ্টক—বনে পর্বতে মিশে স্থানটি এত দুর্গম যে, অনেক কষ্ট সহ্য করে আর মায়ীর কৃপা পেলে তবে যাওয়া যায়। এইখানেই নর্মদা নদী পার হয়ে অন্য তীর ধরে আর সব বনভূমির সঙ্গে নদী-মায়ীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে নদীর গতির সঙ্গে সমুদ্র দর্শন করতে হয়—সেখানে নর্মদা নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছেন। ব্যাপারটি মুখে বলতে খুবই সহজ দাদু, কত ক্ষণই বা সময় লাগে, কিন্তু এই পরিক্রমাটি ঠিকমত করতে হ'লে চারটি বছর কেটে যায়—তার আগে হয় না। তারপর, এতে মোটামুটি পরিক্রমা হলো বটে, কিন্তু বিশাল বনভূমির সমস্ত অংশই যে দেখা হলো—একথা বলা যায় না। তাই, এভাবে পরিক্রমার পর—আরও যে সব দুর্গম স্থান রয়েছে, সেগুলিও দেখে শুনে সমস্ত নর্মদা অঞ্চলকে নখদর্পণে দেখতে পান—এমন সাধুও দু একজন দেখা গেছে। আর, তুমি যে ধ্যান ধারণা সাধনা তপস্যার কথা বলছ, এই পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর দয়ায় ওগুলিতে সিদ্ধি পাওয়া যায় বলে শুনেছি। যাঁরা এই পরিক্রমার পর সিদ্ধি লাভ করে সাধু হয়েছেন, তাঁদের মুখেই শুনেছি দাদু—বনের গাছপালা, আকাশ, বাতাস, নদী, ঝরণা, পাহাড় পর্ব্বত—এক কথায় কোলাহলময় নগরের বাইরে অরণ্যময়ী প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকেই তাঁরা পান শিক্ষা। সেই স্বাভাবিক শিক্ষা থেকে যে জ্ঞান সঞ্চার হয়, তাতেই তাঁরা ধন্য হন। তারপর দীক্ষারও অভাব হয় না, দেবীর এমন দয়া যে,

সেই দুর্গম বনেই যোগ্য গুরু এসে দীক্ষা দিয়ে সিদ্ধির পথে ঠেলে দেন। সেইজন্যেই নর্মদা পরিক্রমা করে যাঁরা লোকালয়ে আসেন, তাঁদের তখন সর্বসিদ্ধি লাভ হয়েছে। তাই এ পরিক্রমাই সাধনার একটা মস্ত বড় উপলক্ষ। কিন্তু দাদু—কাজটি খুবই কঠিন, আমাদের মত গৃহীদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমরা এর গল্প শুনেই আনন্দ পাই।

কিন্তু অল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতি বালক পীতাম্বর মাতামহের কাছে সুকঠিন নর্মদা-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ শুনে শুধুই গল্পের আনন্দে অভিভূত যে হননি—শোনা কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সেই সময়ে সেই বয়সেই তাঁকে প্রলুব্ধ করত, নর্মদা তীরবর্তী দুর্গম অরণ্যানী হাতছানি দিয়ে তাঁকে ক্রমাগতই আহ্বান জানাত এবং এইজন্যই অধ্যয়নে প্রচলিত পাঠাভ্যাসে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হ'ত না, পরিজন বা প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কি তখন তা উপলব্ধি করেছিলেন? তখন থেকেই বালক মনে মনে সঙ্কল্প করেন, সুযোগ বা ফুরসদ পেলেই দেবী নর্মদা মায়ীকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে তাঁরই উদ্দেশে এই কঠিন পরিক্রমায় একদিন বেরিয়ে পড়বেন। সকলেই ত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষালাভ করে এই পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হন, তিনি হবেন বয়সের দিক দিয়ে ব্যতিক্রম—শৈশবেই নর্মদা পরিক্রমা করে দেবীকে তুষ্টা করবেন, এক পরিক্রমার পর আর এক পরিক্রমা চালাবেন, তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন তার পরও অতিক্রান্ত হবে এই পরিক্রমায়। বালকের কল্পনায় যেন সমগ্র নর্মদা প্রদেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও ভাবেন, সাধুরা ত বলেছেন, পরিক্রমার পথে স্বয়ং প্রকৃতিই নানা ভাবে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞান দান করে থাকেন, তবে কেন তিনি পাঠশালার অসার শিক্ষায় লিপ্ত হয়ে শৈশবেই মনকে বিকৃত করবেন!

কে জানে তখন, বালকের এই মনোবিকার এবং পাঠাভ্যাসের প্রতি ঔদাসীন্যের মূলে কি অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বালক যে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন, উপনয়ন সংস্কারের পর সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হলো। উপনয়নের পর দণ্ডী-ঘর থেকেই বালক পীতাম্বর সবার অলক্ষ্যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে পদক্ষেপ করলেন।

উজ্জয়িনীর প্রান্তে নর্মদার যে তীর, সেখানেই নদী মাতৃকার উদ্দেশে প্রণাম করে বাল-ব্রহ্মচারী পরিক্রমার কঠোর সঙ্কল্পে ব্রতী হলেন। সহসা বালকের

অন্তরে এক দিব্য ভাবের সঞ্চার হলো। তাঁর গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননীর নামও নর্মদা দেবী, সম্মুখেও রয়েছেন সর্বসন্তাপহারিণী পতিতপাবনী সলিলরূপিনী স্রোতস্বিনী নর্মদা। ভাবাদ্র নয়নে তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপলব্ধি করলেন যে, এঁরা উভয়েই সমান—উভয়েই একাত্মরূপে তাঁর অন্তরকে উদ্ভাষিত করেছেন। মাতৃজঠর থেকে নির্গত হয়ে এতদিন তিনি গর্ভধারিনী মায়ের স্নেহপাশে আবদ্ধ ছিলেন, এখন সেই মাতাই তাঁকে বিবিধ জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে মমতাময়ী মাতৃমূর্তিতেই তাঁকে আহ্বান করছেন। এ অবস্থায় মহামায়ী নর্মদাই তাঁর জননী নর্মদামায়ীর শোকদুঃখ সব মোচন করে অজ্ঞান বালকের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

বাল ব্রহ্মচারীর মনে হলো, তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। দেবী নর্মদা নিশ্চয়ই জননী নর্মদার মনে শান্তি দান করবেন। মনে মনে তৃপ্তিলাভ করে তিনি ক্রমশঃ নগরের উপকণ্ঠ থেকে অরণ্যপথে প্রবেশ করলেন।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে পথচারী ব্রহ্মচারীর পিছন থেকে আহ্বান এলো: ওহে ব্রহ্মচারী, দাঁড়াও; কথা আছে।

তিন

ব্রহ্মচারী পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—আন্দাজ একশো গজ তফাত থেকে ভদ্রবেশধারী এক পথিক তাঁকে আহ্বান করছেন। হৃষ্টপুষ্ট নধর আকৃতি, পরণে শুভ্রবস্ত্র, গায়ে পিরাণ ও তার উপর উত্তরীয়, পায়ে পাদুকা, মাথায় একটা রঙ্গিন কাপড়ের পাগড়ি, বয়স চল্লিশের মধ্যে। উজ্জয়িনীর ভদ্র নাগরিকদের বেশভূষা। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটিকে চেয়ে চেয়ে দেখেও মনে হলো না যে, তিনি পূর্বপরিচিত। তথাপি, লোকটি যখন কথা বলবার জন্য তাঁকে দাঁড়াতে বলেছেন, উচিত ভেবেই তিনি গমনে বিরত হয়ে থামলেন।

একটু পরেই সেই লোকটি নিকটে এলেন। দৃষ্টি তাঁর বালকের দিকে—তার কমনীয় অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কারগুলি বুঝি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিকে লুব্ধ করে তুলেছিল। প্রথমেই তিনি বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে বললেন: তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে নতুন ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারীও তৎক্ষণাৎ তাঁর সংশয় ভঞ্জন করবার উদ্দেশ্যে বললেন: হ্যাঁ, দণ্ডীঘর থেকেই আমি সত্ত বেরিয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক একথার পর ভ্রূকুঞ্চিত করে শুধোলেন: বুঝেছি, দণ্ড ভাসাতে চলেছ। কিন্তু নগরের ঘাট ছেড়ে এই নিবিড় জঙ্গলে সেঁধিয়েছ কেন? এখান থেকে নদী তো অনেক দূরে।

ব্রহ্মচারী গম্ভীর মুখে বললেন: দণ্ড ভাসাবার ইচ্ছা থাকলে নগরের ঘাটেই যেতাম, সঙ্গেও লোকজন বাজনা বাত্ত থাকত। কিন্তু দণ্ড ভাসাব-না বলেই জঙ্গলে সেঁধিয়েছি। শুনিছি, উপনয়নের পর যজ্ঞের দণ্ড জলে না ভাসিয়ে তাকেই সম্বল করে বেরিয়ে পড়াই হচ্ছে প্রকৃত ব্রহ্মচারীর বিধি। কিন্তু সংসার ছেড়ে সকলে তো আর ব্রহ্মচারী হতে পারে না, তাই দণ্ড জলে ভাসিয়ে আবার ঘরে ফিরে যায়, গৃহী হয়।

ব্রহ্মচারীর কথায় ভদ্রলোকের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে তিনি বললেন: তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, শোনা কথায় বিশ্বাস করে ঝোঁকের মাথায় তুমি দণ্ডীঘর থেকে পালিয়ে এসেছ—আর গৃহে ফেরবার মতলব নেই। কিন্তু বাপু, আমার এত বয়স হয়েছে এ পর্য্যন্ত কোন ছেলেকে উপনয়নের পর দণ্ডীঘর থেকে এভাবে দণ্ড হাতে করে পালাতে দেখিনি। দণ্ডীঘর থেকে বেরিয়ে দণ্ডী না ভাসিয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে, এমন ছেলেও নজরে পড়ে নি। তবে যাদের কথা শুনি, সে হচ্ছে নিছক গল্প কথা—চোখে দেখা নয়। ছেলেমানুষ তুমি ঐ সব কথা শুনে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছ, এখন বাড়ী ফিরে চল। আমি বরং তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে রাজী আছি।

এসব কথা শুনতে শুনতেই ব্রহ্মচারীর সুকোমল মুখখানি শক্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথা শেষ হতেই তিনি বললেন: এই সব কথা শোনাবার জন্যেই কি আপনি আমাকে দাঁড়াতে বলেছিলেন? আপনি ভুল বুঝেছেন, ঝোঁকের মাথায় আমি তো আসিনি—নর্মদা মায়ী আমাকে ডেকেছেন, আমি তাঁরই ডাক শুনে বেরিয়ে এসেছি। বেলা হয়ে যাচ্ছে, আপনি আমাকে আর বাধা দেবেন না।

কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলেই ব্রহ্মচারী সামনের দিকে ফিরতেই ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন: তুমি বললে কি আমি বাধা না দিয়েই থাকতে পারি?

যা কখনো হয় না, কেউ যা করে না, তুমি ছোকরা সেই অসাধ্য সাধনে চলেছ। এ যে আত্মহত্যার সামিল। আমার চোখের উপর ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছ দেখে কি আমি কখনো স্থির থাকতে পারি। আমার এখন কর্তব্য হচ্ছে, তুমি যদি আমার সঙ্গে ফিরতে না চাও, তাহলে জোর করে তোমাকে বাধা দেওয়া—চৌকিদার ডেকে কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে যাওয়া। তারপর, তোমার গায়ে যে সব সোনার গহনা রয়েছে, এগুলোই তো তোমার মস্ত দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কথা ভেবেছ কি ? এই গহনার লোভেই দস্যুরা তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। এসব জেনেও আমি কি চুপ করে থাকতে পারি ?

শেষের কথাগুলি শুনেই ব্রহ্মচারীর মনটিও যেন দুলে উঠল। গায়ের গহনাগুলোর কথা এতক্ষণ তাঁর মনে ওঠেনি। তাহলে তিনি সঙ্গে করে আনতেন না—দণ্ডীঘরেই সব ছেড়ে ছুড়ে আরো সহজ হয়ে আসতেন। এখন যাত্রা পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এই লোকটির মুখে গহনাগুলির কথা শুনে তিনি তাঁর বাল্য বুদ্ধিতেই উপলব্ধি করলেন যে, যত গোল এগুলির জন্যই। তাঁর চোখে এগুলি যতই অসার ও অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, এই সংসারী মানুষটির পক্ষে নিশ্চয়ই এসব দুর্লভ পদার্থ। এখন এরাই তাঁর যাত্রাপথের বাধা দূর করে দিক্। মুহূর্ত মধ্যে মনে মনে এই চিন্তা করেই ব্রহ্মচারী সেই ব্যক্তিকে বললেন : দেখুন, আমার অভ্যাস হচ্ছে, যেটি ধরি—সেইটি শেষ করে ফেলা। যে সঙ্কল্প নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কেউ আমাকে তা থেকে নিবৃত্ত করে ফেরাতে পারবে না। কেননা—নর্মদামায়ী আমার সহায়। তবে, আমার গায়ের গহনাগুলোর জন্যে আপনি যখন এত ভাবনায় পড়েছেন, আমি বরং তারই বিহিত করে দিচ্ছি।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই নির্ভীক বালক ব্রহ্মচারী একটি একটি করে সর্বাঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলে বাধাদানের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান স্তম্ভিত মানুষটির সামনে বনভূমির আর্দ্র মাটির উপর অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মত অবহেলার সঙ্গে ত্যাগ করেই দ্রুতপদে চলে গেলেন।

নগরের সুখ-দুঃখ লোভ-লালসা, অভাব-অসচ্ছলতার পরিবেশে যে ব্যক্তির পূর্ণ যৌবনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, স্বার্থের দিকটাই যে লোক বরাবর লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত, একটা অসৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণাই যাকে অলঙ্কারধারী বাল-

ব্রহ্মচারীর অনুসরণে বনপথে আকর্ষণ করেছিল, সেই অপরিচিত ব্যক্তির আসল অভিপ্রায়টি যেন জেনে তারই সম্মুখে এভাবে তাকে অঙ্গের মূল্যবান অলঙ্কারগুলি অকাতরে ত্যাগ করে বন মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে, আগন্তুকের পক্ষে অতি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিছুক্ষণ এই অদ্ভুত ব্রহ্মচারীর যাত্রা-পথের দিকে চেয়ে থেকে নাগরিক ভদ্রলোকটি ভূমি থেকে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি একটি একটি করে তুলে নিজের উত্তরীয় বসনে বেঁধে ফেললেন। তারপর এইভাবে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি ভগবানেরই অভিপ্রেত ভেবে নগরের দিকে দ্রুত পদচালনা করলেন। চলতে চলতে তাঁর মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল—কে এই বালক! আমার মনের গোপন তথ্যটুকু সে কি করে বুঝতে পারল?

উত্তরকালে অসংখ্য ভক্তের অন্তর্নিহিত বাসনা অন্তর্যামীর মত যিনি জ্ঞাত হয়ে তাঁদের কামনা পূরণে সহায় হতেন, সাধনার-পথে পদক্ষেপের প্রথম প্রভাতে অনুসরণকারী লুব্ধ পান্থের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে উপলব্ধি করে চরিতার্থতার সুযোগ প্রদানের বোধ হয় এই সুচনা!

ওদিকে সারাদিন ধরে সহর ও সহরতলির বিভিন্ন স্থানে—যেখানে যেখানে বালক পীতাম্বরের গতিবিধির সম্ভাবনা, তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের পর সন্ধ্যার সময় ব্যর্থমনোরথ হয়ে বাড়ীর ও পল্লীর সকলেই ফিরে এলেন। ব্রহ্মচারীর দণ্ডী-বিসর্জন উপলক্ষে বাড়ীতে কোথায় আনন্দোৎসব হবে, নূতন ব্রহ্মচারীকে পরিবেষ্টন করে আত্মীয় পরিজন প্রীতিভোজের আনন্দ উপভোগ করবেন, সে সবই নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। যাঁর জন্য আনন্দ ও উৎসব, সেই আনন্দময় শিশু সদ্য-ব্রহ্মচারী পীতাম্বরের অন্তর্ধানে যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন সবই পণ্ড হলো।

বৃদ্ধ দাদু ভেবে স্থির করতে পারেন না, কেন এমন অঘটন ঘটালেন ভক্তবৎসল সর্বসন্তাপহারী আনন্দময় মহাকাল মহেশ্বর। তিনি যে উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আরাধনা করে অন্তরে আনন্দের আভাষ পেয়ে তবে না তিনি শুভকার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন। নির্বিঘ্নেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; স্বয়ং সবিতা যেন অগ্নিদেবতার সংযোগে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়ে দিব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে পদে পদে শুভসুচনার আভাষ দিয়েছিলেন; তবে কেন এমন বিভ্রাট

ঘটল। কোথায় গেল তাঁদের পরম প্রীতি ও স্নেহের দুলাল পীতাম্বর—চোখের সামনে পুঞ্জীভূত আঁধারের আবরণ টেনে দিয়ে কোথায় লুকাল সেই চোখের আলো!

ছেলের অতীত কথা সব স্মরণ করে আকুল কণ্ঠে জননী নর্মদার কি মর্মন্তুদ বিলাপ! আক্ষেপ করে বলতে থাকেন: কি কুক্ষণেই আমি তাকে বলেছিলাম,—সাধু হয়ে বেরুবার মতলবেই কি এমনি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস? আমার সেই কথাই কি সে সার বুঝে নিল? নইলে সেই দিনই সর্বাঙ্গে ছাই ভস্ম মেখে আমার সামনে এসে কেন বললে—মায়ী, দেখ্ হাম তো সাধু হো গিয়া!

বৃদ্ধ বললেন: কি ক্ষণে যে কি কথা হয়, আমরা তা বুঝি না। তখন দাদুর কথা শুনে আমোদ পেয়ে হেসেছিলাম আমরা, কিন্তু অন্তর্যামী মহাকাল তাঁর খাতায় সেটা টুকে নিয়েছিলেন। সেই থেকে আমাকে সে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ বয়সে কোন ছেলের মনে যেগুলো ওঠবার কথা নয়। তন্ন তন্ন করে আমার কাছ থেকে সে বারবার নর্মদা অরণ্যের খবর জিজ্ঞেস করেছি'ল। সাধুরা কি করে সে বনে যায়, গেলে কি হয়, সে অরণ্য কত বড়, কোথায় তার গোড়া, আর কোথায় শেষ—এমনি নানান্ কথা। তখনই আমার বুঝা উচিৎ ছিল, দাদু এ সব জানতে চায় কেন? এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি মা, সে শহরে নেই—তাহলে সারাদিন এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারত না।

নর্মদা দেবী আকুলকণ্ঠে বললেন: আমারও এই ভয় হয় বাবা, হয় তো সে মনে মনে এই মতলব করে দণ্ডী-ঘর থেকেই দণ্ড হাতে করে বিবাগী হয়ে গেছে! হয়তো বাবা—

পরের কথাটা মনে উঠতেই মুখে আটকে গেল। অশ্রুমুখী হয়ে পিতার মুখের পানেই বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বৃদ্ধ তখন গাঢ়স্বরে বললেন: যা ভাবছ, হয় তো তাই সত্য হয়েছে মা, দাদু তার দুর্জয় সাহস নিয়ে নর্মদার গহনেই প্রবেশ করেছে!

ব্যাপারটির ভীষণতা উপলব্ধি করে উভয়েই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন—উভয়ের মুখ থেকেই একটা চাপা স্বর দীর্ঘশ্বাসের মত শ্বসিয়ে উঠল।

নর্মদার গহন বন—কি সর্বনাশ! নর্মদা দেবী সরোদনে বলে উঠলেন:

যে বনের নাম শুনলেই ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে, কেউ ওর ত্রিসীমায় ঘেঁষে না, পিতু আমার সেইখানে—উঃ! আর যে ভাবতে পারিনে বাবা!

বৃদ্ধ বললেন: ভেবে বা কেঁদে কি হবে মা, তাকে তো ফেরাতে পারবে না। আগে তো এ চিন্তা মাথায় আসেনি মা—তাহলে সবাই মিলে বনেই সেঁধুতাম। এখন কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরেই সবাই মিলে বনযাত্রার ব্যবস্থা করব, যেমন করে পারি তাকে খুঁজে বার করবই। তুমি মা সন্ধ্যার পুজাহ্নিক সেরে কিছু মুখে দাও।

খাওয়ার নামে নর্মদা দেবী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। আজ যে দণ্ড ভাসিয়ে বাড়ী ফিরে পীতুকে নিয়ে এক সঙ্গে সকলের ভোজন করবার কথা। সেই পীতুর অন্তর্দ্ধানে সবই পণ্ড হয়েছে। ফল মিষ্টি দিয়ে কোন রকমে গৃহ-দেবতার ভোগ নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু গৃহবাসী সকলেই অভুক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অন্ন জল মুখে রুচে না—ক্ষুধাতৃষ্ণাও মনে বেদনা জানায় না। নূতন ব্রহ্মচারীকে ছেড়ে কি করে তাঁরা ভোজনে বসবেন। যাই হোক, প্রতিবাসীরা এসে একান্ত যত্নে ও আগ্রহে কোন প্রকারে এঁদের অনশন ভঙ্গ করালেন। তাঁরা সকলেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রত্যুষেই নর্মদার বনে সদলবলে প্রবেশ করে ব্রহ্মচারী পীতাম্বরের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবেন।

শয্যার আশ্রয় নিয়েও নর্মদা দেবী মনে শান্তি পেলেন না। পুত্র পীতু সম্বন্ধে কত চিন্তাই তাঁকে ক্লিষ্টা ও অভিভূতা করে তুলল। গৃহ মধ্যে তিনি শয্যায় শয়ন করে আছেন, আর তাঁর পীতু হয়ত রাতের আঁধারে দুর্গম জঙ্গলে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে—বনের হিংস্র পশুরা তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। কে তাকে রক্ষা করবে? তারপর, পীতুর গায়ে রয়েছে যৌতুকের জেবর—খাঁটি সোনার অলঙ্কার। লুণ্ঠনকারী নরপশুরা আঁতিপাতি করে শিকার সন্ধান করে বেড়ায়। পীতু তাদের নজরে পড়লে, কি হবে? রাক্ষসরা কি তাকে—

আর ভাবতে পারেন না নর্মদা দেবী। প্রাণাধিক পীতুর সুন্দর মুখখানি মনোমুকুরে ফুটে উঠতেই কেঁদে ফেললেন, সেই কান্নার আবেগে চোখের পাতাগুলিও বুঝি সারাদিনের উদ্বেগ-শ্রান্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে মুদে এলো। সেই অভিভূত অবস্থাতেই তাঁর কণ্ঠ থেকে অস্ফুটভাবে আর্তধ্বনি উঠল:

তুমিই রক্ষা কর মা নর্মদে। পীতু যে নির্ভয়ে তোমার কোলে গিয়েছে—তুমিই মা হয়ে তাকে দেখো, তার সঙ্গে থেকো, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আপদে বিপদে সহায় হয়ো মা!

মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহমমতা দরদ সব নিংড়ে প্রাণভরা আকুতি মিনতি নিঃশেষ করে সমস্তই বুঝি এক সঙ্গে নদীরূপা মহামায়ীর উদ্দেশে সমর্পণ করে তিনি হলেন রিক্তা। এর আগে এমন করে কখনো তিনি পরমেশ্বরীর উদ্দেশে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করেন নি। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শোকমথিত অন্তর যেন সহসা লঘু হয়ে এল, সেই সঙ্গে কে যেন বীণা-বিনিন্দিত স্বরে তাঁর সেই আকুল প্রার্থনার উত্তর দিলেন। কি মিষ্ট সে স্বর। সারা জীবনে তেমন মধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁর কর্ণযুগল স্পর্শ করে নি। সেই অপূর্ব ধ্বনির সঙ্গে যেন একখানি অভয়পাণি উত্থত হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিল : ভয় কি—আমি ত আছি। তুমি যে মা, আমিও ত তাই। তোমার পীতু যে আমারো ছেলে—আমারই আহ্বানে সে এসেছে আমার কোলে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

নর্মদা দেবীর মনে হলো যে, সেই অপূর্ব অভয়বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অপরূপা ক মাতৃমূর্তি সুস্পষ্টভাবে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর রূপের আলোকে ঘরখানি যেন ঝলমল করে উঠল। পরক্ষণেই কমনীয় দক্ষিণ হাতখানি তুলে আহ্বানের ভঙ্গিতে সেই মূর্তি বললেন : এসো।

তেমনি সুমধুর স্বর, কিন্তু এমনি তার আকর্ষণী শক্তি যে চুম্বক-স্পৃষ্ট লৌহের মত তাঁকে তড়িতবেগে তখনি শয্যা ছেড়ে উঠতে হলো। মুখে বাক্য নেই, কথা বলবার শক্তিও বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। টলতে টলতে মূর্তির অনুসরণ করে তিনি চললেন।

ঘরের বাইরে এসে দেখেন, দরজা উন্মুক্ত রয়েছে—কে যেন খুলে রেখেছে। সেই মুক্ত দ্বার দিয়ে পল্লীর পথে নেমে পড়লেন নর্মদা দেবী। পরিচিত পথ, জন-প্রাণীরও অস্তিত্ব নেই। সমগ্র অঞ্চলটি যেন অন্ধকারের বিরাট গহ্বরে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত সমাধিমগ্ন।

পল্লীপথ থেকে ক্রমে নগরীর আলোকিত রাজপথে উপনীত হ'লেন। সারি সারি সুরম্য হর্মরাজি, পথের স্থানে স্থানে আলোক স্তম্ভ। পথের সংযোগ-স্থলে হয়ত কোন নৈশ প্রহরী অর্ধ স্তিমিতনেত্রে বসে বসে ঢুলছে। এ ছাড়া জনমানবের আর কোন নিদর্শন নেই। রাজপথ অতিক্রম করে ক্রমশঃ নর্মদা

দেবী তাঁর অগ্রবর্তিনী নারীমূর্তির অনুসরণে এক আলোকহীন অপরিচিত অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। সাপের মত এঁকে বেঁকে দীর্ঘ পথটি কত পল্লীর ভিতর দিয়ে কত অঞ্চলকে প্রদক্ষিণ করে শেষে জনপদের উপকণ্ঠ পার হয়ে বনের সঙ্গে মিশেছে।

মূর্তি এ পর্যন্ত অগ্রবর্তিনী হয়েই চলেছেন; নর্মদা দেবী বরাবর নীরবে তাঁকেই অনুসরণ করছিলেন দ্বিধাহীনচিত্তে। কিন্তু বন মধ্যে প্রবেশ করেই মূর্তি সহসা অদৃশ্য হলেন। নর্মদাদেবী তখন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাঁর পথপ্রদর্শিকা মূর্তির উদ্দেশে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বনমধ্যে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো ফুটে উঠল। সেই আলোকে নর্মদা দেবী সবিস্ময়ে দেখলেন—মুণ্ডিত মস্তক এক বালক চলেছে সেই বনপথে; তার পরণে পট্টবস্ত্র, কর্ণে কুণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, হাতে দণ্ড। আনন্দে নর্মদা দেবীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল, আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন: পীতাম্বর! পাতু! বাবা আমার!

কিন্তু পাতুর মুখে কথা নেই; মাতৃ আহ্বানে কোন সাড়াই দিলেন না, বুঝি সে আহ্বানবাণী তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে নাই। মাতার মনে জাগল অভিমান। যার সন্ধানে গৃহ ছেড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এই গহন বনে প্রবেশ করেছেন, তাঁর সাড়া পেয়ে সেই স্নেহের সন্তান পীতু ফিরেও তাকাল না! কিন্তু পুত্রের প্রতি মায়ের অভিমানের স্থিতি কতক্ষণ? মনের অভিমান সবলে বুকে চেপে এখন তিনি সন্তানকে কোলে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এমনি সময়, আর এক ঘটনা তাঁকে স্তম্ভিত করে দিল। তিনি চোখ দুটি কপালের দিকে তুলে দেখলেন—সেই বনপথের একাংশে ভদ্রবেশ-ধারী এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্র পীতু গায়ের অলঙ্কারগুলি একটি একটি করে খুলে দিয়ে দ্রুতপদে গভীর বনের দিকে ছুটছে।

মায়ের মনে হলো, যাক সব অলঙ্কার। পীতু দান করতে ভালবাসে, করুক দান—তাতে কি হয়েছে? কিন্তু পীতুকে তো তিনি ছেড়ে যেতে পারবেন না। পুত্রকে ধরবার উদ্দেশ্যে এবার ব্যাকুল হয়ে তার কাছে তিনি ছুটে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু কে যেন অদৃশ্য হাতে তাঁর দুই পায়ে শিকল বেঁধে দিয়েছে—প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিনি পদমাত্র অগ্রসর হতে পারলেন না। এ অবস্থায় পুত্রকে উদ্দেশ করে চীৎকার করতে উদ্যত

হলেন, কিন্তু কণ্ঠও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে—একটি কথাও নির্গত হলো না। ওদিকে তাঁর চোখের উপর পুত্র পীতাম্বর গভীর বনমধ্যে তখন ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে চলেছে।

এই বিমূঢ় অবস্থা কি নিদারুণ বেদনাদায়ক। পুত্র বিচ্ছেদ-বেদনাতুরা বেপথুমানা মাতার পুত্রকে নিবারণ করবার কোন শক্তিই নেই। না উঠছে এগিয়ে যাবার জন্য পা, না ফুটছে ব্যাকুল কণ্ঠ থেকে একটি কথা।

সহসা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল। সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বনমধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এবার অবাক বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখলেন—পূর্বের পথপ্রদর্শিকা নারীমূর্তি সহসা বনপথে অগ্রগামী পীতাম্বরের সামনে এসেই সস্নেহে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর তিনি নর্মদা দেবীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে পূর্ববৎ মধুর কণ্ঠে বললেন: তোমার ছেলে আমার কোলে উঠেছে—কিসের ভয়? আমিও যে তোমারই মত মা—আমি যে নর্মদা!

বিপুল আনন্দে এতক্ষণ পরে নর্মদা দেবীর বুকখানা দুলে উঠল, পুত্রের এই পরম সৌভাগ্য তাঁকেও যেন অপূর্ব এক পুলকে অভিভূত করে দিল। হাত দু'খানি যুক্ত করে তিনি সেই মঙ্গলময়ী মাতার উদ্দেশে কি যেন বলবার জন্য বেপমান কণ্ঠে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু বাণী নির্গত হলো না, তাঁরই কানে বাজল স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার কণ্ঠের সস্নেহ স্বর: নর্মদা—মা।

পরিচিত স্বরের প্রভাবে নর্মদা দেবীর অভিভূত অবস্থার অবসান হলো। অবাক বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে তিনি দেখলেন, নিজের ঘরে শয্যাতেই তিনি শুয়ে আছেন—দ্বারদেশ থেকে পিতা ডাকছেন: ওঠ মা, আমরা পীতুর সন্ধানে নর্মদার অরণ্যে চলেছি।

ধড়মড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে নর্মদা দেবী কম্পিত কণ্ঠে বললেন: না, না বাবা, আর সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই।

সবিস্ময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন: কেন মা? কি হলো?

গাঢ়স্বরে নর্মদা দেবী বললেন: পীতুকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না বাবা। সে চলেছে মা-নর্মদার ডাকে তাঁরই উদ্দেশ্যে। দেবী নর্মদা তাকে কোলে তুলে নিয়ে আমাকে অভয় দিয়েছেন। আমি দিব্য দৃষ্টিতে সে

দৃশ্য দেখেছি বাবা, দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি, পীতুর জন্যে আর আমার ভয় ভাবনা কিছুই নেই।

চার

ওদিকে বাল-ব্রহ্মচারীর গতির বিরাম নেই। অঙ্গের অলঙ্কারগুলি লুব্ধ পান্থের সম্মুখে ত্যাগ করে সেই যে তিনি নর্মদার উদ্দেশে পদচালনা করেছেন, কোথাও তার ছেদ পড়েনি। পশ্চাতের পদচিহ্নগুলি ক্রমেই অদৃশ্য হচ্ছিল, বালকের দৃষ্টি শুধু সম্মুখে—ভুলেও একটিবার পিছনে সে দৃষ্টি পড়েনি কিম্বা পথশ্রমের ক্লান্তি তাঁর শ্রান্ত চরণদুটিকে অল্প একটু অবসরও দেয়নি।

ব্রহ্মচারীর দৃঢ় সঙ্কল্প, নর্মদার পুত বারী স্পর্শ করবার পূর্বে কোথাও বিশ্রাম করবেন না, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিবেন না। প্রখর মধ্যাহ্ন মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, দুর্গম বনপথে অনভ্যস্ত কোমল দুটি পদ কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত, তথাপি তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে শূকর, ভল্লুক প্রভৃতি দু' একটি বন্য শ্বাপদ বিদ্যুদ্বেগে বালককে অতিক্রম করে গেল, এক সময় একটা চিতাবাঘ এই মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবাস ও দণ্ডধারী অপূর্ব বনচারীর দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সন্নিহিত ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল; তথাপি বালকের মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল না—অন্তর মধ্যে অধিস্থাপিতা মাতৃরূপা নর্মদা মূর্তি স্মরণ করে তাঁরই ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি চলেছেন—সামনের দিকে নদীকে উদ্দেশ করে একইভাবে এগিয়ে চলেছেন।

যে অনুভূতির অনুসরণ করে ব্রহ্মচারীর এই বিরামহীন যাত্রা, দিনান্তে তা সার্থক হলো। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অরণ্যশীর্ষ দিয়ে অস্তমিত সূর্যের ম্লান স্বর্ণরশ্মির সঙ্গে পুণ্যসলিলা নর্মদার রজত-রেখাটির সংযোগে যে অপরূপ দৃশ্যের উদ্ভব হয়েছিল, ব্রহ্মচারীর মুগ্ধ দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হতেই কণ্ঠ থেকে উল্লাসের সুরে ধ্বনি উঠল—'জয় মা নর্মদে'। উন্মত্তের মত তিনি সেই দিকে অগ্রসর হলেন।

তীরবর্তী বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে অবশেষে ব্রহ্মচারী সেই বহুবাঞ্ছিতা তটিনী নর্মদার পুণ্যসলিল স্পর্শ করে, সেই সঙ্গে প্রতপ্ত মুণ্ডিত মস্তকটির উপর পুণ্যবারি সিঞ্চন করে যেন সারাদিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি মোচন করতে করতে ধীরে ধীরে নর্মদা বক্ষে নিমগ্ন হচ্ছেন।

অমনি বালকের মনেও আকাঙ্ক্ষা জাগল, অবগাহন স্নান করে পরিতৃপ্ত হতে। সঙ্গে কৌপিন ও উত্তরীয় বসন থাকায় স্নানে অসুবিধা ঘটল না। স্নানান্তে পথশ্রমে ক্লান্ত ও অনশনে শুষ্ক মুখখানিও যেন তৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এমন সময় মনে পড়ে গেল, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য মধ্যাহ্নের সন্ধ্যাবন্দনা কিছুই যে হয় নাই। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল, অঞ্জলি ভরে নর্মদার নির্মল স্নিগ্ধ বারি পান করে তৃষ্ণা দূর করবেন। কিন্তু অসমাপ্ত মধ্যাহ্নকৃত্যের ত্রুটি সেই মুহূর্তে ব্রহ্মচারীকে এমনি অধৈর্য করে তুলল যে, তার প্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা যেন প্রবল স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্তব্য পালনে অবহিত হলেন, উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়
আবিরাবি ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং।
তেন মাং পাহি নিত্যং—

সন্ধ্যা বন্দনার পর ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি সহসা নদীর উপকূল থেকে উপরের দিকে পড়তেই তিনি সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। এ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দু' চারটি বন্য জন্তু ভিন্ন কোন মনুষ্য-মূর্তি তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু একেবারে দিনের শেষে নদী তীরে তিনি এই প্রথম দেখলেন—সুদর্শন এক প্রৌঢ়া নারী প্রীতি-প্রসন্ন-মুখে তাঁকে লক্ষ্য করছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে স-বৎসা এক পয়স্বিনী ধেনু। হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মাতৃদুগ্ধ পান করে আনন্দে ছুটাছুটি করছে—তার মুখ থেকে দুধের ফেনা তখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। স্নানান্তে সন্ধ্যা বন্দনার পর শুচিতা অনুভবের পরেই এভাবে স-বৎসা ধেনু ও মাতৃসমা নারী দর্শন করে ব্রহ্মচারীও নিজেকে ধন্য মনে করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, এমন নির্জন বসতিবিহীন স্থানে ধেনু নিয়ে মহিলাটি কার প্রতীক্ষা করছেন, আর—তাঁর দিকেই বা এমন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কেন ?

কিন্তু সেই নারীই বালক-মনের সমস্যা দূর করে দিলেন। তিনিই

বললেন : আমাকে এখানে এভাবে দেখে তুমি বাছা খুবই আশ্চর্য হয়েছ মনে হচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ হলো এসেছি ; গোরুকে জল খাইয়েছি, নর্মদা মায়ীকে রোজকার বরাদ্দ এক লোটা দুধ দিয়েছি, তুমি আহ্নিক করছিলে—কিছুই ওসব দেখনি ; তাই ত আমিও উপরে এসে তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

ব্রহ্মচারী বললেন : আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ ? কেন মা ?

নারী উত্তর করলেন : তোমার আহ্নিক দেখছিলুম বাবা! তোমার মত ছেলেত এখানে কখনো দেখিনা ; আজ দেখে ভারি আনন্দ হলো। তোমার সঙ্গে দুটো কথা না বলে কি যেতে পারি বাবা ?

বালকের চিত্ত আনন্দে যেন নেচে উঠল ; মনে পড়ল, স্নেহময়ী মায়ের কথা। তাঁরই মত নির্মল স্নেহে এই অপরিচিতাও যেন তাঁর দেহ মন ভরিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মচারী প্রচুর ব্যগ্রভাবে : তুমি কোথায় থাক মা ?

নারী বললেন : এইখানেই। দেখছ না—গোরু বাছুর নিয়ে বেরিয়েছি। বললুম তো আগেই, রোজ এই সময় এসে দুধ দুয়ে আগে ঐ বেটিকে—যার কাছে তুমি দাঁড়িয়ে আজ বাছা, ওর মুখে ঢেলে দিই। গোরুর বাঁটে এখনো ঢের দুধ আছে, তুমি খাবে ?

ব্রহ্মচারী বললেন : আহ্নিক সেরে আমি ভাবছিলাম, আঁচলা ভরে জল খাব। আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে কিনা।

নারী সহানুভূতির সুরে বললেন : তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি বাছা—সারাদিন খাওয়া হয়নি, মুখখানা শুকিয়ে গেছে—আহা। উপরে উঠে এসো বাবা, জল খেতে হবে না—দুধ খাবে। লজ্জা কি ? মনে কর আমি তোমার মা।

ব্রহ্মচারী বললেন : দুধের আশা ত আমি করি নি, তাই ভেবেছিলুম জল খেয়েই—

অনুযোগের সুরে নারী এবার বললেন : বোকা ছেলে কোথাকার। জলে না হয় পিয়াসাই কাটল, কিন্তু ক্ষুধা ? জল খেয়ে কি ক্ষুধাকে ঠেকান যায় ? কিন্তু দুধ যে ক্ষুধা তৃষ্ণা দুটোই আসান করে। উঠে এসো বাবা।

অগত্যা ব্রহ্মচারীকে সে স্নেহের আহ্বান স্বীকার করে উপরে উঠে

আসতে হলো। নারীও আর কোন কথা না বলে লোটাটি পেতে দুধ দুইতে বসে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাত্রটি দুধে ভরে গেল। সেই ধারোষ্ণ দুধে পূর্ণ পাত্রটি ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে গাঢ় স্নেহের সুরে নারী বললেন : খাও বাবা, সবটুকু খাওয়া চাই কিন্তু; যদি আরও খেতে পার, আবার দুয়ে দেব।

ব্রহ্মচারীর মনে হলো, গৃহে মায়ের কাছে বসেই যেন তাঁর স্নেহের শাসনাধীনে রয়েছেন। তেমনি মধুর স্নেহ, সেই সঙ্গে মৃদু শাসন—কোন প্রভেদ নেই। যেন তাঁর গর্ভধারিণী জননী এই নারীর মূর্তি ধরে ক্ষুৎ-পিপাসাতুর সন্তানকে পরিতৃপ্ত করতে উপস্থিত।

লোটার দুধ সবটুকুই নারীর স্নেহের শাসনে পান করতে হলো; পুনরায় দুগ্ধ দোহনের প্রয়োজন হলো না। পানান্তে তৃপ্ত হয়ে ব্রহ্মচারী বললেন : মায়ী, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব মিটিয়ে দিলে তুমি। কিন্তু আমি তোমার ঋণ কি দিয়ে শোধ করব, আমি যে রিক্ত, নিস্ব।

নারীর চোখে-মুখে পুনরায় স্নেহের শাসন ফুটে উঠল। একটু খরস্বরে বললেন : আরে বোকা ছেলে। মায়ী বলে, আবার দেনা পাওনার কথা তুলে মায়ীকে কষ্ট দিতে হয়? মায়ীদের তো এই ধর্ম্ম। যেমন নর্মদা-মায়ীর জলে দুধ ঢালি, তেমনি এখানে কাউকে দেখলে তাকেও দুধ খাইয়ে তৃপ্তি পাই। আচ্ছা বাছা, আমি এখন চলি। তুমিও যখন নর্মদা মায়ীর পরশ পেয়েছ আর ভাবনা নেই। পথের সন্ধানও এবার মিলবে বাছা।

কথাগুলি স্নেহের সুরে বলে ব্রহ্মচারীর প্রফুল্ল মুখখানির পানে আর একবার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ধেনু নিয়ে নারী বনের দিকে চললেন। বৎসটিও চঞ্চল ভঙ্গিতে তাঁর অনুসরণ করল।

ব্রহ্মচারীও নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। এতক্ষণে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—এ নারী কে? তাইত, পরিচয় ত কিছু দিলেন না, আর তিনিও ত ভাল করে জিজ্ঞাসা করেন নি। তৎক্ষণাৎ কি ভেবে তিনি সবলে মনের কৌতূহলকে দমন করে সংযত হলেন; তাঁর বিবেক যেন এই সময় তাঁকে সতর্ক করে দিল— সংসারের সকল বন্ধন ও প্রলোভন ত্যাগ করে যাকে অনির্দিষ্ট পথে পাড়ি দিতে হচ্ছে, তার পক্ষে কারও সম্বন্ধে কোন-

রকম কৌতূহল প্রকাশ করা উচিৎ নয়। যে দেবীর উপর নির্ভর করে এই দুস্তর পরিক্রমা যাত্রা—সবই তাঁর লীলা ভেবেই স্থির থাকতে হবে।

নয় বছর বয়স্ক বালক-মনের এই তিতিক্ষা কি বিস্ময়াবহ। অতঃপর যাত্রার জন্য ব্রহ্মচারী দণ্ডটি হাতে নিয়ে উপলাকীর্ণ পথে যেই পদার্পণ করেছেন, অমনি তাঁরই পরিচিত ও নিত্য-পঠিত বেদবাণী পশ্চাদ্বর্তী বনভূমি হতে বায়ুপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর কানে ঝঙ্কার তুলল :

অগ্নেনয় সুপথা রায়ে অস্মান্
দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধর্ম জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্টং তেনম্ উক্তিং বিধেম।

উৎকর্ণ হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারী উদাত্ত কণ্ঠের এই বেদবাণী শুনতে লাগলেন। তবে কি নির্জন বনপথে দেবীর প্রসাদে কোন পর্য্যটক তাঁর পথের সাথী হতে আসছেন? মনে তৎক্ষণাৎ সেই স্নেহময়ী নারীর কথা—পথের সন্ধানও এবার মিলবে বাছা!

সেই সন্ধান দিতেই কি কোন সহায়ক আসছেন সাথী হবার উদ্দেশ্যে?

পাঁচ

বালকের অনুমান অবিলম্বেই সত্যে পরিণত হলো। তিনি দেখতে পেলেন—পরম সুন্দর ও শ্রীমান, দণ্ডকমণ্ডলুধারী দীর্ঘাকৃতি এক তরুণ ব্রহ্মচারী অদূরবর্তী বনভূমির ভিতর দিয়ে নর্মদাতীর লক্ষ্য করে ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে আসছেন। আগন্তুক ব্রহ্মচারীও বালক ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করেছিলেন। উভয়েই চমৎকৃত। নিকটে এসেই যুবা ব্রহ্মচারী সহসা বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন : আরে—ভারি আশ্চর্য তো। এই বয়সেই তুমি নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়েছ?

বালক ব্রহ্মচারীর প্রসন্ন মুখখানির উপর সহসা যেন গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ল, সেই সঙ্গে গাঢ়স্বরে তিনি বললেন : মহাত্মা ধ্রুব আমার চেয়েও অল্প বয়সে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমার তো এ-পথে সবেমাত্র হাতে খড়ি হয়েছে।

উৎফুল্লমুখে যুবা বললেন : সাধু, সাধু! তিন বছর ধরে আমার এই

পরিক্রমা চলেছে ; কত বাধা বিঘ্ন পেয়েছি, কত বিপদ অতিক্রম করেছি, কত আশ্চর্য ব্যাপার দেখিছি, কিন্তু এমনটি বুঝি আর দেখিনি। প্রায়ই নর্মদামায়ীকে জানাই—যেন একজন সাথী মিলে যায়। কিন্তু আজ যে তাঁরই সামনে এমন সংযোগ হবে, সেটা ভাবতে পারি নি। এমন একটি অদ্ভুত সাথী পাওয়া, মায়ীর দয়া ছাড়া কি সম্ভব।

বালক তাঁর ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর পানে চেয়েছিলেন। কথাগুলি শুনতে শুনতে মনটি তাঁর আনন্দে যেন ভরে গেল। স্নিগ্ধস্বরে বললেন : তাহলে আমাকেও বলতে হয় সাধুজী, মায়ী আমাকেই কৃপা করেছেন। আমি যে একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করে দণ্ডীঘর থেকেই পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়িছি। কাণে শোনা ছাড়া চোখে দেখবার মত কোন শিক্ষা আমি পাইনি, পথ-ঘাট কিছুই আমার জানা নেই। শুধু এই মাত্র জানি—আমাকে যেতে হবে, আমার সঙ্কল্প অপূর্ণ রাখলে চলবে না—পূর্ণ করবার শক্তি মায়ীই কৃপা করে দেবেন। তাই মায়ী আপনাকে মিলিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে।

হর্ষোৎফুল্লমুখে যুবক বললেন : সত্যিই তুমি অদ্ভুত ছেলে,—এই বয়সেই পরমাত্মার উপর নির্ভর করতে শিখেছ। সত্যিই ভাই, এই যে পরিক্রমা—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে—নদীরূপে পরমাত্মাই তাতে সিদ্ধি দিয়ে থাকেন। তাঁর কৃপা ভিন্ন এ সাধনা সিদ্ধ হয় না।

কথা বলতে বলতে যুবা সাধু সহসা সচকিতভাবে বলে উঠলেন : এই দেখ আমার কাণ্ড। এই দিকেই মায়ীর দেখা পাব ভেবে হাওয়ার মতন ছুটে আসছিলাম এতক্ষণ, কিনারার আভাস পেয়ে কি আনন্দ ; কিন্তু কাছে এসেই তোমাকে দেখে সব ভুলে গেছি। দেখছি, তোমার স্নান আহ্নিক হয়ে গেছে ; তুমি ভাই এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি নদী-মায়ীকে পরশ করে লম্বা পথ চলার শ্রান্তিটা কাটিয়ে আসি।

বলতে বলতে ঝোলাঝুলি সেখানে নামিয়ে রেখে একখণ্ড গৈরিক বসন ও কমণ্ডলুটি নিয়ে আগন্তুক যুবক নদী অভিমুখে অবতরণ করতে লাগলেন। বালক ব্রহ্মচারীও প্রকৃতিসিদ্ধ সায়ন্তনী কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তটভূমির উপর উপলরাশিকেই আসন করে পুনরায় পরমাত্মার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

খানিক পরে স্নানাহ্নিক সেরে যুবা ব্রহ্মচারী উপরে উঠে এসে দেখলেন, বালক তন্ময় হয়ে উপাসনায় নিমগ্ন। এ অবস্থায় তিনি বালকের ধ্যান ভঙ্গ না করে তাঁর পাশে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন জ্যোতিঃস্নিগ্ধ মুখখানি দেখতে লাগলেন। ফলে, তিনিও যেন বাল-ব্রহ্মচারীর ভাবাবেগে আকৃষ্ট হয়ে তারই পাশে আসন করে বসে উপাসনায় লিপ্ত হলেন।

যখন তাঁদের ধ্যানভঙ্গ হলো, অনেকখানি রাত্রি হয়েছে। যুবক তাঁর কমণ্ডলুর জলে মুখ ও চক্ষু প্রক্ষালন করে, বালকের দিকে সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন: স্নানাহ্নিক সেরে এখানে এসে দেখি, তুমি নিবিষ্টমনে ধ্যান করছ। ধ্যানভঙ্গ করা অনুচিত জেনে, আমিও আর একদফা ইষ্টের আরাধনায় বসে যাই। অনেক রাত হয়েছে—প্রায় দ্বিপ্রহর। তুমি চোখে মুখে জল দাও। আমার ঝুলিতে কিছু ফল আছে, দুজনে তাই আহার করে আজ এখানেই মায়ীর আস্তানায় রাত্রিবাস করব।

উৎফুল্ল মুখে বালক বললেন: আপনার কথায় আমার মনে পড়ে গেল, পরিক্রমার পথে নদী পড়লে, তারই তীরে নদীর দিকে মুখ করে রাত্রিবাসের বিধি। কিন্তু আমি এমনি বোকা, নদী দেখে, তার জলে নেমে স্নান করে, আবার পরিক্রমার জন্যে বনের দিকে যাচ্ছিলাম। আপনার স্তোত্র শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি—আর এগুনো হয়নি। আপনার কৃপাতেই আমার তপস্যা ভঙ্গ হয়নি।

বিস্ময়ের সুরে যুবা সুধালেন: তপস্যা?

বালক মৃদু হেসে উত্তর দিলেন: আমি তো জানি সাধুজী, নর্মদামায়ীর এলাকা পর্যটন করাই রীতিমত একটা তপস্যা। পাহাড়ের গুহায় বসে একমনে তপস্যার চেয়ে এই পরিক্রমা আরো কঠিন। দেখুন না রোদে বৃষ্টিতে চলার সময় পাদুকা বা ছাতা ব্যবহার চলবে না, লোকালয়ে থাকা নিষেধ, পথে কোন নদী নালা খাল বিল পড়লে সাঁতার দিয়ে পার হতে হবে, তারপর ভাগ্যক্রমে নর্মদাজীর দর্শন মিললে, আর সেখানেই রাত হলে তাঁরই কোলের কাছে আসন পেতে রাতটি কাটানো চাই– এখানে ঘুমাবারও বিধি নেই। যদি কোন ব্যাপারে ভুলচুক হয়—তাহলে এত কষ্টের পরিক্রমা তখনি ভেঙ্গে যাবে, আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে। বলুন তো, এ তপস্যা নয়?

যুবা মুগ্ধ দৃষ্টিতে বালক-সঙ্গীর স্নিগ্ধ মুখখানির দিকে চেয়ে তার কথাগুলি

শুনছিলেন। শুনতে শুনতে অভিভূতের মতই বালকের কথাগুলি সমর্থন করে তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন : ঠিক কথাই তুমি বলেছ ভাই! আমাদের এই নর্মদা পরিক্রমা তপস্যাই বটে! শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এত অল্প বয়সে তুমি পরিক্রমার বিধিনিষেধ সব জেনে এভাবে অভিজ্ঞ হয়ে পড়েছ! উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষা না পেলে তো এ জ্ঞান হয় না। তোমার গুরু কে ভাই—কোথায় তাঁর আশ্রম ?

বালক তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন : আমার গুরু ভগবান, তিনিই আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, আর সে দীক্ষার মন্ত্র হচ্ছে—নর্মদা পরিক্রমার বিধি। আমি কেবলই প্রার্থনা করি তাঁর কাছে, আমি যেন কোনদিন পথভ্রষ্ট না হই।

যুবা বললেন : ভগবান তো মানুষ মাত্রেরই অন্তরে থাকেন, যে ভাগ্যবান সেই সেটা বুঝতে পেরে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সব শুদ্ধ করে নেয়। কিন্তু তিনি তো আর দেখা দিয়ে মুখে কিছু বলেন না। তাঁর কৃপা হলে যোগ্য গুরু মিলে যায়, তিনিই তাকে দীক্ষা দিয়ে পথ দেখান। সন্ন্যাসী হতে হলে তাই গুরুকে প্রয়োজন হয়। তিনিই জ্ঞানের আলোটি জ্বেলে দিয়ে অন্তরের অন্ধকার কাটিয়ে দেন। গুরু নির্দেশ ছাড়া কোন তপস্যাই সিদ্ধ হয় না ভাই।

বালকব্রহ্মচারী নিবিষ্টমনে কথাগুলি শুনলেন; কিন্তু তাঁরও অন্তর-মধ্যে সহজাত সংস্কারের এমন একটি আলোক-শিখার আভা এই বয়সেই তিনি অনুভব করে থাকেন যে, তার প্রভাবে মনের বদ্ধমূল ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাই যুবা ব্রহ্মচারীর যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলির উত্তরে তিনি বললেন : দেখুন, গুরুর কাছে যদিও দীক্ষা নেবার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু আমি শুনিছি, উপনয়ন সংস্কারের পর দণ্ডগৃহ থেকে তপস্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার অধিকার প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর আছে। কোন বিধিনিষেধ এখানে নেই— পরমাত্মাই তাকে পথ দেখান।

যুবা বললেন : কথাটা ঠিক ; তবে এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে ; সেই ব্রহ্মচারী কিন্তু আর কখনো গৃহস্থাশ্রমে ফিরতে পারবেন না। তাহলেই তিনি হবেন পতিত।

মৃদু হেসে বালক বললেন : দেখুন, আমি বালক, বয়স অল্প, এই বয়সে যতখানি বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত ছিল, তাও শিক্ষা হয় নি। কাজেই এইসব উঁচুদরের কথা নিয়ে তর্ক করবার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার নেই। তবে উপনয়ন

সংস্কারটি এমন জিনিষ যে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীর মনের সৎবুদ্ধিটি আরো উজ্জ্বল করে দেয়। তা থেকেই আমার মনে এই সঙ্কল্প জাগে যে, আর কিছু না পারি—চিরব্রহ্মচারী হবার ব্রত নিয়ে দণ্ডীঘর থেকে যাত্রা করবার অধিকার সস্ত ব্রহ্মচারী মাত্রেরই আছে। এতে প্রয়োজন—মনোবল, আর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস। এর পরেই রয়েছে পরম তপস্যার উপায়—নর্মদাজীর পরিক্রমা। তবে আর কি চাই বলুন। সেকালের মুনি ঋষিদের মত বনে পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা সুরু করা সোজা কথা নয়; চাই গুরু, দীক্ষিত দেহ, তপস্যার মন্ত্র, আরও কত বিধিনিয়ম—কি রকম সব ন্যাটা বলুন ত। তারপর, বালক দেখে হয়ত ভাগিয়ে দেবেন, নয়ত, ধরে বেঁধে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে হিতকারী সাজবেন। তাই ভাবলাম, এসব হাঙ্গামায় না গিয়ে, বাল ব্রহ্মচারীর ক্ষমতায় যা সম্ভব, তাই করি না কেন। সেইজন্যই তো এই তপস্যায় লেগে গেছি। এতে গুরু, মন্ত্র, দীক্ষা, বিদ্যা, কিছুরই প্রয়োজন নেই; শুধু সাহস, মনের জোর, আর ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকলেই হলো। এ তপস্যা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে চালাতে পারি, বাধা বিঘ্ন দু'হাতে ঠেলে নর্মদাজীর কোলে ওঠাই লক্ষ্য রাখি—তাহলে সবই পাওয়া যাবে, ঐ যে গুরু মন্ত্র দীক্ষা জ্ঞান—সবই আপনি এসে যাবে।

কথাগুলি শুনতে শুনতে যুবক ব্রহ্মচারী ভাবছিলেন—বয়সে কত ছোট, অথচ এই শিশুর আত্মজ্ঞান কি প্রবল! প্রতি কথাটি যেন মন্ত্রের মতন শক্তিসম্পন্ন ও তেজময়। তিনি তো অনেক আগেই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, তার আগে বিদ্যা শিক্ষারও সুযোগ ঘটেছিল; এদিকেও পুর্ণ দুটি বছর ধরে নর্মদা পরিক্রমার ব্রত নিয়ে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু পেয়েছেন কি? গুটিকতক সোজা কথায় সদ্যোপরিচিত এই বাল-ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস-জীবনের কর্মযোগটি কি সুন্দরভাবেই বুঝিয়ে দিলেন। সত্যই ত, এই বালক যে কর্মে গভীর নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত, তাই যে কঠিন যোগ, তারই মধ্যে কঠোর তপস্যা!

ব্রহ্মচারীর মনে পড়ে—গুরুর কথা, দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ কত উপদেশ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে, তার উপর ঘনিয়ে আসে অবিশ্বাস ও বিরক্তির ছায়া। যে-গুরুর নিকটে তিনি দীক্ষিত, সাধন ভজন সম্বন্ধে যিনি বহু উপায় ও যৌগিক প্রণালীগুলির নির্দেশ দিয়ে একদা

তাঁকে ধন্য ও বাধিত করেছিলেন, এখন সেই গুরুর মূর্তি তাঁর স্মৃতিপথে জাগরিত হলেই তিনি যেন আতঙ্কে শিউরে ওঠেন এবং মনে মনে তৎক্ষণাৎ রাম নাম স্মরণ করে গুরু-নাম-স্মরণ-জনিত অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে চান। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারীর মনের এই ভাবান্তর বাল-ব্রহ্মচারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি যে চুপ করে রইলেন? আমার কথাগুলো বুঝি ভাল লাগেনি আপনার, তাই মুখখানা ভার করে রইলেন—কিছু বললেন না?

যুবক একথার উত্তরে দিব্য শান্তস্বরে বললেন: তোমার কথাগুলিই আমি মনে মনে ভাবছিলাম ভাই; নিজের মন থেকেই তুমি আত্মশুদ্ধির যে নির্দেশ পেয়েছ, অনেক পড়া শোনা, ধ্যান, ধারণা, সাধন ভজনেও যা মেলে না। তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

বালক পুনরায় সুধালেন: কিন্তু আমার মনে হলো, কথাগুলো শোনবার পর আপনার অমন সুন্দর মুখখানা যেন কালো হয়ে গেল। তাই ভাবছিলাম—বুঝি আমার উপর রাগ করেছেন।

যুবক ব্রহ্মচারীর পক্ষে আর আত্মদমন সম্ভব হলো না, তিনি এখন বেশ প্রসন্নভাবেই বললেন: তুমি যখন আমার মুখ দেখে মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহ করেছ, তখন তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, আমার যিনি দীক্ষাদাতা গুরু, তোমার সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে মনে পড়তেই আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে, মুখখানাও অমনি কালো হয়ে যায়। এদিক দিয়ে আমার দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই ভাই।

সবিস্ময়ে বালক বললেন: সে কি! শুনিছি, মনের মধ্যে বিকার এলে, তখনি মা আর গুরুর মুখ স্মরণ করলে, বিকার কেটে যায়। আর আপনি বলছেন—গুরুকে মনে পড়তেই আপনার মন বিষিয়ে উঠেছে? এ যে অদ্ভুত কথা ব্রহ্মচারী!

যুবক ব্রহ্মচারী গাঢ়স্বরে বললেন: আমার সেই গুরুর চরিত্র আরও অদ্ভুত। পুরাণে আছে, ঋষির অভিশাপে এক ধর্মশীল রাজা রাক্ষসের মত ভীষণ অনাচারী হয়েছিল। ইতিহাসে পড়েছি, ব্রাহ্মণ সন্তান রাজু বিধমা কালাপাহাড় হয়ে হিন্দুর ধর্ম ও দেবতার চরম নিগ্রহ করেছিল। কিন্তু আমি এই নর্মদামায়ীর এলাকাতেই এক সিদ্ধাশ্রমে তেমনি এক কালাপাহাড়ের পাল্লায়

পড়েছিলাম। দিব্য প্রশান্ত মূর্তি, ঋষির মত দিব্যভাব, দেখলেই ভক্তি হয়। আমি তখন দীক্ষা নেবার জন্য গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদতলে পড়ে প্রার্থনা জানালাম—'প্রভু, আমাকে দীক্ষা দিন।' তিনি সেকথা শুনেই প্রথমে হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপরেই আমার হাতখানা ধরে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমার কাণে কাণে দীক্ষার মন্ত্র দিলেন। সে মন্ত্র যেন আমার সর্বাঙ্গে একটা তড়িৎপ্রবাহের পরশ দিয়ে আড়ষ্ট করল। তারপর খুব অল্প কথায় সাধন ভজন ও যোগের কথা বলে আবার গুহা থেকে বাইরে নিয়ে এলেন আমাকে। তারপরে সহসা পীঠের উপর সজোরে এক চপেটাঘাত করে বললেন: 'চরৈবতি—চরৈবতি।' চলো, চলো, এগিয়ে চলো। যে চলতে থাকে, সেই অমৃত লাভ করে।

বালক সহর্ষে বলে উঠলেন: বা। বেশ কথাগুলি তো।

যুবক ব্রহ্মচারী বললেন: তাঁর কথা শুনলে দেহ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। দীক্ষার পর আশ্রমের একদিকে শিবমন্দির দেখে আমি আনন্দে তাঁর পুজা করতে যাই। পুজায় বসেছি, এমন সময় গুরুদেব সুধালেন। 'কি হচ্ছে—রুদ্র পুজা?' তারপরই তর্জন করে বললেন: 'না রুদ্রো রুদ্রমর্চতে।' এমন তীব্র স্বরে বললেন, পুজা করতে করতে আমি সভয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি তখন করলেন কি—মন্দিরের মধ্যে সেঁধিয়ে পুজার উপকরণগুলো দুহাতে তুলে ধরে শিবলিঙ্গের উপর সজোরে আছড়ে ফেলে হো হো করে হেসে উঠলেন। সে কি বিকট হাসি। তার গমক থামতেই আমার পানে কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন: বুঝলি আমার কথা? রুদ্র না হলে রুদ্র পুজা করা যায় না। বেরিয়ে যা এখান থেকে।

তখন ভয়ে দুঃখে অভিমানে আমি কাঁপতে কাঁপতে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পেলাম না – গুরুদেবও পিছনে পিছনে এসে আমার গলা ধরে আশ্রমের দরজা দেখিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ থেকে হুঙ্কার উঠল—'যাও।' বুঝলাম, আমাকে তিনি আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ছল ছল চোখে তাঁর পানে একটিবার চেয়ে অসহায়ভাবে আমার ঝুলি, দণ্ড, কমণ্ডলুর দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে একটি একটি করে সেগুলো এমন ভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন যে, দণ্ডটা আমার পিঠে পড়ল, কমণ্ডলুও পায়ের উপর পড়ে রীতিমত

আঘাত দিল, ঝুলিটা একখানা পাথরে আটকে ঝুলতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সেই রুদ্রমূর্তি রক্তচক্ষু অদ্ভুত গুরুকে দূর থেকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে পালিয়ে বাঁচলাম। আমার দীক্ষা ও দীক্ষাদাতা গুরুর এই ইতিহাস।

বাল ব্রহ্মচারী এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর আপনি কি করলেন? হঠাৎ তিনি ওভাবে বিগড়ে গেলেন কেন, সেকথা জানতে পেরেছিলেন?

ব্রহ্মচারী বললেন: হ্যাঁ ভাই, ঠিক জায়গাতেই তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। আসল কথাটা আমার বলা হয় নি। আশ্রম থেকে পালিয়ে অনেকটা তফাতে পাথরের একটা মন্দির দেখতে পেয়ে তারই দরজায় বসে পড়লাম। আশে-পাশে পাহাড়, অল্পস্বল্প জঙ্গল। মন্দির দেখে মনে হলো, পড়ো অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে কোন দেবতার মূর্তি আছে কিনা, দেখবার জন্য কৌতূহল হলো। ভিতরে ঢুকতেই দেখি, বনবাদাড়ে সে জায়গাটিও আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কোন রকমে সেই অপরিচ্ছন্ন পথ দিয়ে অলিন্দে উঠে গর্ভমন্দিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম। পাথরের তৈরী একটি দেবীমূর্তি বেদীর উপরে বসে আছেন, কিন্তু তাঁর মাথাটি এমনভাবে বিদীর্ণ যে স্পষ্টই বুঝা গেল, কোন শক্ত প্রহরণ দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে মূর্তির মাথাটির এই অবস্থা করা হয়েছে। আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগল, কোন্ দেবীর এ মন্দির—এমন নিষ্ঠুর কাণ্ড করেছে কোন্ পাষণ্ড?

কিন্তু কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? ভারগ্রস্ত মনে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেছি, এমন সময় সেই অঞ্চলের এক আদিবাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমাকে মন্দির থেকে ম্লান মুখে বেরিয়ে আসতে দেখে সে কোন পর্যটক ভেবেই জিজ্ঞাসা করল: ঠাকুর কি পুজো করবার জন্যে মাতাজীর মন্দিরে গিয়েছিলেন?

বললাম: পুজা কাকে করব বল? মাতাজীর মাথাটি তো দু-ফাঁক হয়ে আছে দেখে এলাম। কি ব্যাপার বলতো বাপু! কোন্ মাতাজীর মন্দির এটি? কোন্ পাষণ্ড তাঁর অমন সুন্দর মূর্তিটি নষ্ট করেছে? একি সেই কালাপাহাড়ের কাণ্ড?

আদিবাসী লোকটি সবিনয়ে বলল: না ঠাকুর, কালাপাহাড়ের গল্প আমরা কানে শুনে এসেছি ছেলেবেলা থেকে। আর সাক্ষাৎ কালাপাহাড়কে

দেখেছি এই চোখে। তিনি তোমারই মতন ঠাকুর মানুষ। ভারি জ্ঞানী আর সিদ্ধ পুরুষ বলে সবাই তাঁরে খাতির করত। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মাথা গেল বিগড়ে। নিতি নিতি এই মন্দিরে এসে তিনি নিজের হাতে নর্মদা মায়ীর পুজা করতেন। এই মন্দিরে বেদীর উপরে যাঁরে আপনি দেখে এলেন, সেই তো নর্মদামায়ীর মূর্তি গো! কত লোক দর্শন করে পুজো দিয়ে ধন্য হোত, তোমার মত যে-সব ঠাকুর মায়ীর পরিক্রমা করত, তেনারা তো গঙ্গোনাথে এলেই মায়ীর মন্দিরে এসে পুজো করতেন। আর ঐ যে সাধু ঠাকুরের কথা বললাম—তাঁর তো কাজই ছিল সকালে সাঁঝে দুটি বেলাই মায়ীকে পুজো করা। কিন্তু ক্ষেপে ওঠবার পর তিনিই হলেন মায়ীর দুষমন। একদিন আমরা তাজ্জব হয়ে দেখি, পাগলা ঠাকুর ফুল পাতা সব ছড়িয়ে ফেলে লোহার একটা ডাণ্ডা নিয়ে মায়ীর মাথার উপর জোরে জোরে ঘা মারছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চিল্লাচ্ছে—আমার সঙ্গে চালাকী, বুজরুকী চলবে না পুজো তোর বন্ধ করে দিচ্ছি ছাখ।

আদিবাসী প্রত্যক্ষদর্শীর মত ভঙ্গি করে এমন ভাবার্দ্রস্বরে কাহিনীটা বলতে লাগল যে, শুনতে শুনতে আমার মনে হলো আমিও যেন দিব্য-দৃষ্টিতে পাগলা ঠাকুরের সেই নিষ্ঠুর কাণ্ড প্রত্যক্ষ করছি। কেননা, একটু আগে শিবের মন্দিরে আমার গুরুদেবকেও ঠিক ঐ রকম অকর্ম করতে দেখেছি। যাই হোক, এর পর সেই আদিবাসীর কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পারলাম। প্রথম কথা, সেই অঞ্চলটির নাম গঙ্গোনাথ। খানিক দূরে পর্বতের উপর গঙ্গোনাথ শিবের মন্দির আছে; সেখানে সাধুরা থাকেন। তাঁদের আশ্রমটিই নর্মদা পরিক্রমণকারীদের একটি চমৎকার বিশ্রাম কেন্দ্র। দ্বিতীয় কথা যে পাগলা ঠাকুরটি হঠাৎ দেবদ্বেষী হয়ে নর্মদামায়ীর মূর্তি ভেঙে দেন, দেবদেবীর প্রতি যাঁর দারুণ বিদ্বেষ, কালাপাহাড়ের মত ঐ অঞ্চলে কুখ্যাত হয়ে উঠেছেন, তিনি গৌরীশঙ্কর মহারাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন; খুব পণ্ডিত লোক, সাধু ব্যক্তি, যোগসিদ্ধ বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে তিনি এখন সবার ঘৃণিত। শুনে আরও আশ্চর্য হলাম, সেই কালাপাহাড়-রূপী গৌরীশঙ্কর মহারাজই—আমার গুরুদেব।

ছয়

যুবক ব্রহ্মচারীর কথা শেষ হতেই বাল-ব্রহ্মচারী পীতাম্বর তাঁকে সুধালেন : আপনি কি তাহলে আর গুরুর কাছে ফিরে যান নি? তাঁর সঙ্গে অপনার আর দেখা—

বালকের কথায় বাধা দিয়ে ব্রহ্মচারী উত্তর করলেন : না, না আদিবাসীর কাছে ঐ সব কথা শুনে, আর সেই অনাচারী মানুষটি যে আমার গুরুদেব—একথা জেনেই আমি তৎক্ষণাৎ সে-অঞ্চল ত্যাগ করে আসি। এমন কি, তার কাছে গঙ্গোনাথ আশ্রমের নাম শুনেও সেখানে যাইনি, দূর থেকে মন্দিরের চুড়োর উদ্দেশে একটা প্রণাম ঠুকেই পালিয়ে আসি।

পীতাম্বর মুখখানা ম্লান করে বললেন : কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুদেবের কাছে আপনার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, সাধুজী।

বিস্ময়ের স্বরে ব্রহ্মচারী বললেন : বলছ কি তুমি! কিন্তু যদি নিজের চোখে আমার গুরুর সে সব অনাচারী কাণ্ড দেখতে, তাহলে ও-কথা তোমার মনে উঠত না, বলতে—পালিয়ে এসে ভালই করেছি।

বালক এ কথার উত্তরে শান্ত ও সংযত স্বরে বললেন : আপনার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অনাচারী কাণ্ডগুলো যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখনো আমি যেন আপনার গুরুদেবের রুদ্র মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সাধুজী, আপনি যদি নর্মদামায়ীর মন্দির থেকে বেরিয়েই ওখান থেকে পালিয়ে না এসে, আবার গুরুর কাছে ফিরে যেতেন, তাহলে হয়ত এ মনস্তাপ পেতেন না।

বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চেয়ে ব্রহ্মচারী বললেন : তাঁর সব বৃত্তান্ত শুনেও এ কথা তুমি বলছ? আমাকে তিনি যে-ভাবে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তারপরও আমি কি সেখানে যেতে পারতাম?

বালক এবার সহাস্যে উত্তর করলেন : কেন পারতেন না—আপনি যখন তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হয়েছেন? যখন জানতে পারলেন সেই আদিবাসীর কাছে—নর্মদামায়ীর মন্দিরে যিনি অত বড় অনাচার করেছেন, তিনি আপনার গুরু। তখনই উচিত ছিল তাঁর কাছে আবার ফিরে যাওয়া, তাঁকে প্রসন্ন করা, তাঁর ভুল বুঝিয়ে দেওয়া।

যুবা বালকের মুখে এ ধরনের কথাগুলি শুনে ব্রহ্মচারী বলে উঠলেন : তুমি ঐ অবস্থায় পড়লে পারতে তাঁর কাছে যেতে—ভুল বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে ও-পথ থেকে ফেরাতে ?

দৃঢ়স্বরে বালক এবার উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই। আমি জেনেছি, গুরুর যেমন কর্তব্য শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে ভজনের পথে এগিয়ে দেওয়া, তেমনি সেই শিষ্যের গুরু যদি পথভ্রষ্ট হন, শিষ্যেরও কর্তব্য—গুরুর কাছে থেকে তাঁকে সাহায্য করা।

ব্রহ্মচারীর মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠল। বললেন : কিন্তু সে গুরু যে জ্ঞান-পাপী, সেটা ত বুঝছ না। তাঁর মন্ত্র হয়েছে দেব-দ্বেষ, যন্ত্র হয়েছে দাণ্ডা।

পীতাম্বর সহাস্যে বললেন : না হয় সেই দাণ্ডা শিষ্যের মাথাতেই পড়ে রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠত—যে দাণ্ডা পাথরের বিগ্রহের মাথায় অনেক—অনেক বার পড়েছিল। তাহলে তিনি কি শিউরে উঠতেন না বলতে চান ? আমরা ত সংসারের মায়া কাটিয়ে এসেছি সাধুজী, তবে কিসের ভয় আমাদের ? চলুন, আমরা যাত্রা আবার ফিরাই—যেখান থেকে আপনি ফিরে এসেছেন, এবার আমিও আপনার সঙ্গে সেখানে যেতে চাই—আপনি আমাকে নিয়ে চলুন সাধুজী।

বালকের দুঃসাহস ও মানসিক শক্তি যুবক ব্রহ্মচারীকে পুনরায় বিস্ময়াভিভূত করে তুলল। তার প্রকৃত মনোভাব বুঝবার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই নির্ভীক মুখখানার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে একটি কথাও নির্গত হলো না। বুদ্ধিমান বাল-ব্রহ্মচারীও সে দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করে তেমনি দৃঢ়স্বরে বললেন : দেখুন, আমার কথা শুনে আপনার মনে বোধ হয় সন্দেহ হচ্ছে, কিন্তু আমি আবার বলছি—বাজে কথা আমি বলিনি। ঐখানে গিয়ে আপনার গুরুজীকে দেখবার জন্যে আমার মন সত্যই চঞ্চল হয়ে উঠছে। এখন ঐ পথেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। আর, আপনি যদি ওখানে যেতে অনিচ্ছুক থাকেন, তাহলে আমি একলাই যাব। তারপর, যে গঙ্গোনাথের মন্দির দেখেই আপনি চলে এসেছেন—সেই মন্দিরেও যাবার জন্য আমার মন চঞ্চল হচ্ছে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রহ্মচারী বললেন : এখন দেখছি, এ

সেই নর্মদামায়ীর লীলা। তিনিই তোমার মনে শক্তি যোগাচ্ছেন। বুঝেছেন তিনি, এই বয়সেই তাঁর মাহাত্ম্য তুমি বুঝেছ। সত্যকার যে জ্ঞান, তাঁর কৃপায় তুমি পেয়েছ। বালক হলেও তুমি অসাধারণ। আর তোমাকে সাথীরূপে পেয়ে আমিও ধন্য হচ্ছি।

বালক পাতাম্বর এই সময় তাড়াতাড়ি মিনতির স্বরে বললেন: না, না, আমাকে এমন করে বাড়িয়ে আপনি অপরাধী করবেন না সাধুজী। আপনি আমার চেয়ে জ্ঞানে বিদ্যায় বয়সে সাহসে সব দিক দিয়েই অনেক বড়। তবে সময় সময় জ্ঞানীদেরও ভুল হয়। সেই যে কথা আছে না—'রজ্জুতে সর্পভ্রম।' এখানেও তাই। আমি শুধু বলতে চাই—আমরা ত দু'জনেই সংসার ছেড়ে এসেছি, পিছনে চাইতে কেউ নেই; তবে ভাবনা কেন? আপনি যেন আমার কথায় রাগ করবেন না সাধুজী।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীর একখানি হাত বালক চেপে ধরলেন। ব্রহ্মচারীও সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতখানা দিয়ে বালকের কণ্ঠ বেষ্টন করে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন: না ভাই, আমি তোমার উপর রাগ করিনি, বরং আমার ভুল দেখিয়ে দিয়েছ বলে খুশিই হয়েছি। এসো ভাই, আজকের রাতটুকু আমরা এখানেই গল্পে সল্পে কাটাই, তার পর সকালেই আমাদের শুভযাত্রা।

নর্মদা পরিক্রমার কঠোর বিধি হচ্ছে—সৌভাগ্যক্রমে যদি সায়াহ্নের মুখে নর্মদার পবিত্র কূলে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটে পর্যটকের পক্ষে, তাহলে সায়ংকৃত্যাদি সেরে সেইখানেই বিনিদ্র নয়নে নর্মদামায়ীর ধ্যানের ভিতর দিয়ে রাত্রিটি অতিবাহিত করা চাই। কাজেই, দুই ব্রহ্মচারী পরস্পরের অতীত জীবন—সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর যথাসময় ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

নিশাবসানের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে দুই ব্রহ্মচারী পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলেন। যুবক-ব্রহ্মচারীর নামটিও পীতাম্বর জেনেছেন। দীক্ষা দানের পর গুরুদেবই তাঁকে ধ্যানানন্দ নামে অভিহিত করেন। গুরুর সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে এলেও গুরুদত্ত নামটি তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই বরণ করে নিয়েছেন। পাতাম্বর একথা জেনে তাঁকে বললেন: দেখুন দেখি, আপনি গুরুর দেওয়া নাম ব্যবহার করছেন, তাঁরই দীক্ষা দানের মন্ত্র জপছেন, তবু তাঁকে এত ভয়? গুরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা মনে করুন—

উৎপাদক ব্রহ্মদাতো গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা, তস্মোান্মন্যেত সততং পিতুর-প্যধিকম্ গুরুম্ ।

আপনি গুরুদর্শনে চলুন নির্ভয়ে।

ধ্যানানন্দ উত্তর করেন: তুমিই আমার ভয় ভেঙ্গে দিয়েছ। এখন আমি নির্ভয়ে গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর পদ-বন্দনা করতে পারব। আমার মনে হচ্ছে, তুমি সঙ্গে থাকলে—গুরু যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, শান্ত ভাবেই আলাপ করবেন।

পীতাম্বর উৎফুল্ল মুখে বলে ওঠেন: দেখুন, আমাদের পরিক্রমা এবার গঙ্গোনাথের উদ্দেশ্যে। সেখানেও নর্মদামায়ীর দর্শন মিলবে—মায়ী আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন।

নর্মদা অঞ্চল মধ্যে গঙ্গোনাথ আশ্রমটি যে পরিক্রমণ-কারীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় স্থান, আশ্রম-সংলগ্ন মন্দিরটিও যে অপূর্ব, এবং এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন এক মহাপুরুষ, পরিক্রমার পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা সে সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাত হলেন।

সুসমৃদ্ধ রাজধানী বরোদা নগরী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪৫ মাইল। একদিকে পুণ্যসলিলা নর্মদা, অন্য দিকে দুর্ভেদ্য মহাবন। নর্মদার তটভূমি থেকে অনেকখানি উঁচু স্থানে এই আশ্রম। এর স্বাভাবিক শান্তি পারিপার্শ্বিক বনজ দৃশ্যাবলী এবং মন্দির পাদদেশে বিকীর্ণ তাপসাশ্রমগুলি দেখলেই পুরাণবর্ণিত তপোবনের কথাই মনে হয়। সেইরূপ পরম শান্ত পরিবেশে এই গঙ্গোনাথ প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই গঙ্গোনাথজীর প্রতিষ্ঠার মূলে এক তপস্যাসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রচেষ্টা ও কর্ম-সংযোগের কাহিনী শোনা যায়। জনসাধারণের অগম্য এই স্থানে একটি বিশাল গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তিনি যে কতকাল ধরে তপস্যা করেছেন, সে তত্ত্ব অন্যের অজ্ঞাত। তবে তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই মনোরম স্থানটি লোক চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পেয়েছে—একথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। লোকমুখে প্রকাশ যে, এখানকার সর্বোচ্চ স্থানের এক অত্যন্ত দুর্গম অংশে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ গঙ্গোনাথ প্রচ্ছন্ন ছিলেন। এই সাধক তপঃপ্রভাবে তথ্যটি জ্ঞাত হয়ে তাঁকেই আশ্রয় করে কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। তাঁর দীর্ঘ তপস্যার মধ্যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কত পরিবর্তন হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী

কালসমুদ্রে মিশে যায়, কিন্তু স্বয়ম্ভুদেব গঙ্গোনাথের প্রসাদপুত: তপঃশক্তির প্রভাবে তাঁর জীবন-প্রদীপের আয়ু-বর্তিকাটি অক্ষুণ্ণ থাকে। সিদ্ধিলাভের পর তাপস যেন নূতন এক মানব রূপে মানবজাতির কল্যাণকল্পে সুপ্রকাশ হলেন। তাঁর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিক দুর্গম স্থান সুগম ও মনোরম হয়ে এ অঞ্চলবাসীকে চমৎকৃত করল। নর্মদার তটভূমি থেকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে যে গভীর বনময় স্থানটি আকাশের সঙ্গে মিশেছিল, তার উপরে উঠল পাথরের আর এক মন্দির—অভ্যন্তরে গঙ্গোনাথ মহাদেবের স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-পীঠ। পাশে আর এক মন্দিরে দেবী সরস্বতীর অপরূপ প্রস্তরময়ী মূর্তি। অন্য দিকে সেই বিশাল গুহা। এখানেই গঙ্গোনাথের স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-প্রবর্ত্তক মহাসাধকের বহু-যুগব্যাপী তপস্যা চলেছিল।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, গঙ্গোনাথের নাম ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তীর কথা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য গঙ্গোনাথ দেবতা বরাবর লোকচক্ষুর অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন ছিলেন। সিদ্ধ তাপসের সাধনালব্ধ শক্তির প্রভাবে পারিপার্শ্বিক বিস্ময়কর আবেষ্টনের সঙ্গে গঙ্গোনাথের এই অপূর্ব প্রকাশ সর্বসাধারণকে চমৎকৃত করল। আবার লোক মুখে রাষ্ট্র হতে লাগল—নানা কথা, কাহিনী ও অলৌকিক আখ্যায়িকা; বিশ্বাসী অধিবাসীদের অন্তরে এই ধারণাই দৃঢ় হলো যে—বাবা গঙ্গোনাথই এ-সব করেছেন, সাধু বাবাই স্বয়ং গঙ্গোনাথ!

গৌরকান্তি উন্নতদেহ দীর্ঘবাহু দিব্যমূর্তি এই সাধুটিকে দর্শনমাত্রই তাঁকে কোন দিব্যশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ ভেবে অতি বড় দাম্ভিকের মাথাও শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ে। অথচ, তাঁর সদা-হাস্য মুখ, আত্মভোলা ভাব, শিশুসুলভ মনোবৃত্তি দেখে কল্পনাও করা যায় না যে, এই মানুষটির মধ্যে দীর্ঘ-যুগব্যাপী তপঃশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ষীয়ান পুরুষরা এঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ করেই আনন্দে অভিভূত হয়ে ভাবেন যে, বুঝি জীবনের একটা দীর্ঘ অংশ এই সদানন্দময় সাধুটির সঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে। বালকবালিকা, তথা—কিশোর কিশোরীরা গঙ্গোনাথ দর্শনে এলে সাধুজী সানন্দে তাদের সঙ্গে মিশে এমনভাবে বালসুলভ খেলা-ধুলা দৌড়-ঝাঁপে মেতে ওঠেন যে, তারা এই আশ্চর্য মানুষটিকে তাদের ক্রীড়া-সাথী ভেবে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে। তারপর নর্মদা পরিক্রমাব্রতী সংসারত্যাগী বিভিন্ন বয়সের পর্যটকগণও নর্মদার তটভূমির উপর এমন একটি

বিশ্রাম-স্থানের সন্ধান পেয়ে ধন্য হন। সাধুজীও এখানে প্রত্যেককে সাদর আহ্বানে ও আহার্য দানে এমনভাবে আপ্যায়িত করেন যে, তাঁরা সর্বাধিক দুর্গম স্থানে আতিথ্য সৎকারের এমন ত্রুটিহীন আয়োজন দেখে বিস্ময়ানন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু সাধুকেই এর নিয়ন্তা জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেলেই তিনি বালকের মত নির্মল হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে জানিয়ে দেন—'এ সব হচ্ছে গঙ্গোনাথজীর লীলা।' যাঁরা নর্মদামায়ীকে প্রদক্ষিণ করবেন, এই জায়গাটিতে এসে তাঁদের একটু বিশ্রাম নেওয়া চাইই, কিন্তু স্থানের দুর্গমতার জন্যে কেউ এখানে বিশ্রাম করবার সুযোগ পেতেন না, কোন রকমে নর্মদামায়ীকে পরশ করেই অন্যত্র ছুটতেন আশ্রয় নেবার আশায়। কিন্তু এইখানেই কোন সুদুর্গম স্থানে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ মূর্তিকে গঙ্গোনাথ অধিষ্ঠিত রয়েছেন জেনেও—তাঁদের দর্শনের সৌভাগ্য হোত না। এখন তাঁদের ধারণা, ভক্তদের এই দুর্ভোগ দূর করবার জন্যেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এর পর নবীন যাত্রীদের প্রতি পরিক্রমা সম্বন্ধে সাধুজীর উপদেশগুলিও পাথেয় স্বরূপ হয়ে তাঁদের যাত্রাপথ সুগম করে দেয়। ফলত, এই সিদ্ধাশ্রমের সংস্পর্শে এসে পর্যটকগণ পুণ্যসলিলা নর্মদা-জননীর পরশ পেয়ে, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে স্থাপিত মন্দিরে গঙ্গোনাথ মহাদেব ও দেবী সরস্বতীর মূর্তি দর্শন করে এবং আশ্রমস্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর আদর আপ্যায়নে ধন্য হয়ে তাঁর উদ্দেশেও জয়ধ্বনি না তুলে পারতেন না। তখন—জয় মা নর্মদে, জয় ভগবান গঙ্গোনাথজী, জয় দেবী সরস্বতী, জয় জয় ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ। নামগুলি একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে এই সুপবিত্র সিদ্ধ স্থানটিকে মুখরিত করে তোলে।

পথে যেতে যেতে স্থানে স্থানে এমন কোন কোন বর্ষীয়ান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হোত এঁদের—যাঁরা পর্যটনকারী সাধুদের পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন ফল জল দুগ্ধ প্রভৃতি মোটামুটি আহার্য নিয়ে। গঙ্গোনাথ মন্দিরে আশ্রয় নিতে এঁরাই নির্দেশ দেন পথশ্রান্ত পান্থদিগকে এবং এঁদের মুখেই গঙ্গোনাথের প্রকাশের সঙ্গে সাধুজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অলৌকিক কাহিনী প্রকাশ পায়। এঁদের মতে মহারাজই স্বয়ং গঙ্গোনাথ?

ধ্যানানন্দ বলেন: আশ্চর্য এই যে, নিকটে গিয়েও গঙ্গোনাথ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নি। কি ভুলই করেছিলাম!

পীতাম্বর তাঁকে সান্ত্বনা দেন: আমার অদৃষ্টে রয়েছে আপনার সঙ্গলাভ,

এক সঙ্গে দুজনে গিয়ে তাঁকে দর্শন করি—এই হয়ত গঙ্গোনাথের ইচ্ছা। সে-ইচ্ছা এবার পূর্ণ হবে।

ধ্যানানন্দ তাঁর বালক-সঙ্গীটিকে নিয়ে সারা পথ ভয়ে ভয়েই এসেছেন। প্রতি পদক্ষেপেই ভেবেছেন ঐ বুঝি তাঁর উন্মাদ গুরুদেব দণ্ড-হস্তে ধেয়ে আসছেন। বনপথে কোন হিংস্র জন্তুর হুঙ্কার বা পদশব্দ শুনলেই শিউরে উঠেছেন—ঐ বুঝি গুরুদেব তর্জন করে শাসাচ্ছেন। কিন্তু গুরুর ভয়ে তিনি অভিভূত হলেও, তাঁর সঙ্গীর মুখে ভয়ের ছায়াও পড়ে নাই ; বরং ধ্যানানন্দজীর ভীষণ প্রকৃতি গুরুমহারাজকে দেখবার জন্য তাঁর চোখ মুখে সর্বক্ষণই কৌতুহলের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ভয়ার্ত সঙ্গীকে বরাবরই তিনি আশ্বাস দিয়েছেন : নর্মদামায়ীকে পরিক্রমণ করবার মত দুঃসাহস যখন আপনার মনে, তবুও কেন ভয় পাচ্ছেন ? আমরা ব্রহ্মচারী, আমাদের উচিত ভয়কে জয় করা।

ধ্যানানন্দ বলেন : আমি হিংস্র বাঘের সামনে যেতেও ভয় পাই না, কিন্তু গুরুমহারাজের সেই মূর্তি মনে পড়লেই শিউরে উঠি ভয়ে।

কিন্তু ধ্যানানন্দজীর সৌভাগ্যক্রমে এই দীর্ঘ পথের মধ্যে, এবং যে-মন্দিরে গুরুদেব বাস করেন, তারই এলাকা পার হয়ে আসবার সময়ও গুরু সন্দর্শন ঘটে নাই, গুরুর হুঙ্কারও তাঁর কানে প্রবেশ করে নাই। পীতাম্বরই বরং সকৌতুকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন : কোথায় আপনার গুরু—কোন সাড়া শব্দই ত তাঁর পাচ্ছি না। আপনি পথ হারিয়ে ফেলেননি ত ?

ধ্যানানন্দজী তখন দূরবর্তী বনানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বুঝি কোন দর্শনীয় বস্তুর অন্বেষণ করছিলেন। সহসা উৎফুল্ল মুখে উল্লাসের সুরে বললেন : পথ যে আমি হারাই নি, ঐ দেখ তার সাক্ষী—গঙ্গোনাথজীর মন্দিরের চূড়া! সেবার এখান থেকেই বিদায় নিয়ে পালিয়েছিলাম। আমার গুরু-মহারাজ যে-মন্দিরে থাকেন, সে স্থান আমরা পার হয়ে এসেছি—ধরতে পারি নি। এসো ভাই, আমরা গঙ্গোনাথজীকে এখান থেকেই প্রণাম করি। উভয়েই সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলেন : জয় গঙ্গোনাথজী।

তখন নর্মদার পশ্চিম প্রান্তে বিক্ষিপ্ত পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বর্ণরশ্মির আভা ছড়িয়ে অপরাহ্ণের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হচ্ছিলেন। সেই বিক্ষিপ্ত রশ্মির একাংশ গঙ্গোনাথ মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াটির উপর পড়ে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছিল।

পীতাম্বর বললেন : আমরা প্রথমে নর্মদামায়ীকে প্রণাম করব, তাঁকে পরশ করে পবিত্র হয়ে গঙ্গোনাথজীর সঙ্গে সাধু মহারাজকে দর্শন করে তার পর যাব আপনার গুরুজীর আশ্রমে।

ধ্যানানন্দ বললেন : সেই ভাল। গঙ্গোনাথের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেই গুরু দর্শনে যাব।

এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত পথ সুগম্য। পঁহুছিতে বিলম্ব হলো না; কিন্তু মন্দির সান্নিধ্যে এসে উভয়েই স্তব্ধ হয়ে একই সঙ্গে স্থাণুর মত নীরবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবিস্ময়ে দেখলেন—পর্বত শৃঙ্গের উপরেই গঙ্গোনাথের মন্দির। তারই দ্বার থেকে এক দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী বহু নিম্নে নর্মদা তট পর্যন্ত নেমে এসেছে; আর সেই সোপান-পথে এক দিব্যকান্তি দীর্ঘ মূর্তি বর্ষীয়ান পুরুষ দু' হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি জলপুর্ণ তাম্র কলস বহন করে অবলীলাক্রমে মন্দিরে চলেছেন। এ দেখে এঁদের মনে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠবার কারণ হচ্ছে—দীর্ঘ মূর্তি পুরুষটির হাতের ঘড়া দুটির আয়তন এত বৃহৎ যে, জলপুর্ণ অবস্থায় প্রত্যেকটি এক একটি বলিষ্ঠ যুবার বহনের পক্ষে যথেষ্ট, অথচ ইনি কিনা একাই এ-হেন অতিকায় জলপুর্ণ পাত্র দুটি দু' হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সোপান বেয়ে উঠছেন।

সেই অবস্থায় সোপান-পথে উঠতে উঠতে সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সহসা পিছনে ফিরে তাকাতেই আগন্তুকদের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল; সেই সঙ্গে মনে হল এঁদের, মহাপুরুষ চোখের ইঙ্গিতে উভয়কেই তাঁর নিকটে যাবার জন্য আহ্বান করলেন। তখন ধ্যানানন্দ ও পীতাম্বর দু'জনেই দ্রুতপদে সোপান পথে উঠে গিয়ে এক সঙ্গে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন।

কলস দু'টি দু'হাতে ধরে থেকেই সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষটি এতক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁরা উভয়ে প্রণাম করতেই বললেন : নমো নারায়ণায়।

পীতাম্বর বললেন : বাবা, আপনার ঘড়া দুটো আমাদের হাতে দিন, আমরা মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি।

সাধু পুরুষ সহাস্যে বললেন : তোমার চেয়েও আমার ঘড়া বেশী ভারী।

ধ্যানানন্দ যুক্তকরে সবিনয়ে বললেন : তাহলে আমাকে দিন, আমি না হয় দু'বারেই নিয়ে যাব।

সাধু পুরুষ তেমনি হেসে বললেন : বুড়ো হলেও আমি এ ভার বইতে পারি—কোন কষ্ট হয় না। এরা দুটিই আমার বড় প্রিয়, এদের নাম হচ্ছে রাম ও লছমন্। দেখছি তোমরা নবাগত–ধুলাপায়েই এখানে এসেছ। আগে নর্মদাজীকে পরশ করে প্রণাম জানাও, তার পর এই সোপান বেয়ে উপরে এসো। তোমরা এখানে অতিথি।

কথাগুলি বলেই সাধুজী উপরে উঠতে লাগলেন। ব্রহ্মচারীদের বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, ইনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ।

উভয়েই অতঃপর দ্রুতপদে সেই দীর্ঘ সোপানরাজি অবলম্বনে নর্মদাতটে নেমে এলেন। নদীর উপকূলে ভূমিষ্ঠ হয়ে তার পুত বারি স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদন করলেন। ধ্যানানন্দ বললেন : চলো মন্দিরে গঙ্গোনাথজীকে দর্শন করে সাধুজীর সঙ্গে আলাপ করি। সন্ধ্যার মুখে স্নান করা যাবে।

নীরবে সম্মতি জানিয়ে পীতাম্বর ধ্যানানন্দের অনুগমন করলেন।

সাত

গঙ্গোনাথের মন্দির ও স্বয়ম্ভুমূর্তি দর্শন করে উভয়েই আনন্দে অভিভূত হলেন। নর্মদার পবিত্র জল স্পর্শ করে তাঁদের দীর্ঘ পর্য্যটনের ক্লান্তি মোচন হয়েছিল। এখন স্বয়ম্ভুমূর্তি দর্শন করে দেহে মনে পরম শান্তি পেলেন। সেই দীর্ঘাকৃতি সাধু তখন মন্দিরের বাইরে ছাদযুক্ত প্রশস্ত অলিন্দে অখণ্ড-ধুনীর সামনে বসেছিলেন। তাঁর আহ্বানে উভয়ে নিকটে এসে বসলেন। সাধুর দৃষ্টি বাল-ব্রহ্মচারী পীতাম্বরের মুখে নিবদ্ধ, পীতাম্বরও সাধুর পানে তাকিয়ে ছিলেন—আবার উভয়ের দৃষ্টি সংযোগ হলো। সাধুর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে দেখে ধ্যানানন্দ তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন : অদ্ভুত ছেলে। উপনয়নের পর দণ্ডীঘর থেকেই পালিয়ে এসেছে। এই বয়সেই নর্মদা পরিক্রমার ব্রত নিয়েছে। এখনো দীক্ষা হয় নি।

পীতাম্বরের দিকে তখনো সাধু তাকিয়েছিলেন, মুখে সেই নির্মল হাসি। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট স্বরে বললেন : যে ভাগ্যবান, গোড়া থেকেই তার মনের ইচ্ছা সবই পূর্ণ হয়।

চোখ দুটি বিস্ফারিত করে পীতাম্বর সাধুর দিকে চাইলেন। এই সাধুকে

দেখেই তিনিও ভাবাবিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মনে শুধু এই চিন্তাই উঠছিল— কত মানুষ ত দেখেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পুরুষ আমার চোখে কখনো পড়েনি। এখনো ভাল করে আলাপ হয় নি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমার অন্তরাত্মা যেন আকুল হয়ে বলছে—ইনিই আমার গুরু, জন্মজন্মান্তরের গুরু! এইভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থাতেই তিনি ভাবাবেগে বলে উঠলেন: বাবা! আমি মুর্খ, অজ্ঞান, বিদ্যা শিক্ষা বলতে কিছুই শিখিনি, কিছুই জানি না; কিন্তু উপনয়ন হতেই আমার মনে এই প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। মনে হতে থাকে—সংসারে আবদ্ধ থেকে গৃহী হতে আমি কিছুতেই পারব না। তাই বেরিয়ে পড়ি; আমার ধারণা—এ পথেই আমার ইষ্টলাভ হবে।

সাধুজী তাঁর দীর্ঘ দুটি বাহু বাড়িয়ে বালককে সস্নেহে কোলের কাছে টেনে এনে বললেন: ধ্রুবও এমনি বিশ্বাসে ভর করে সাধনার পথে বেরিয়েছিলেন। তাঁর ইষ্টলাভ হয়েছিল, তোমারও হবে। মাতাজীর কৃপা তুমি অনেক আগেই পেয়েছ—তিনিই তোমাকে এগিয়ে এনেছেন। আমিও যে এমনি একটি বাল-ভক্তের প্রতীক্ষায় আছি। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার প্রতীক্ষার সেই বালক—তুমি। তোমার প্রয়োজন হচ্ছে এখন দীক্ষা, তার পর শিক্ষা। সাধনার পথে এ দুটিই চাই। দীক্ষা না হলে সাধনা হবে না, শিক্ষা না পেলে সিদ্ধি আসে না।

পীতাম্বরের মুখখানি সাধুজীর কথায় আনন্দে ঝলমল করে উঠল; উল্লাসের সুরে বললেন: আপনি যেন অন্তর্যামীর মতই দীক্ষা আর শিক্ষার কথা বললেন, এ দুটির কোনটিই যে আমার হয় নি, এই জন্যেই বুঝি মায়ীনর্মদা আমাকে এখানে আনলেন। আর ধ্যানানন্দজীও তাঁরই ইচ্ছায় সাথী হয়ে পথ দেখিয়ে সাধু মহারাজের আশ্রমে এনে আমাকে ধন্য করলেন।

সাধুজী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ধ্যানানন্দের দিকে তাকাতেই তিনি সবিনয়ে নর্মদার এক উপকূলে বালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁর আলাপ, তারপর বালকের কথায় কি সূত্রে এখানে আবার ফিরে আসেন, সবই বললেন।

কথা-প্রসঙ্গে ধ্যানানন্দের উন্মাদগুরু গৌরীশঙ্কর ব্রহ্মচারীর কাহিনী শুনে তিনি স্মিতমুখে বললেন: তুমি তাহলে গৌরীশঙ্করজীর মন্ত্র শিষ্য— তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিলে, তারপর, তাঁর অনাচারী কাণ্ড দেখে ভয়ে

পালিয়েছিলে? তাহলে ত এই বালকই তার বিবেক বুদ্ধি চালিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে। এসবও ঐ নর্মদা মায়ীর লীলা।

এ-কথা শুনে বালক পীতাম্বরই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে তিনি এখন কোথায় মহারাজ? নিজের সেই আশ্রমেই আছেন কি?

ব্রহ্মানন্দজী বললেন: কোথায় যে কখন থাকেন তিনি, তার কোন স্থিরতা নেই। এক জায়গায় ত তিনি বরাবর থাকেন না, আর থাকতেও পারেন না কোথাও স্থির হয়ে এক জায়গায়।

ধ্যানানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন: কেন এমন হয় মহারাজ? এখনো কি নর্মদামায়ীর উপর তাঁর তেমনি আক্রোশ আছে?

মৃদু হেসে ব্রহ্মানন্দজী বললেন: সে দোষ তাঁর নয়। অনেক পুঁথি পড়েছেন, বিদ্যা যেন পোকার মতন তাঁর মাথার ভিতরে কিলবিল করে বেড়ায়, কিন্তু দেমাক থেকে বিদ্যা বার করে দেবার ফুরসতও মেলেনি। তবে এবার দেখছি আদায় করবার লোক এসেছে, আর চিন্তা নেই।

কথাগুলি বলেই তিনি পীতাম্বরের দিকে পুর্ববৎ হাসি মুখে তাকালেন। পরক্ষণে ধ্যানানন্দকে বললেন: দীক্ষার পর শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে, গুরুর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সেরা সেরা রত্নগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করা। যে বেশী সাহসী আর বুদ্ধিমান, সেগুলি নিয়ে নিজের ভাণ্ডার ভরিয়ে ফেলে। দীক্ষা নেবার পর তুমি কিন্তু গুরুর উপর নির্ভর করতে না পেরে মন্দিরে সেঁধিয়েছিলে রুদ্র পুজা করতে, তাতেই তিনি বিরূপ হন তোমার প্রতি।

সাধুজীর কথায় ধ্যানানন্দের মনের সংশয় কেটে যায়; বুঝতে পারেন তিনি, সত্যই ত—দীক্ষা লাভের পর গুরুর কাছে উপদেশ নেবার জন্যে কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন নি। পীতাম্বরও অর্থপুর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন; উভয়ের অন্তর থেকেই যেন একটা দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেল।

ক্ষণকাল নীরব থেকে সাধু মহারাজ বললেন: দেব বিগ্রহের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ দেখে মন্দিরগুলির পাণ্ডারা মিলিত হয়ে তাঁকে একটা গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছেন শুনেছি। তিনিও সেই শাস্তি মেনে নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

এই সময় কতিপয় পর্যটনকারী শিষ্য এসে সাধুজীর চরণবন্দনা করে তাঁকে ঘিরে বসলেন উপদেশ শোনবার উদ্দেশ্যে। এই মন্দির থেকে কিছুটা

নীচে পিছনের দিকে শিষ্যদের আশ্রম এবং পর্য্যটকদের জন্য ধর্মশালা, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান। শিষ্যবর্গ এবং অতিথি অভ্যাগতদের জন্যই এই সব ব্যবস্থা করেছেন সাধু ব্রহ্মানন্দজী। শিষ্যদের দিকে একবার চেয়ে সাধুজী বললেন: এরা এখানেই থাকে, তোমরা হয়ত ভাবছিলে এত বড় একটা আশ্রমে এই বৃদ্ধটি একাই বাস করে। আরো অনেকে ধর্মশালায় আছে—তারা পর্যটক; কিন্তু এরা আমার শিষ্য—এখানেই বরাবর থাকে। সন্ধ্যার পর আমাদের ধর্মালোচনা হয়। তোমরা শীঘ্র সায়ংকৃত্য সেরে এস।

ধ্যানানন্দ ও পীতাম্বর দুজনেই পুনরায় নর্মদা-তটে গিয়ে স্নান ও উপাসনাদি করলেন। তারপর সাধুর আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁদের জন্য আহার্য প্রস্তুত। শালপাতার উপর এক একটি পলান্নের প্রকাণ্ড গোলক, কিছু ভাজি ও দধি।

সাধুজী সস্নেহে বললেন: সারা দিন অভুক্ত আছ, আগে ভোজন হয়ে যাক; তারপর অন্য কথা। বসে পড়।

পাশাপাশি উভয়ে বসে সম্মুখে পাতার উপর অদ্ভুত আহার্য দেখে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতেই সাধুজী সহাস্যে বললেন: আর শোন, পরিক্রমাকারীদের জন্যেই এখানে বিশ্রামের ব্যবস্থা। এখানে একটা ছেদ পড়ে। বিশ্রাম অন্তে এখান থেকেই আবার পরিক্রমার নূতন পর্ব সুরু হবে। তাহলেই বুঝতে পারছ, এখানে থাকলেও পরিক্রমার বিধি ভঙ্গ হয় না।

উভয়ে নীরবেই শুনছিলেন আনন্দময় সাধু পুরুষের কথা, সম্মুখে আহার্য, ভুলে গেছেন খাবার কথা, মন ও দৃষ্টি সাধুর দিকে। সাধুই তখন বললেন: এবার পাতার পানে চাও, গোলা ভাঙ।

তোমরা এখানে নতুন এসেছ, তাই ঐ গোলার সঙ্গে পরিচয় নেই। ওটি আমারই সৃষ্টি—যে কোন একজন এই একটি মাত্র গোলা পুরোপুরি খেলেই তৃপ্তি পাবে, এমন পরিমাণে ঘী মসলার সাহায্যে খিচুড়ি পাক করে এই গোলা তৈরী করা হয়।

পাতের উপর অন্নময় হরিদ্রাভ গোলক দেখে উভয়েই ইতস্তত: করছিলেন; পীতাম্বরের পাতের গোলকটি অবশ্য আয়তনে খানিকটা ক্ষুদ্র, যেন হিসাব করে তৈরী হয়েছে। এখন পরিচয় শুনে আনন্দের সঙ্গে হাসি যেন আর

মুখে ধরে না। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উভয়ে সেই সুস্বাদু খাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে থাকেন। সাধুজীও কথা প্রসঙ্গে বললেন: এখানকার আশ্রমে যখন ভাণ্ডারা হয়, তার খবর ছড়িয়ে পড়লে চারিদিকের দশ দশ ক্রোশ থেকে লোক ছুটে আসে এই গোলার লোভে।

খেতে খেতে উভয় ব্রহ্মচারী সকৌতুকে সাধুজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, তাঁর কথাগুলি যেন পাতের সুখাদ্যের মতই মিষ্ট। হঠাৎ সাধুজী বললেন: এখন একটা হাসির গল্প বলি শোন। একবার আমি বরদার রাজধানীতে গিয়েছিলাম, তখন শিওজীরাও গায়কোয়াড় বরোদার মহারাজ। বরোদায় গিয়ে শুনেছিলাম, মহারাজার নাকি খুব জবর রকমের এক চাঁদির তোপ আছে। মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—'আপনার প্রাসাদে নাকি এক চাঁদির তোপ আছে?' মহারাজ জানালেন—'হ্যাঁ—আছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'সে তোপ থেকে গোলা কতদূর পর্যন্ত ছোটে?' বরদারাজ বললেন—'প্রায় এক মাইল যায়।' আমি তখন মহারাজের কথাটাকে খাঁটো করবার উদ্দেশ্যে বললাম—'আপ কো তোপ কুছ নাহি হ্যায় হামারি গোলা চারি খুঁটমে দশ দশ ক্রোশ তক ঘুমতা হ্যায়।' মহারাজ অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন, কথাটা বুঝতে পারেন না; তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম—'ইহ হামারী খিচুড়ীকা গোলা।' মহারাজও তখন আসল কথাটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বললেন—'সাধুকে গোলাকা সাথ হামারি গোলা কেসা সেক্‌তা হ্যায় বলিয়ে?'

গল্প শুনতে শুনতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে উভয় ব্রহ্মচারীর ভোজন শেষ হলো। তখন ধুনীর সামনে সাধুজী একা বসে আছেন, শিষ্যরা সব চলে গেছেন। খানিক পরেই ধর্মশালা থেকে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজতে লাগল। সাধুজী বললেন: অপরাহ্ণের অনেক আগেই ওখানে ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। কোন বিশেষ কারণে আজ সন্ধ্যার পর ব্যবস্থা হয়েছে। আশ্রমে লোকজন সকলে ভোজনে বসলেই ঘণ্টা বাজিয়ে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়—যদি কেউ অভুক্ত থাকে ত এসে পড়ুক। সবার ভোজন হয়ে গেলে, আর একবার ঘণ্টা বাজিয়ে সেই সঙ্গে অভুক্তদের উদ্দেশ্যে ডাক দেওয়া হয়, যখন আর কেউ আসে না—তখন আমার ভোজন সুরু হয়।

দুই ব্রহ্মচারী সবিস্ময়ে সাধুজীর কথা শুনতে থাকেন। খানিক পরে

পুনরায় ঘণ্টা বাজল, সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ কণ্ঠের আহ্বানও শোনা গেল—কেউ যদি কোথাও অভুক্ত এখনো থাক—শীগগীর এস, এখনি ফটক বন্ধ হবে।

পীতাম্বর সহসা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি ভোজন করবেন না?

সাধুজী ধূনীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন: আমার গোলাও ওরা রেখে গেছে, ঐ দেখ ধূনীর পাশে গরম হচ্ছে। যখন জানব যে আর কেউ ভোজন করতে নেই, তখন আমি ভোজন করব। কিন্তু এমনি গঙ্গোনাথজীর লীলা, আমার ভোজনের পর আর কিছুই থাকে না—সব শেষ হয়ে যায়।

ধ্যানানন্দ ও পীতাম্বর উভয়েই দেখলেন, একটি পাত্রের উপর একই আকারের গোলক, ভাজি ও দধি। কোনও রকম তারতম্য নেই।

প্রত্যূষে উঠেই পীতাম্বর সাধুজীর চরণ বন্দনা করে বললেন: রাতে স্বপ্ন দেখেছি—সাধু মহারাজ যেন আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন।

মৃদু হেসে সাধুজী বললেন: তাহলে স্বপ্নে যা দেখেছ, এখন সত্য হোক। এর পর মিলিয়ে নিও। প্রাতঃকৃত্য সেরে তাড়াতাড়ি স্নান করে এস; সত্যিই আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। এ হচ্ছে নর্মদামায়ীর হুকুম।

নিজের সেই অখণ্ড-ধূনীর কাছে পীতাম্বরকে বসিয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর বালক ব্রহ্মচারীর মনে হলো তিনি যেন নবজীবন লাভ করেছেন। মনে হতে থাকে, অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে যেন আর একটা প্রচণ্ড শক্তি এসে মিশে গেল।

দীক্ষাদানের পর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ পীতাম্বরকে বললেন: তুমি এখন থেকে শাস্ত্রসম্মত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হলে।

পীতাম্বর বললেন: আমাকে আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কাকে বলে।

বালকের কথায় সন্তুষ্ট হয়েই ব্রহ্মানন্দজী স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: শাস্ত্রে দুই রকম ব্রহ্মচারীর উল্লেখ আছে, উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁরা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, তারপর গুরুগৃহে বাস করেন, সেখানেই বেদাদি অধ্যয়নের পর যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে আবার গৃহে ফিরে যান, তাঁরা হলেন উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী। এঁরা বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন

করবেন, তবে বিবাহ হবে পুত্রার্থে। অর্থাৎ বংশরক্ষার জন্য পুত্র পাবার আশাতেই বিবাহ। সংসার-ধর্মে লিপ্ত হলেও মনে রাখবেন এঁরা—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ পরিশোধ করবার জন্যই এঁদের সংসারধর্মে লিপ্ত হওয়া। দেব-ঋণ হচ্ছে যজ্ঞ, ঋষি-ঋণ আচার-নিষ্ঠা, পিতৃ-ঋণ বংশরক্ষা, আর মনুষ্য-ঋণ জীব সেবা। পরিণত বয়সে ব্রহ্মচারী একা বা সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। আর, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হচ্ছেন তাঁরা—যাঁরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেই চিরব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, গৃহে ফেরবার কোন আশাই রাখেন না, যেমন—আমি, তুমি। তোমার মধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গুণ দেখেই আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়ে পরম আনন্দ পেয়েছি। তবে তুমিও মনে রেখ যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হলেও তার জীবনের ব্রত হবে জীবকে শিবজ্ঞানে ভাবা, আর্তের সেবা, মানবতার পূজা। আমি কিন্তু এখনই দিব্য দৃষ্টিতে দেখছি, এ-ব্রত তুমি সুন্দরভাবে পালন করতে সমর্থ হবে, মনুষ্য সমাজের অনেক কল্যাণ তুমি করবে, অসংখ্য শিষ্য-পরিবৃত হয়ে তুমি বিপুল প্রতিষ্ঠা পাবে। ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেই আমি তোমার নামাকরণ করলাম—**বালানন্দ**।

আট

দীক্ষার পর বালক পীতাম্বর বালানন্দ নামে অভিহিত হলেন। সাধু মহারাজ বললেন : কেতাব পড়িয়ে তোমাকে শিক্ষা দেবার মত বিদ্যা, ধৈর্য বা উৎসাহ আমার নেই। তবে মুখে মুখে আমি উপদেশ দেব, তুমি মন দিয়ে শুনতে থাক। এর পর যদি কোন দিন ঐ পাগলা সাধু গৌরীশঙ্করজীর দেখা মিলে যায়, তাহলে কেতাবী বিদ্যাটাও তার কাছ থেকে আদায় করে নিও—বিদ্যার ভারে সে বেচারী অস্থির হয়ে পড়েছে।

সাধু মহারাজ যে সব উপদেশ দেন, বালানন্দের সঙ্গে ধ্যানানন্দও সে সব শুনে ধন্য হন, আনন্দ পান। বালক বালানন্দ কিন্তু অবসর সময়ে একাই নর্মদার তীর ধরে দুর্গম পাহাড়ের দিকে যান, সেখানে তন্ন তন্ন করে উন্মাদ সাধু গৌরীশঙ্করজীর সন্ধান করেন। তাঁর সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যে নির্দেশটি দিয়েছেন—বালক সেটি পরম সত্য ভেবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছেন। বালকের ধারণা, বাক্‌সিদ্ধ সাধুর কথা কখনো অমূলক হতে পারে না—

গৌরীশঙ্কর মহারাজ নিশ্চয়ই কোন দুর্গম গুহার মধ্যে স্বেচ্ছাবদ্ধ হয়ে ধ্যান করছেন, আর এর পিছনে কোনও রহস্য হয়ত আছে।

ধ্যানানন্দ কিন্তু বেশী দিন এই আশ্রমে পড়ে থাকতে সম্মত হলেন না—পাছে তাঁর নর্মদা পরিক্রমার সংকল্প ব্যর্থ হয়, এই আশংকায়। তিনি বালানন্দকে সে কথা জানালেন—একেবারে দণ্ড কমণ্ডলু ও ঝোলাঝুলি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে।

বালানন্দ বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: গুরুদর্শন করবেন না? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনার কর্তব্য আগে গুরুর সন্ধান করে তাঁর পরিচর্যা। তার পরে—

ধ্যানানন্দ বালকের কথায় বাধা দিয়ে বললেন: আমার কর্ত্তব্য এখন থেকে তোমাকেই পালন করতে হবে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজও বলেছেন- তিনিই তোমার ভাবী শিক্ষাগুরু। ওঁর আশীর্বাদে তুমি হয়ত তাঁর সন্ধান পাবে। কিন্তু আমার সে ধৈর্য নেই; পরিক্রমার প্রলোভন আমাকে কঠোর ভাবে আকর্ষণ করছে। আমার স্থির সংকল্প শুনে সাধু মহারাজ বাধা দেন নি, তুমিও তাই দিয়ো না।

বালানন্দ গম্ভীরমুখে বললেন: বেশ, তাই হোক; আমি একাই আমার ভাবী শিক্ষাগুরু গৌরীশঙ্করজীর সন্ধান করতে পারব। যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাঁকে নিয়েই পরিক্রমায় বার হব। না হয়, দীক্ষিত জীবনে শিক্ষার সঙ্গেই নুতন করে পরিক্রমা আরম্ভ করব। আপনি ত প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছেন, তাহলে আপনি আসুন- নমো নারায়ণায়।

এর পর আর সংলাপ চলে না। ধ্যানানন্দের চিত্তে তখন পরিক্রমার আকাংখা তীব্র হয়ে উঠেছে। তিনিও নমো নারায়ণায় বলে বেরিয়ে পড়লেন।

এ ব্যাপারে বালক সাধুর উৎসাহ আরও প্রবল হয়ে উঠল। যে দীক্ষাদাতা গুরুর প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্বেও মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যই তাঁকে উপেক্ষা করে ধ্যানানন্দ চলে গেলেন, সেই উপেক্ষিত মানুষটিকে নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করে তাঁকেই শিক্ষাগুরুর আসনে বসাবার অভিপ্রায়ে একাগ্রচিত্তে তিনি সমগ্র বনভূমি পর্যটনের ব্রত নিলেন। দেবী নর্মদাকে উদ্দেশ করে বালক কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন—তোমারই পরিক্রমার ব্রত নিয়ে মাগো, আমি এমন এক অদ্ভুত প্রকৃতি সাধুর কথা শুনিছি, যিনি জ্ঞান হারিয়ে উন্মাদের মত তোমার

নিগ্রহেও কুণ্ঠিত নন। আমি প্রাণপণ করেছি তাঁকে পাবার জন্য; আমার বিশ্বাস, তোমার কৃপাতেই আমি তাঁর মোহ দূর করতে পারব। তুমি আমার সহায় থেকো। আর, এও ত তোমারই কাজ মা! এর জন্যে আমার পরিক্রমার বিধি যদি ভঙ্গ হয়, আবার আমি নূতন করে এ কার্যে ব্রতী হব।

বালক সংকল্প করলেন—যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে।

বালকের ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, দৃষ্টি শুধু সম্মুখে; লক্ষ্য—বাঞ্ছিত মানুষটির সন্ধান। দীর্ঘ পর্যটনে প্রহরের পর প্রহর অতীত হয়ে গেল, বনপথে অবিশ্রান্ত পর্যটনে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হলো, তবু তাঁর গতির বিরাম নেই।

অপরাহ্নের দিকে সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই বালক বালানন্দ সহসা বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন। গঙ্গোনাথ থেকে বনপথে প্রবেশের সময় নর্মদার তটভূমি ছেড়ে গভীর বন প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল—নর্মদাকে ফেলে কত দূরেই এসেছেন। কিন্তু অপরাহ্নে এই স্থানটিতে আসতেই নিবিড় বনরাজির অন্তরালে প্রবাহিত নর্মদার শুভ্র জলধারা তাঁকে চমৎকৃত করে অন্তর মধ্যে আনন্দের ধারা বহিয়ে দিল। প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্যভরা ছবি তাঁর চোখের সামনে কে যেন প্রসারিত করে দিয়েছে—বৃক্ষশাখা ও পত্রপল্লবের ভিতর দিয়ে নর্মদার শোভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দারুণ সঙ্কটে কিম্বা দৈহিক কষ্টের সময় সম্মুখে মাতৃমূর্তি দেখলে সন্তান যেমন আকুল হয়ে তাঁর কোল লক্ষ্য করে ছুটে যায়, সারাদিনব্যাপী পথশ্রমে ক্লান্ত বালকের অন্তরটিও অদূরে প্রবাহিতা পুণ্যতোয়া নদীর স্নিগ্ধ জলরাশি দেখে তেমনি আনন্দে নেচে উঠল—তিনিও ছুটলেন নর্মদামায়ীর কোলে আশ্রয় নেবার জন্য।

নদীর জলে অবগাহন করে যথাবিহিতভাবে অর্চনার পর জলপানে তৃপ্ত হয়ে বালানন্দ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আনন্দে তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল; আপন মনে ভাব-গদগদ স্বরে বলে উঠলেন: সত্যই তুমি মা অন্তর্যামিনী; লক্ষ্য যদিও অন্যদিকে ফেলেছি, কিন্তু তোমাকে ভুলিনি; সর্বদাই উপলব্ধি করি—তুমি সঙ্গে আছ, সাথে সাথে ফিরছ। ভাবতাম আগে, এ সব মনের খেয়াল মাত্র, কিন্তু এখন তোমাকে দেখে বুঝছি মা, ভুল নয়—মায়ের মমতা নিয়ে তুমি ছেলের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছ। আমি ধন্য, ধন্য।

দু' হাতে বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু দুটি মুছে তীরের দিকে ফিরে আসতেই বালানন্দ দেখতে পেলেন, এক বৃদ্ধা লাঠির উপর দেহভার চাপিয়ে ধীরে ধীরে নদীর জলের দিকে নামছেন। বসতিহীন এ হেন নির্জন অঞ্চলে বর্ষীয়সী নারীটিকে দেখে বালানন্দ স্তব্ধভাবে তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

বৃদ্ধার দৃষ্টিও বালক বালানন্দের দিকে। খানিকটা এগিয়ে এসেই তিনি হাতের লাঠিটা কংকরময় তীরভূমিতে রেখে নিজেও বসে পড়লেন, তারপর হাতছানি দিয়ে বালানন্দকে কাছে আসবার জন্য ইসারা করলেন। বালানন্দ তৎক্ষণাৎ একটু ঝুঁকে নর্মদার পুণ্যবারি আর একবার মাথার উপর ছিটিয়ে কমণ্ডলুটি পূর্ণ করে বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন: তুমি খুব চালাক ছেলে, আমাকে এখানে এভাবে বসে পড়তে দেখেই বুঝতে পেরেছ যে, আমার তৃষ্ণা পেয়েছে; তাই জল নিয়ে ছুটে এসেছ!

বালানন্দ জলপূর্ণ কমণ্ডলু বৃদ্ধার সামনে রেখে বললেন: আপনি জল খান, যদি প্রয়োজন হয়—আবার জল ভরে আনব।

কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে কিছুটা জলপান করে বৃদ্ধা তৃপ্তির স্বরে বললেন: আঃ, বাঁচলুম—তুমি খুব লক্ষ্মীছেলে। তা বাপু, তুমি যেমন আমাকে জল খাওয়ালে, আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই।

বলতে বলতে বৃদ্ধা তাঁর কাপড়ের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র একটি পুঁটুলি বের করলেন। একখণ্ড পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ে খানিকটা বিভূতি ও প্রায় দু আঁচলা পরিমিত কালোকালো গোলমরিচ বাঁধা রয়েছে। বস্ত্রখণ্ডের অন্য প্রান্তে কাঁচা শালপাতায় মোড়া দুটি লাড্ডু। বিভূতি ও কালো মরিচগুলি একটি বার খুলে বালানন্দকে দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন: এই বিভূতি আর মরিচএর গুণের কথা পরে বলব। এখন তুমি নাড়ু দুটি খেয়ে ফেল ত বাছা।

বালানন্দ বললেন: কাছে নাড়ু থাকতে আপনি শুধু জল খেলেন কেন? বেশ, এখন আপনি একটি খান, জল ত যথেষ্ট রয়েছে, না হয় আবার আনছি।

বৃদ্ধা বললেন: আমার খাওয়া আগেই হয়ে গেছে—সেই জন্যেই ত জলের সন্ধানে আসি। এখন তুমি ও দুটি খাও দেখি; ভয় নেই, ভাল খাবার, আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি।

এমন স্নেহার্দ্রস্বরে বৃদ্ধা নাড়ু দুটি খাবার জন্য বালানন্দকে পীড়াপীড়ি

করতে লাগলেন যে, তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না, দুটো নাড়ুই তাঁকে খেতে হলো। খাওয়ার পর বৃদ্ধা কমণ্ডলুটি কাছে আগিয়ে দিলেন, বালানন্দও পাত্রের জলটুকু নিঃশেষ করে ফেললেন। তাঁর মনে হলো, সারা দিনের প্রচুর ক্ষুধা ও পথশ্রমজনিত অবসাদের যেন অবসান হয়ে গেল বৃদ্ধা-প্রদত্ত নাড়ু দুটি ভক্ষণ করে।

বৃদ্ধা এর পর পুলিন্দার ভিতর থেকে বিভূতি-মাখা দুটি মাত্র মরিচ বালানন্দের হাতে দিয়ে বললেন: মুখে রাখ—শুধু মুখশুদ্ধি নয়, দেহ মন পর্যন্ত শুদ্ধ হবে, দেহের ও মনের যত কিছু বিকার সব কেটে যাবে। ভয় নেই— মুখে দে।

বালানন্দ মরিচ দুটি মুখে দিলেন। বৃদ্ধা পুঁটুলিটি বালানন্দের হাতে দিয়ে বললেন: কাছে রেখে দে তুই, অনেক কাজে লাগবে। এর আর এক গুণ—পাগলের পাগলামী সারিয়ে দেয়। মানুষ ত ভালো হয়ই; পাগলা হাতীর পেটেও যদি এই সিদ্ধ-মরিচ এক মুঠো খানিকটা বিভূতির সঙ্গে পড়ে, তারও পাগলামি কেটে যায়।

কথাটা শুনেই বালানন্দ সচকিতভাবে বলে উঠলেন: পাগলামি কেটে যায়! বালকের মনে বিকৃত-মস্তিষ্ক সাধু গৌরীশঙ্করজীর কথা তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে; সেই সূত্রেই এই প্রশ্ন।

বৃদ্ধা এ প্রশ্ন শুনে আর একটু গম্ভীর হয়ে জোর গলায় উত্তর দিলেন: হ্যাঁ রে-হ্যাঁ; এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। যত বড়, যতদিনের—আর, যে-রকমেরই পাগল হোক না কেন—মানুষ হ'লে এক চিমটে বিভূতি আর তিনটি মরিচ পর পর তিন দিন খেলেই মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে—কোন দোষ বা গোল তার মাথায় আর থাকবে না।

বৃদ্ধার কথা শুনতে শুনতে বালানন্দের মনে হলো, তাঁর সর্বদেহের মধ্যে যেন অভিনব এক পুলকপ্রবাহ বয়ে গেল; সেই সঙ্গে সমস্ত রক্তও যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—দেহ ও মনের এ পরিবর্তন কিসে ঘটল? বৃদ্ধাদত্ত সিদ্ধ-মরিচ দুটির প্রভাবেই কি এরকম হলো?

বৃদ্ধা যেন বালকের মনোভাব বুঝতে পেরেই বললেন: তা ব'লে তুমি যেন বাছা সখ করে এ মরিচ খেয়ো না। যে দুটি খেয়েছ, এতেই তোমার দেহ মন মজবুত হয়ে যাবে। অনেক পুঁথি পড়ে কিম্বা দিনরাত জপ

তপ করে যে-সব সাধু পণ্ডিত মাথা বিগড়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়, এ-মরিচ তাদের জন্যে। তুমি এর গুণ পরীক্ষা করতেও পার।

বালক বালানন্দ নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধার পানে, মনের কথা মুখ দিয়ে আর ফুটে বের হয় না। বৃদ্ধা সেটা লক্ষ্য করে বললেন: ভাবছ বুঝি, কি করে পরীক্ষা করবে—সে রকম পাগল কোথায় পাবে? দেখ, এখান থেকে খানিক দূরে ঐ যে জোড়া শালগাছ দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশ দিয়ে একটা সরু গলি পথ সাপের মত এঁকে বেঁকে একটা টিপির গায়ে গিয়ে মিশেছে। আসলে কিন্তু সেটা টিপি নয়—ছোট একটা গুহা। তার ভিতরে থাকে একটা বনমানুষ। এমনি সেটা দুষ্টু যে, মানুষ দেখলেই ক্ষেপে ওঠে, মারতে আসে, ঠিক যেন—ডাকাত। কত চেষ্টা যে করছি তার কাছে যেতে, তাকে বলতে—ওরে হতভাগা, দুটো মরিচ-পড়া মুখে দে, তার ঝালে তোর মনের ভিতরকার বুনো ভাবটা শুধরে যাবে, মনটাও বদলাবে। কিন্তু সে কি শোনে আমার কথা? বনমানুষ ত বনমানুষ! চোখ মুখ পাকিয়ে ভয় দেখায়, হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারতে চায়। আমার কি? কথা না শুনলে বনমানুষ হয়েই এ'খানে থাকবেন।

বৃদ্ধার কথা শুনতে শুনতে বালানন্দের মনে প্রশ্ন জাগে—কে এ বনমানুষ। কার কথা বৃদ্ধা বলছেন? গৌরীশঙ্কর মহারাজের যে সব কদর্য কাণ্ড মনে হলেই তিনি চঞ্চল অস্থির হয়ে পড়েন, বৃদ্ধার কথিত বনমানুষের সঙ্গে তাঁর যেন সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কি বৃদ্ধা সেই গৌরীশঙ্করজীকেই বনমানুষ স্থির করে এভাবে আক্ষেপ করলেন? বৃদ্ধার কথার পিঠে বালানন্দ সাগ্রহে বললেন: আপনি যদি বলেন ত, আমি তাঁর কাছে যেতে পারি; আপনার এই বিভূতি আর মরিচ তাঁকে দিয়ে—

ঝংকার দিয়ে বৃদ্ধা বললেন: কেন—কিসের দায় তোর পড়েছে শুনি? বনমানুষের কাছে বুঝি মানুষ কখনো যায়? যদি কামড়ায়, আঁচড়ে দেয়, মারে—তখন?

মৃদু হেসে বালানন্দ বললেন: আমাকে সবাই ভালবাসে, কেউ মারে না, বকে না, কামড়ায় না। বনের পথে কতবার সাপের মুখে পড়েছি, এমনও হয়েছে—সাপ উঠেছে ফোঁস্ করে, ফণা তুলে; ভাবলুম বুঝি কামড়ালে; কিন্তু এমনি আশ্চর্য, চোখোচোখি হতেই দেখি, মাথা নীচু করে

সেই সাপ সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছে। আপনি চলুন না আমার সঙ্গে; দেখবেন, যত বড় দুরন্ত বনমানুষ হোন না কেন—আমি তার সঙ্গে এমনি ভাব করে ফেলব, যেন কতদিনের চেনা।

বৃদ্ধা সোল্লাসে বলে ওঠেন: ওরে বাবা! তুমি ত তাহলে বড় সাধারণ ছেলে নও দেখছি! সাপ তোমাকে ছোঁয় না—ফণা নামিয়ে পালিয়ে যায়, বনমানুষের নামেও তুমি ভয় পাও না—দেখা করতে চাও! তা বাপু, যা তোমার ইচ্ছা হয় কর, আমি আর কি বলি বলত? দেখ—যদি ঐ মরিচ-পড়া খাইয়ে তার ঘাড়ের ভূতটাকে নামাতে পারো। তাহলে তুমি যাও, আমিও আমার গেরামে যাই।

বালানন্দ বললেন: পারবেন আপনার গ্রামে একলা যেতে? কিন্তু এখানে গ্রাম কোথায়? কোন চিহ্ন ত দেখছি না। তাহলে চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বৃদ্ধা এবার মুখখানা শক্ত করে বললেন: নাবে বাপু—না; আর জ্বালাসনি আমাকে। যত সব পাগলের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণ যায়। বলে—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজেরই মাথা রাখার জায়গা মেলে না, দাঁতে কাটি এমন দানা জোটে না, এর ওপর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার একটা ফ্যাসাদ বাঁধাই আর কি।

বৃদ্ধার কথায় বালকের মুখখানা লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে, ছলছল চোখে বৃদ্ধার পানে চেয়ে বলে উঠলেন: না, না, আমি ত থাকব বলে আপনার সঙ্গে যেতে চাইনি, পাছে পথে একলা যেতে আপনার কষ্ট হয়, তাই আপনাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসবার কথা বলছিলাম।

বৃদ্ধাও ম্লান মুখে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন: আহা, মরে যাই। সত্যি বাছার আমার কি দয়ার শরীর! আমার কথায় খুব রাগ হয়েছে না? কি করি বল, বুড়ো হয়েছি, গুছিয়ে কথা বলতে পারিনে, একটুতেই রেগে উঠি। তা, আমারই বা দোষ কি বল? ঐ হতচ্ছাড়া বুনো মানুষটাই যে আমার এই হাল করেছে! হ্যাঁ, তাহলে এখন বলি তোমাকে বাছা, আচ্ছা করে ঐ মরিচ-পড়া সকালে বিকেলে দুটি বেলা দশটা করে দানা ঐ হতভাগারে গিলিয়ে দিতে পার, তাহলেই ওর মনের ঝাঁঝ নেমে যাবে, আর মনটাও হাল্কা হবে। এখন চল, আমিও উঠি।

বলেই বৃদ্ধা লাঠিখানা তুলে নিয়ে তার উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বালানন্দও তাড়াতাড়ি তাঁহার কমণ্ডলুটি নদীর জলে ভরে নিয়ে ঝুলি ও দণ্ডটি গুছিয়ে বৃদ্ধার কাছে এসে বললেন : চলুন!

লাঠি অবলম্বনে আগে আগে বৃদ্ধা এবং তাঁর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বালানন্দ ধীরে ধীরে নদী সৈকত থেকে উপরে উঠতে লাগলেন।

নয়

কিছুদূর অগ্রসর হতেই তাঁরা দেখলেন, বড় বড় দুটো শাল গাছ সংকীর্ণ বনপথটি রুদ্ধ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা বললেন : এই গাছ দুটোর কথাই বলেছিলুম তোমাকে। পাশাপাশি দুটিতে হাত ধরাধরি করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, দেখলে মনে হয় বুঝি আর রাস্তা নেই— এইখানেই শেষ হয়েছে।

বালানন্দ সুধালেন : আপনি এখন কোন্ দিকে যাবেন?

বৃদ্ধা বললেন : আমার পথ সামনেই। এই গাছ দুটো আমার পথ আটকাবে ভেবেছ বুঝি! আমি এদের পাশ কাটিয়ে ঠিক যাব, এখন তুমি কোথায় যাবে, সেইটি হচ্ছে কথা। তোমার পথটি দেখতে পেয়েছ?

চোখ দুটো তুলে বালানন্দ বৃদ্ধার পানে তাকালেন। বৃদ্ধা হেসে বললেন : কথাটা কি বুঝতে পার নি? পথের কথা জিজ্ঞাসা করছি। তুমি এখন কোন্ পথে যাবে?

মৃদু হেসে বালক সাধু বললেন : পথের কথা ত আগেই আপনি বলে দিয়েছেন। এই জোড়া গাছের পাশ দিয়ে যেতে হবে আমাকে। এইখানেই গুহা, আর তার ভিতরে একজন মানুষ আছেন বললেন না?

বালকের কথা শুনে, বৃদ্ধার মুখে হাসির একটা ঝলক খেলে গেল। তাঁর পানে তাকিয়ে বললেন : মনে আছে তাহলে!

বালানন্দ বললেন : কিন্তু পথ ত এখানে দেখছি না, খালি যে বন!

বৃদ্ধা বললেন : বোকা ছেলে, বনে না সেঁধুলে কি পথ পাওয়া যায়? এখানে কি মাটি দিয়ে বাঁধা পথ আছে যে চিনে যাবে! পায়ে পায়ে চলে চলে দাগ পড়ে, তাই ধরে খুব হুসিয়ার হয়ে যেতে হয়। এই জোড়া গাছের পাশ দিয়ে একটু এগুলেই দেখতে পাবে মস্ত একটা টিপি—

বালানন্দ বললেন : আপনি ত বলেছেন, তার ভিতরেই একটা গুহা আছে, আর সেখানে থাকে একটা বনমানুষ।

বৃদ্ধা বললেন : তা থাকে। তবে কি আর বাইরে বেরিয়ে আসে না? আসতেই হবে, নৈলে দরিয়ার সনে লড়াই করবে কে?

বালানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন : দরিয়ার সনে লড়াই করে তাঁর লাভ?

ঝঙ্কার দিয়ে বৃদ্ধা বললেন : সেই জানে। যত রাগ তার ঐ নর্মদার ওপরে। তাকে ভ্যাংচাবে, গাল দেবে, তার জলে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে বুজিয়ে দেবার জন্যে কত পাগলামিই করবে। অগস্ত্য ঋষির মত যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে হয়ত নর্মদা বুড়ীকে গণ্ডুষে শুষেই ফেলত।

বালানন্দ এই সময় মনে মনে কি ভেবে বললেন : দেখুন, আপনার কথা শুনে আমার মনে ভারি ধোঁকা লাগছে। আমি একজন সাধুর সন্ধানেই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোকে বলে, তাঁর নাকি মাথা খারাপ হয়েছে। মানুষের ভীড় তিনি সইতে পারেন না, ঠাকুর দেবতার বিগ্রহ তাঁর চোখে পড়লেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সব চেয়ে বেশী রাগ আর বিদ্বেষ নর্মদাজীর উপরে। তাঁকে মারতে যান, যা তা বলেন। তাইত এ অঞ্চলের লোক তাঁকে কালাপাহাড়-সাধু বলেন। আপনি কি সেই সাধুর কথা তুলে—বনমানুষ বলে ঘৃণা করছিলেন? ইনিই কি তাহলে গৌরীশঙ্কর মহারাজ--গুহার মধ্যে এখন লুকিয়ে আছেন?

বৃদ্ধা এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে নীরবে বালানন্দের কথাগুলি শুনছিলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁদের পথ চলায় ছেদ পড়েছিল। পরক্ষণে মুখখানা গম্ভীর করে বৃদ্ধাই বললেন : হবে হয়ত সেই। কিন্তু লুকিয়ে থাকবে কেন? কালাপাহাড়রা কি লুকোয়?

বালানন্দও কিছুক্ষণ নীরব থেকে, তারপর কণ্ঠে একটু জোর দিয়ে বললেন : আপনার মতলব আমি বুঝেছি। আমার সঙ্গে দেখা হবার সময় থেকেই কতবারই ঐ সাধুর কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। নিজের ইচ্ছা নেই তাঁর কাছে যাবার, অথচ তিনি সেরে ওঠেন, পাগলামি তাঁর সেরে যায়, সেজন্যে কত কি যে বলছেন আমাকে; মন্ত্রপড়া মরিচ আর বিভূতি দিলেন পুঁটুলি বেঁধে আমার হাতে, আমি যাতে তাঁকে এই সিদ্ধ ওষুধ খাইয়ে ভালো করে তুলি। তাই হবে; আপনি নিজের গাঁয়ে যান, আমিও টিপিটার ভিতরে সেঁধিয়ে

তাঁকে দেখি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করি, তারপর আপনি যা যা করতে বলেছেন, সেগুলি দিয়ে সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলি। তাহলে আর বিলম্ব করা নয়, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বালানন্দের কথাগুলি শুনে, লাঠিটা পাথুরে মাটিতে বার কয়েক ঠুকে, বৃদ্ধা হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলেন। তার পর বালানন্দের মাথায় হাতখানি রেখে বললেন: পরমাত্মার দয়ায় সব কাজ তোমার সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি তবে আমার পথে যাই, তুমিও তোমার পথ দেখ।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই, তিনি সেই স্থান থেকে ধীরে ধীরে খানিকটা গিয়ে, তারপর গভীর বনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বালানন্দও বৃদ্ধা কথিত টিপিটি কল্পনা করে দ্রুতপদে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

চেষ্টা, যত্ন, নিষ্ঠা ও আগ্রহ থাকলে অন্তরের সব কামনাই সিদ্ধ হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সেই প্রায়ান্ধকারে, বালক বালানন্দ সংকীর্ণ পথটি ধরে মাটির সুবৃহৎ টিপিটির সামনে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন, একস্থানে দ্বারের মত প্রকাণ্ড একখানা পাথর রয়েছে। দণ্ড, কমণ্ডলু ও পুঁটুলিটি বনপথে রেখে, তিনি দু'হাতে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চাপ দিয়ে পাথরখানা খুলে ফেললেন। অনুমানে বুঝলেন, সত্যই স্থানটি গুহার মত। সঙ্গের জিনিষ পত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই, আলোর একটা সূক্ষ্ম রেখা তাঁর চোখে পড়ল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ও সেদিকে দৃঢ় লক্ষ্য রেখে বুঝলেন, অদূরে একটা ধুনি জ্বলছে, তারই আলোক-রশ্মি ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাটির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। আনন্দে বালানন্দের মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সেই অগ্নিকুণ্ড লক্ষ্য করে তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন, দীর্ঘাকৃতি এক বিরাট পুরুষ প্রজ্জ্বলিত ধুনির সম্মুখে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর মাথার চুলগুলি অযত্নে জটার আকৃতি ধরে পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত, আর মুখ দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফে সমাচ্ছন্ন। বালক বালানন্দের বুঝতে বিলম্ব হলো না—ইনিই বৃদ্ধা কথিত সেই বনমানুষ, আর—তাঁদের বহুবাঞ্ছিত উন্মত্ত সাধু গৌরীশঙ্করজী।

দশ

ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বালানন্দ তাঁর সামনেই আসন পেতে বসলেন। যেন পরিচিত স্থান, পরিচিত এই গুহাবাসী সাধু। উভয়েই নীরব। বালক বালানন্দের ব্যাকুল দৃষ্টি বর্ষীয়ান সাধুর মুখে নিবদ্ধ। প্রায় একদণ্ড কাল পরে সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হলো। বাল-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন: ঠিক হায়, ঠিক হায়, ভগবানজী ভেজা।

বালানন্দও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে সাধুজীকে প্রণাম করে বললেন: হ্যাঁ গুরুজী—ভগবানজীর কৃপা হতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। দাসের সেবা গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।

বিস্মিত কণ্ঠে গৌরীশঙ্কর মহারাজ বললেন: সেবা? গুরুজী? কিন্তু আমি তোমাকে কোনদিন দীক্ষা দিয়েছি বলে ত মনে হচ্ছে না। ঝুট হায়—ঝুট। আমার সামনে বসে মিথ্যা বলছ? আমাকে তুমি চেন না, আমার কথা শোননি, আমার সংহার মূর্তি তুমি দেখনি? আশ্চর্য্য, এখনো ঠাণ্ডা মেজাজে তোমার সঙ্গে কথা বলছি আমি, আশ্চর্য।

হাত দু'খানি যুক্ত করে নম্রস্বরে বালানন্দ বললেন: এও ভগবানজীর কৃপা গুরুজী! আমি যদি মিথ্যাচারী হতাম, মনের মধ্যে পাপ লুকিয়ে থাকত, তাহলে কি আপনার কাছে আসবার উপায় পেতাম, আর আপনিও আমাকে দেখে মার-মূর্তি না ধরে এমন করে মিষ্টি সুরে কথা বলতেন?

সাধুর দৃঢ় অন্তরটি এতক্ষণে দুলে উঠল, বালকের সুন্দর মূর্তি এবং যুক্তিপূর্ণ মিষ্ট কথাগুলি তাঁকে বুঝি সত্যই অভিভূত করল। তেমনি গম্ভীর ও সহজভাবেই তিনি বললেন: সুরু থেকেই তুমি আমাকে গুরুজী বলছ। অবশ্য বহু ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে আমি তাদের গুরুজী হয়েছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ আসে না আমার কাছে—কোন খোঁজ খবরও নেয় না কেউ। কিন্তু বাপু, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই দীক্ষা দিই নাই কোনদিন, তাহলে মনে পড়ত; তবুও তুমি আমাকে গুরুজী বলছ কেন?

বালানন্দ বললেন: হ্যাঁ, আপনি যা বললেন, আমি স্বীকার করছি। দীক্ষা আমার নেওয়া হয়ে গেছে এবং আপনারই মত এক মহাপুরুষ

আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু দীক্ষা হলেও শিক্ষা যে আমার একেবারে অসম্পূর্ণ হয়ে আছে ঠাকুর। সেকথা আমার দীক্ষাদাতা গুরুকে বলতেই তিনি আমাকে দৈববাণীর মত যে কথাগুলি শুনিয়ে দেন, সেগুলি যেন আমার কাছে জপের মন্ত্রের মত আমার মনের মধ্যে গুপ্ত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন—তোমার প্রয়োজন আগে দীক্ষা, তারপর শিক্ষা। সাধনার পথে এ দুটোই চাই। দীক্ষা না হলে সাধনা হয় না, শিক্ষা না পেলে সিদ্ধি আসে না। তোমাকে দীক্ষা দেবার জন্য আমি যেমন এখানে বসে তোমার প্রতীক্ষা করেছি, তোমার শিক্ষাও সম্পূর্ণ করবার জন্য এমন এক অদ্ভুত সাধক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন—পুঁথী পড়া বিপুল বিদ্যা পোকার মত তাঁর মাথার মধ্যে জড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন তোমাকে সেই বিদ্যা আদায় করতে হবে তাঁকে খুঁজে বা'র করে। এ অঞ্চলেই কোথাও তিনি লুকিয়ে আছেন, তাঁর নাম -গৌরীশঙ্কর মহারাজ।

সাধু এমন গলায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অট্টনাদ করে উঠলেন—সেই শ্রবণ ভৈরব নাদ আর্তাত্মক নয—হাস্যময়। এমন অট্টহাসির ধ্বনি বালানন্দের কর্ণে কখনো প্রবেশ করে নি, সেই গম্ভীর গুহা তার আবর্তে যেন উদ্বেলিত হয়ে কাঁপতে লাগল; পরক্ষণে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করে তিনি বললেন: বুঝিছি, সাধু ব্রহ্মানন্দজী তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, আমার কথা বলেছেন,—বুঝিছি—নমো নারায়ণায,—নারায়ণায! বেশ, আমি তোমাকে শিক্ষা দেব; কিন্তু পুর্ণ সাতটি বছর তোমাকে সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকতে হবে, সমস্ত মন মর্জি শক্তি ভক্তি দিয়ে শিক্ষা আদায করে নিতে হবে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গৌরীশঙ্করজীর সম্মুখে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে পদযুগলে মাথা ঠেকিয়ে বালক বালানন্দ বললেন: শিক্ষার জন্য দেহ পণ করে আমি আপনার কাছেই থাকব গুরুজী; শিক্ষার সঙ্গে আপনার সেবা পরিচর্যা করে আমি ধন্য হব, আপনি আমাকে চরণে স্থান দিন।

আজানুলম্বিত দীর্ঘ হাতখানি তুলে বালক ব্রহ্মচারীর মাথায় উপর রেখে সাধুজী উৎফুল্ল মুখে আশীর্বাদ করলেন: তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হবে, আর তোমার সঙ্গ পেয়ে আমার মাথার পোকাগুলোও ঠাণ্ডা হবে—কে যেন আমার কানে কানে বলে দিলে। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে বিদায় নিয়ে ব্রহ্মানন্দজীর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করব।

সাধুজীর কথা শুনে বালকের সর্ব্বাংগ আনন্দে রোমাঞ্চ হয়ে উঠল। তিনিও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লাসের সুরে বললেন: আমারও এই ইচ্ছা গুরুজী। গঙ্গোনাথজীর মন্দিরে আমি যদি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, সবাই ধন্য ধন্য করবেন। আমার আর একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে—সেটিও রাখতে হবে।

প্রসন্ন মুখে সাধু জানালেন: সচ্ছন্দে বলতে পার বেটা, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। এই অল্প ক্ষণের মধ্যেই তুমি আমাকে জয় করে ফেলেছ। বল—কি তুমি চাও?

কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবেই বালানন্দ বললেন: দেখুন গুরুজী, যে মঙ্গলময় ভগবানজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, এই গুপ্ত গুহার সন্ধান পেয়ে আমি এখানে আসতে পেরেছি, তাঁরই কৃপায় আমি এক মায়ীর কাছে কিছু প্রসাদ পেয়েছি আপনার জন্য। এখন মনে কোন দ্বিধা না রেখে আপনি গ্রহণ করবেন—এই আমার প্রার্থনা আপনার কাছে।

সাধুজী আবার সেইভাবে হেসে উঠলেন, তাঁর অট্টহাসির ধ্বনি আবার সেই গুহাটিকে প্রকম্পিত করে তুলল। হাসির ধ্বনি বায়ুতরঙ্গে বিলীন হতেই তিনি বললেন: আমি জেনেছি সে মায়ী কে? মায়ীরা মায়ীই থাকে বাচ্চা—দরদের এতটুকু কমতি দেখা যায় না। বাস্—তাই হবে, সেই দাওয়াই আমি নেব; আর তুমিই নিজের হাতে মায়ীর দেওয়া দাওয়াই দিয়ে আমার সেবা সুরু করবে। এখন এসো, আমি তোমার আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করি।

বালানন্দ আনন্দে শিউরে উঠে বললেন: এ কি বলছেন গুরুজী—আমারই কর্ত্তব্য আগে আপনার আহারের ব্যবস্থা করা—

মৃদু হেসে সাধুজী বললেন: কিন্তু তুমি যে এখন আমার অতিথি, এই দুর্গম গুহামধ্যে অভ্যাগত। গুহাবাসীরও ধর্ম আছে, বিশেষ করে আতিথেয়তা। আবার দেখ এমনি মজা, অপরাহ্ণের দিকে এক পাহাড়িয়া মায়ী, কোন রকমে এই গুহার সন্ধান পেয়ে ঐ গবাক্ষে এক ভাঁড় দুধ আর কিছু ফল রেখে গেছে। যে ভাবে সে রেখে গেছে, তেমনি পড়ে আছে, আর থাকতও। এখন তুমি আমার কাজে যদি লাগে ক্ষতি কি। এ থেকেই বোঝ, ভগবানজী কি ভাবে সারা দুনিয়ার মানুষের খবর রাখেন। ঐ দুধ

এখানে আন, ধুনীতে আরো দুখানা কাঠ দাও, আর ভাঁড় থেকে দুধটুকু লোটায় ঢেলে ঐ আগুনে চাপাও। ব্যস্—এ থেকেই জানা যাবে, সেবা পরিচর্যা করতে তোমার কি রকম সামর্থ্য আছে।

বালক বালানন্দ অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতে থাকেন, এমন সুন্দর প্রকৃতি ও স্নেহপ্রবণ মন যে মানুষটির, তাঁর সম্বন্ধে কত কথাই শোনা গেছে। এখন মনে হচ্ছে—বহু পুণ্য আর ভাগ্যের জোরেই তিনি এমন সদালাপী শিক্ষাগুরু পেয়েছেন। বালানন্দ অতঃপর সাধুজীর নির্দ্দেশমত পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্যাদির পর উভয়ে সেই গুপ্ত গুহা ত্যাগ করে গঙ্গোনাথ আশ্রমের উদ্দেশে চললেন। পথে চলতে চলতে সাধু গৌরীশঙ্কর বালানন্দকে বললেন: তোমার সঙ্গে আলাপ করে কথাবার্ত্তা শুনে মনে হোচ্ছে আধ্যাত্মিকতার পথে তুমি এই বয়সে অনেকটা এগিয়ে পড়েছ। তোমাকে লৌকিক শিক্ষা দিয়ে কৃতবিদ্য করে তুলতে আমার পক্ষে অসুবিধা হবে না।

বালানন্দ তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে বললেন: আপনি যে অনুমান করেছেন তা ঠিক নয় গুরুজী! আপনাদের মত সাধু সঙ্গ করে হয়ত ভাসা ভাসা কিছু শিখতে পেরেছি, কিন্তু তাকে শিক্ষা বলা যায় না। আমি এই জগতের কথা, যিনি এই জগতের স্রষ্টা—তাঁর কথা, ঋষিদের কথা, তাঁদের লেখা শাস্ত্র বিজ্ঞান সংহিতা দর্শন প্রভৃতির কথা আগাগোড়া সব জানতে চাই। এমন করে আমাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে—পরে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, আমিও যেন বুঝিয়ে দিতে পারি।

গৌরীশঙ্করজী সহাস্যে বললেন: তাই হবে। তোমার কথা শুনে আমি যেন ভাবদৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার দেখতে পাচ্ছি বালানন্দ—দেশের নানা স্থান থেকে হাজার হাজার ভক্ত তোমার কাছে জ্ঞানের প্রার্থী হয়ে আসছে।

বালক সাধুর সুন্দর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে ঋষি-কল্প সাধুশ্রেষ্ঠের মুখ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মনে মনে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হলেন। গৌরীশঙ্করজী সেটি উপলব্ধি করে কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন: যে ভগবানের প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার সম্বন্ধে এ তাঁরই অনুজ্ঞার আভাস। ভবিষ্যতে তুমি এই ভারতে সাধনাসিদ্ধ

সাধুপুরুষরূপে খ্যাতি পাবে—বহু বহু ভক্ত তোমার কাছে দীক্ষা নিয়ে ধন্য হবে। একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে বলছি বালানন্দ—জীবের এই শৈশব জীবনটিই তার সমগ্র ভাবী জীবনের প্রতিবিম্বের মতন। এ থেকেই সব কিছু জানা যায়। জীবনকে মনের মতন করে গঠন করবার এমন সময় আর নেই। তোমার সমস্ত কৈশোর-জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, কিশোর বয়সেই তুমি সংকল্প করে নর্মদা-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হয়েছে। এ কি বড় সহজ কথা; এই বিরাট পরিক্রমার সঙ্গেই যেভাবে তোমার শিক্ষা চলবে, সেও অপূর্ব।

বালানন্দের মনে হলো, যেন অন্তর্যামীর মতই সাধু গৌরীশঙ্করজী তাঁর জীবনের যাত্রাপথের নির্দ্দেশ দিলেন—মনে মনে তিনি নিজেই যা স্থির করে রেখেছিলেন। নর্মদা-পরিক্রমায় তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই পরিক্রমার সঙ্গে যদি তাঁর শিক্ষা চলে, তাহলে এক সঙ্গে দুটো কাজই সিদ্ধ হবে—পরিক্রমার সঙ্গে নূতন নূতন নানা স্থান, অরণ্য, পর্বত প্রভৃতি দর্শন করে শিক্ষাকেও নানা প্রকারে সার্থক করে তুলবেন।

উল্লাসেব সুরে বালক তাঁর মনের কথা সাধুজীকে বলতেই তিনিও সোল্লাসে পূর্বের মত অট্টহাসির ঝংকার তুলে বলে উঠলেন: যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এ হোতেই হবে—ভগবানজীর ইচ্ছাতেই আমাদের এই সংযোগ। আমার জীবনে দোষ ত্রুটি অন্যায় অনাচার অনেক হয়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। আমাকে আবার নিয়ম করে চালাতে হবে পরিক্রমার কাজ, সেই সঙ্গে শিক্ষাব্রতীরূপে শিক্ষাদান।

সুর্য্যোদয়ের আগেই গৌরীশঙ্কর মহারাজ বালক বালানন্দকে সঙ্গে করে গঙ্গোনাথজীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হলেন। এঁদের দুজনকে দেখেই আশ্রমবাসী সকলেই উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন তাঁর অখণ্ড ধুনির উপর ঘৃতসিক্ত সমিধ আহুতি দিয়ে শিষ্যদের প্রতীক্ষা করছিলেন। এমনি সময় চারদিক থেকে তাঁরা উল্লাস ধ্বনি তুলে সেখানে সমবেত হয়ে বললেন: ভারি আশ্চর্য মহারাজ, গৌরীশঙ্করজী এসেছেন—সঙ্গে মহারাজের সেই বালক শিষ্য বালানন্দ।

প্রফুল্ল মুখে মহারাজ বললেন: ঐ বালকই তাকে এনেছে। সে সঙ্কল্প করেছিল, বিকৃত মস্তিষ্ক সাধুকে সে সুস্থ করে আশ্রমে আনবে। গৌরীশঙ্কর তাঁর ভাবী শিষ্যকে তাহলে জানতে পেরেছেন।

এই সময় 'নমো নারায়ণায়' ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করে নমস্কার করতে করতে গৌরীশঙ্কর মহারাজ সেখানে উপস্থিত হলেন। বালক বালানন্দও দ্রুতপদে নিকটে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে দীক্ষাগুরুর পদধুলি গ্রহণ করলেন।

গৌরীশঙ্কর মহারাজ বললেন: এই ছোকরার কাণ্ড দেখুন, গুহা মধ্যে লুকিয়ে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম, সন্ধান করে সেখানে গিয়ে আবার আমাকে টেনে এনেছে। আর, এর মনের এমনি শক্তি যে, আমি কিছুতেই বাধা দিতে পারিনি—নিজেই যেন ওর কাছে বাধ্য হয়ে পড়েছি। বলে কিনা—দীক্ষা পেয়েছে আপনার কাছে, শিক্ষা দিতে হবে আমাকে; যাকে বলা যায়—আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে দৃঢ়বন্ধন।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সাদরে গৌরীশঙ্করজীকে নিকটে কুশাসনে বসিয়ে সহাস্যে বললেন: একেই বলে—প্রকৃতির প্রতিশোধ। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তুমি যে সব অনাচার করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে। বিপুল বিদ্যার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেও সে বিদ্যা প্রচারের ক্ষেত্র পাও নাই। পরমেশ্বর মঙ্গলময়; তিনি দেশ ও জাতির প্রয়োজন বুঝেই এই ভক্ত শিশুটিকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন। প্রকৃতির বিদ্যাগারে এখন থেকে কিছুকাল তোমাকে শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব বহন করতে হবে।

ব্রহ্মা৲ন্দ মহারাজের এই নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে সেইদিন থেকেই গৌরীশঙ্কর মহারাজ বালক বালানন্দের শিক্ষাভার গ্রহণ করলেন।

এগারো

অপূর্ব গুরু, অপূর্ব শিক্ষা, অপূর্ব শিক্ষার পদ্ধতি। বালানন্দ ভাবেন, শিক্ষা ত দেবেন, কিন্তু গ্রন্থ কোথায়? এখন তাঁর মনে অনুতাপ হয়—পাঠশালার পণ্ডিত শিক্ষা দিবার জন্য যখন সাধাসাধি করতেন, তখন যদি পড়াশোনা কিছুটা শিখে রাখতেন—তাহ'লে এখন সুবিধা হত।

গুরুজী যেন শিষ্যের মনোভাব বুঝেই তাঁর সে আক্ষেপ দুর করে দেন। বলেন: গ্রন্থের জন্যে ভাববার কিছু নেই, গ্রন্থের শব্দগুলি সব আমার কণ্ঠ থেকেই বেরুবে। তবে শিক্ষার আগে দেহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘেরণ্ড সংহিতায় বলছে:

আম কুম্ভ মিবাম্ভস্থা জীর্যমানঃ সদা ঘটঃ।
যোগাগনেন সংদহ্য ঘতস্তদ্ধিং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ—আমাদের এই মানব দেহটি কাঁচা মাটির তৈরী একটি ঘটের মতন। কাঁচা ঘটে জল রাখলে জলের সঙ্গে ঘটটিও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই ঘট আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে তাতে জল রাখলে সে জল সেখানে ঠাণ্ডা অবস্থায় ভাল থাকে।

বালানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে ত গুরুজী আমার দেহ-ঘটটিকে শোধন করে নিতে হবে। সে কি উপায়ে হবে? গুরুজী বললেন:

ষট্‌কর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়,
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীয়তা
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি॥

অর্থাৎ—ছয় রকম কর্ম দিয়ে শোধন, মুদ্রা দিয়ে স্থৈর্য্য, আসন দিয়ে দার্ঢ্য, প্রাণায়াম দিয়ে লঘুতা, ধ্যান দিয়ে ধারণার বস্তুকে দেখা, আর সমাধি দিয়ে আত্মপ্রকাশের আনন্দ লাভ হয়ে থাকে।

এরপর গুরুজী শিষ্যকে বুঝিয়ে বললেন: এগুলি হচ্ছে হঠযোগের অঙ্গ। তোমাকে এখন থেকে এই যোগ অভ্যাস করতে হবে। এই যোগের সঙ্গে শিক্ষারও সম্বন্ধ আছে জেনো। গুরু শিষ্যকে এই বয়সেই সুকঠিন হঠযোগের সাধনা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে হাতে ধরে উপদেশ সহ শিক্ষা দিতে লাগলেন। অনেকের ধারণা, রাজযোগই প্রকৃত যোগ, আর হঠযোগ কতকটা কসরৎ বা বুজরুকি মাত্র। কিন্তু গুরুজী বালানন্দকে বুঝিয়ে দিলেন, লোকের এ ধারণা ভুল। এই উভয় যোগের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে—

হঠং বিনা রাজযোগং, রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিদ্ধতি তত যুগ্মমানিস্পত্তে সমভ্যসেৎ॥

অর্থাৎ—হঠযোগ বিনা রাজযোগ বা রাজযোগ বিনা হঠযোগ সিদ্ধ হয় না। এই সংগে নানাপ্রকার মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাস করাতে থাকেন। গুরুজী শিষ্যকে যখন তখন বলেন: মধু মক্ষিকা হো যাঁও।...অর্থাৎ যে কোন স্থলে যেখানেই মধু পাবে—তুলে নেবে। ফলে, পুর্ণযৌবনেও যে যোগবিদ্যা যোগীদের আয়ত্ত হয় না, বালক বালানন্দ নয় দশ বছর বয়সেই সে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হলেন।

শিক্ষাগ্রন্থ সম্পর্কে গুরুজী পূর্বে যে কথা বলেছিলেন, বালানন্দ কার্যকালে দেখলেন তা অভ্রান্ত সত্য। বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, শাস্ত্র, পুরাণ সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। যোগ ও প্রাণায়ামের সংগে শিক্ষা দান কাজটিও নিয়মিতভাবে চলতে লাগল।

পুর্ণ পাঁচ মাস গঙ্গোনাথজীর মন্দিরে সশিষ্য বাস করলেন গৌরীশঙ্কর মহারাজ। ষষ্ঠ মাসের এক প্রত্যূষে—ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট বিদায় নিয়ে গুরু শিষ্য নর্মদা পরিক্রমাকে উপলক্ষ করে দুর্গম পথ ধরে যাত্রা আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে বিদ্যা চর্চাও নানাভাবে চলতে থাকে। গাছের বড় বড় পাতা চয়ন করে এনে, গাছের পাতার রস ও ত্বক থেকে মসী এবং এইভাবে নল খাগড়া, বাঁশের সরু প্রশাখা (কঞ্চি) বা হাঁসের পালক থেকে লেখনী তৈরী করে শিষ্যকে লেখা শিখাতে থাকেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে নবীন শিষ্য ব্রহ্মচারী জীবনের করণীয় কাজগুলিও উত্তমরূপে শিক্ষা করে দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেবা-ধর্মেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখে গুরুজী তাঁকে সেবা সম্বন্ধে পারদর্শী করে তোলেন। এই সূত্রে নানাবিধ ঔষধ এবং যোগশক্তির সাহায্যে রোগীকে সুস্থ করে তোলবার বহু প্রক্রিয়াও দেখিয়ে দেন। আবার, কোন দেবস্থান বা তীর্থের কাছাকাছি এলে গুরুজী সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তদের আহ্বান করে ভুরি ভোজ দিয়ে বালানন্দের মনেও বিস্ময়ের শিহরণ তোলেন। শিষ্য ভেবে পান না—কপর্দকহীন সাধুর পক্ষে এভাবে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? প্রচুর অর্থে ক্রীত রাশি রাশি খাদ্য-সম্ভার ব্যতীত এরূপ ভাণ্ডারার আয়োজন যে অসম্ভব! একদিন বালক বালানন্দ কথায় কথায় গুরুকে তাঁর সন্দেহের কথাটা বলেই ফেললেন। শুনে গুরুজী মৃদু হেসে জানালেন: সাধু-ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই আটকায় না, ভগবানজী নিজেই সব ব্যবস্থা করে দেন।

বালক বালানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গুরুর কার্য্যকলাপ দেখেন, আর তাঁর ঐ কথাগুলি ভাবেন। আশ্চর্য, এমন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সেই সব ব্যয়সাধ্য বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় যে, সে সম্বন্ধে বালানন্দ প্রশ্নেরও কোন অবকাশ পান না। হয়ত উপর্য্যুপরি দুই তিন সপ্তাহ ধরে দুর্গম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গুরু-শিষ্যের নর্মদা পরিক্রমা চলেছে; কখনো উচ্চ চড়াই লঙ্ঘন করে নুতন কোন বনভুমি মধ্যে অবতরণ, আবার পরদিনই হয়ত ভুগর্ভে নেমে

পথের সন্ধান করতে করতে কোন পার্ব্বত্য নদীর উপকূলে উপস্থিতি—সে নদী পার না হলে আর তাঁদের নিষ্কৃতি নেই ; অথচ কোন কিছু অবলম্বনে পার হবার উপায়ও নেই ; কখন কখন বা ডোঙ্গা জাতীয় ক্ষুদ্র জলযানের সাহায্যে পারানির সুযোগ এসে যায়, কিন্তু নর্মদা পরিক্রমাকারীদের পক্ষে সে সাহায্য গ্রহণও নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ। এত সহজে এই কঠিন পরিক্রমা সিদ্ধ হয় না! তখন তল্পীতল্পা পীঠে বেঁধে সন্তরণে পরপারে উপনীত হোতে পারলেই পরিক্রমার বিধি পালিত হবে। গুরুশিষ্যকেও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিধি পালন করতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন নানারূপ দুর্গম পথ অতিক্রমের পর গুরু শ্রান্ত শিষ্যের মুখের দিকে চেয়ে স্নেহের সুরে বললেন: বড্ডো পরিশ্রম হয়েছে না? আচ্ছা, এখানে ঘণ্টা কতক কাটিয়ে দেহকে বিশ্রাম দেওয়া যাক, সেই অবসরে মনের কাজ চলুক। আমরা যে চড়াই উতরাই ভেঙে নদী নালা পার হয়ে এসেছি—এসব থেকে শিক্ষার উপাদান যথেষ্ট আছে। এখন সেই শিক্ষার ব্যাপার চলবে। কি বল?

বালানন্দ ত তাই চান। গুরুর উৎসাহের চেয়ে কোন দিক দিয়েই তাঁর উৎসাহের অভাব নেই। সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ গুরুর পদতলে বসে পড়লেন এবং তাঁর ক্লান্ত পদযুগল কোলে তুলে নিয়ে শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব প্রসঙ্গের শেষ কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শিষ্যের প্রগাঢ় অধ্যবসায় দেখে গুরুও চমৎকৃত। দণ্ডের পর দণ্ড ধরে চলে শিক্ষার সাধনা। বড় বড় জটিল সমস্যাব সমাধান করে দিতে হয় গুরুকে, শিষ্য তাতে ধন্য হন। এমনি অবস্থায় গুরু হয়ত বলে ওঠেন: ক'দিন ধরে খুবই পরিশ্রম চলেছে না? আচ্ছা, এবার সামনে আশ্রয়যোগ্য কোন স্থান পেলেই—যেখানে সাধুসন্তরা থাকেন, কাছাকাছি গ্রাম বা নগরের লোকজনদের যাতায়াত আছে সেইখানে গিয়েই খুব জাঁকিয়ে এক ভাণ্ডারা লাগিয়ে দেওয়া যাবে। সাধুসন্তদের সেবার সঙ্গে গ্রামীন লোকজনরাও পরিতৃপ্ত হয়ে ঠাকুরজীর প্রসাদ পাবে।

চলার পথে গুরুজী প্রথম যেদিন এভাবে ভাণ্ডারার কথা তোলেন; শুনে বালানন্দ মনে মনে ভাবেন, বৃদ্ধ বয়সে পথশ্রমে গুরুজী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই এভাবে ভোগের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু ধরে নেওয়াই গেল—সামনে এবার হয়ত এমন একটা স্থান মিলবে, ঠাকুরজীর পূজা হয়, স্থানীয় লোকজন আসেন। কিন্তু গুরুজী সেখানে গিয়েই ভাণ্ডারা লাগাবার

কথা বলেন কোন্ সাহসে আর কার আশায়? গঙ্গোনাথের মন্দিরে তাঁর দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে ভাণ্ডারা দিতে দেখেছেন—সে কি বিরাট ব্যাপার। ভারে ভারে কোথা থেকে যে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আসছে, পাকশালার চুল্লী গুলি উদয়াস্তকাল জ্বলছে, দিবা দ্বিপ্রহর কাল থেকে ভোজনপর্ব চলছে, আর রাত দ্বিপ্রহরের পর আশ্রম-স্বামীর ভোজনে বসবার আগে আর নিবৃত্তি তার নেই—সেই অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছেন বালানন্দ। দেখে কি এক অপরূপ আনন্দেই তিনি আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। এখন তাঁর শিক্ষাগুরুর মুখেও শুনছেন সেই ভাণ্ডারার কথা। কিন্তু সাধুসন্তদের চিন্তা ত ব্যর্থ হয় না, মনের বাসনা ত অপূর্ণ থাকে না, তবে?

কয়েকদিন পরে গুরুশিষ্য নর্মদাতীরবর্তী তীর্থতুল্য এক সিদ্ধ স্থানে উপনীত হলেন। নর্মদা পরিক্রমাকারীদের এই স্থানটি অবস্থিতি ও বিশ্রামের একটি কেন্দ্র। সে সময় কতকগুলি পরিক্রমাব্রতধারী সাধু এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নর্মদাদেবীর মন্দিরের পুরোহিতগণ গুরু ও শিষ্যকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে যখন প্রচারিত হলো যে, বিখ্যাত পরিব্রাজক সাধু, মহাতাপস গৌরীশঙ্করজী তাঁর এক কিশোর শিষ্যকে নিয়ে নর্মদা পরিক্রমার উদ্দেশ্যে কাঠিয়াবাড় অঞ্চলকে ধন্য করতে এসেছেন, তখন উল্লাসের একটা সাড়া পড়ে গেল। বহুলোক তাঁকে দর্শন করতে এলো,—কিছু না কিছু উপহার সঙ্গে নিয়ে—ফল, মিষ্টি, দুধ, ঘি, মাখন, এমনি কত কি। গুরুজী সে সব দেবমন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি মন্দিরের পুরোহিতকে ডেকে বললেন: কাল এখানে ভাণ্ডারা লাগাবার ব্যবস্থা করুন। বেলা বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত নির্বিচারে আহূত অনাহূত সবার সেবা চলবে।

মন্দিরের পুরোহিতরা এরূপ ভাণ্ডারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখানে সময়ের ব্যবধান খুব সামান্য—রাতটুকু মাত্র; তাই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সুধালেন: আগামী কালই ভাণ্ডারা লাগাতে চান মহারাজজী? কিন্তু—

মহারাজজী দৃঢ়স্বরে বললেন: এখানে 'কিন্তু' কিছু নেই। রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র সব এসে যাবে। আপনারা আজ থেকেই জিনিষ পত্র, চুলী প্রভৃতির যোগাড় করে—জনকতক উপযুক্ত লোক দিয়ে সোহরত করে দিন—যে, আগামী কাল বেলা ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত নর্মদামায়ীর

মন্দিরে ভাণ্ডারা চলবে—সাধু সন্ত গৃহী সন্ন্যাসী আবালবৃদ্ধবনিতা এখানে ভোজন করবেন।

বালানন্দ অবাক হয়ে তাঁর এই খেয়ালী গুরুজীর কাণ্ড নিয়ে নিজের মনেই আলোচনা করেন—যাঁর ঝুলিতে এক মুঠি চাল বা আটার সংস্থান নেই, তাঁর মুখ দিয়েই এই বিরাট ভোজের পরিকল্পনার কথা বেরিয়েছে, অথচ তিনি দিব্যি নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার। তবে কি গুরুজীর সেই পূর্ব ব্যাধি আবার মাথার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে? কিন্তু তাঁর মুখখানি ত দিব্যপ্রসন্ন—দুশ্চিন্তার কোন ছায়াও সেখানে পড়েনি। কেমন করে মুখের কথা তাঁর বাস্তব হবে? এ যে সত্যই অসম্ভব!

পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদির পর বালানন্দ গুরুবন্দনা করে শিক্ষার্থী রূপে বসেছেন; কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে ভাণ্ডারার ব্যাপারটি রীতিমত দোলা দিচ্ছে। খানিক পরেই মহোৎসব আরম্ভ হবার কথা, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই। গুরুর মুখের দিকে চেয়ে দেখেন, সেখানে চিন্তার চিহ্নও নেই।

এমনি সময় এই কাণ্ড দেখে বালানন্দ সোল্লাসে চীৎকার করলেন: গুরুজী—একি কাণ্ড?

বহুজনের কলরবে প্রত্যূষেই দেবস্থান মুখরিত হয়ে উঠল। জানা গেল, কাঠিয়াবাড়ের এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী তাঁর গুরু মহারাজ গৌরীশঙ্করজী এখানে ভাণ্ডারা দেবার বাসনা করেছেন জেনে তাঁরই খাতিরে আটা, ডাল, ঘি, তরি-তরকারী, দধি, মিষ্টাদি পাঠিয়েছেন।

গুরুজী সহাস্যে বললেন: তোমার দুশ্চিন্তা কাটল ত? যাক্, আমাদের কাজ এখানে চলুক; ওখানকার কাজ সব ব্যবস্থা করবার যোগ্য লোক আছে। আরে, যার কাজ—সেই করিয়ে নেবে।

খুব ঘটা করে সুশৃঙ্খলে ভাণ্ডারার কাজ শেষ হয়ে গেল। সাধুজী কিন্তু রাত বারোটার পূর্ব পর্য্যন্ত অভুক্ত থেকে অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত থাকেন। গুরুর আদর্শে বালানন্দও অভুক্ত রইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনির পর সশিষ্য গৌরীশঙ্করজী ভোজনে বসলেন।

পরে এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পর্কে বালানন্দ তাঁর গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কি করে এতবড় একটা কাণ্ড এত সহজে আশ্চর্য্যভাবে সম্পন্ন

হয় গুরুজী ? আমার জানতে বড় আগ্রহ হচ্ছে, দয়া করে এর রহস্য বলে আমার মনের একটা সংশয় দূর করে দিন গুরুজী !

গুরুজী তার উত্তর দিয়েছিলেন : সাধুসন্তদের সাধনালব্ধ বিভূতির প্রভাবে জীবনে অনেক অসম্ভব ব্যাপার এইভাবে সম্ভব হয়ে থাকে। তবে এসব খুবই গোপনীয় বিষয়—শুধু গুরু-শিষ্য বা সম-অবস্থাপন্ন সঙ্গী-সাথীরাই জ্ঞাত থাকেন। বহুদিন ধরে সাধনার পর ইচ্ছা-শক্তি পূর্ণ করবার ক্ষমতা সাধকের আয়ত্ব হয়। পাতঞ্জল দর্শন, দত্তাত্রেয় সংহিতা, হঠদীপিকা, হঠযোগ, ঘেরণ্ডসংহিতা, যোগী যাজ্ঞবল্ক, গোরক্ষ সংহিতা, যোগসার, শিব সংহিতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক যোগশাস্ত্রগুলিতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু বই পড়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। আমি তোমাকে হাতে কলমে এসব যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেব। এর প্রথম পর্যায় হচ্ছে—ক্রিয়া যোগ। ব্রত, জপ, নিয়মাদি পালনের পর এই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করলে মনের অবিদ্যা দেহ ছেড়ে পালায়, আর বিবেক সম্মত জ্ঞান সেখানে প্রবেশ করে। তখন সাধক নির্বিচারে পরমেশ্বরকে সাধনালব্ধ কর্ম অর্পণ করে ক্রিয়াযোগী হন। এই ভাবে এক একটি যোগে সিদ্ধিলাভ করলে সাধক হবেন মহাযোগী পুরুষ। এঁরা জীবনধারণের জন্য জীবিকা বা জীবন রক্ষার জন্য চিন্তা—এসব কিছুরই পরোয়া করেন না ; পরমাত্মাদেব নিজেই এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এমনি আটপ্রকার কঠোর সাধনা আছে, এগুলিতে পর পর সিদ্ধ হতে পারলে সাধক অষ্ট সিদ্ধির অধিকারী হন। জীবনের এই অবস্থায় এঁরা হন ব্রহ্মজ্ঞ। যোগসিদ্ধ সাধু ব্রহ্মজ্ঞ হলেই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবই প্রাপ্তি হবে—পৃথিবীতে এঁরা হবেন সবার বরেণ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা গেছে—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই ব্রহ্ম হন।

বালানন্দ গুরুকে ধরে বসলেন, বললেন : আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন, কি করে সাধুরা ব্রহ্মবিদ্ হন।

গৌরীশঙ্কর মহারাজ শিষ্যকে বিষয়টি সহজ করে বুঝিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে বললেন : যে জিনিষ লাভ করলে আর কোন জিনিষ পাবার জন্য মনে আগ্রহ থাকে না, যে সুখ উপলব্ধি হলে অন্য সুখের জন্য মনে লালসা জাগে না, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলে আর সব জ্ঞানকেই তুচ্ছ মনে হয়—সাধক-জীবনের সেই অবস্থাই ব্রহ্ম, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হোলেই সাধক হন ব্রহ্মবিদ্।

বালানন্দ তন্ময় হয়ে শুনতে থাকেন। শিষ্যের আগ্রহ দেখে প্রসন্ন মনে বলেন : সাংসারিক ব্যাপারে যখন দেখা যায়—কোন বালকের মনে বৈরাগ্য জেগেছে, কিছুতেই সে সংসারে থাকতে চাইছে না, তখন বুঝতে হবে—সেই বালক সাধারণ নয়, পূর্ব জন্মের সাধনালব্ধ সংস্কার তাকে বৈরাগ্যের পথ দেখাচ্ছে। হয়ত পূর্ব-জন্মের সাধনা তার সিদ্ধ হয়নি—কিম্বা যোগভ্রষ্ট হয়েছিল, তাহলেও পরমাত্মার করুণা থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, পরজন্মে শৈশব থেকেই সে আত্মোপলব্ধির আভাস পেয়েছে। তখন শ্রীভগবান সেই বালককে সাধন পথে এগিয়ে দেন, নানাভাবে তাকে পথ দেখান, সত্যই সে ভাগ্যবান।

এই পর্যন্ত বলেই গুরুজী গভীর দৃষ্টিতে বালক বালানন্দের দিকে তাকালেন। বালানন্দের নির্মল মুখখানি ধীরে ধীরে লজ্জায় নত হলো।

এমনি বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে নানাস্থান পর্যটনের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থাদির আলোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমান ভাবে চলতে থাকে। গুরুজীর সাধনালব্ধ জ্ঞান ও বিভূতি শিষ্যকে চমৎকৃত করলেও, তিনি নীরবে উপলব্ধি করবার পাত্র নন, এক একটি ঘটনার পর গুরুর কাছ থেকে সে-সবের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হন। এই শিক্ষাসূত্রেই বুঝতে পারেন, শ্রীভগবানের অসামান্য-করুণাতেই এই রহস্যময় মহাপুরুষ শিক্ষাগুরু-রূপে তাঁকে ধন্য করতে এসেছেন, এঁরই সময়োচিত সহায়তায় তিনিও হয়ত একদিন পথের সন্ধান পাবেন।

দীর্ঘ সাতটি বৎসর ধরে এমনি শিক্ষনীয় ও জ্ঞাতব্য বিবিধ ঘটনারাজির ভিতর দিয়ে বালানন্দের শিক্ষা যখন পূর্ণ হয়ে এসেছে, সেই সময় বিশেষ কোন পর্বোৎসব উপলক্ষে গুরু গৌরীশঙ্করজী পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে সশিষ্য উপনীত হলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী এ-সময় গৌরীশঙ্কর মহারাজের আনুসঙ্গী হয়েছেন। বালানন্দ এখন আর বালক বা কিশোর নহেন, ধীরে ধীরে তরুণ যৌবনের মাধুর্য্যময় অংশে উপনীত হয়েছেন। আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য পালনে এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ সাতটি বছর লোকালয়ের বাহিরে প্রকৃতির আশ্রয়ে অবস্থানে এই সময় অপূর্ব এক লাবণ্যময় দ্যুতি তাঁর কমনীয় অঙ্গকে দিব্য জ্যোতির্ময় করে তুলেছে। প্রয়াগ তীর্থ থেকেই গুরু মহারাজ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নলেন। দীর্ঘকালের এই নির্ভরযোগ্য পরম পুজ্য গুরুজীর অদর্শন-বেদনা

ব্রহ্মচারী বালানন্দকে ব্যাকুল করে তুললে, তিনি অভয় দিয়ে বললেন : বৎস ! এখন একমাত্র পরমেশ্বরকে নির্ভর করে, আবার নূতন করে তোমার সঙ্কল্প সাধনে ব্রতী হও, পুনরায় নর্মদা পরিক্রমা আরম্ভ কর—পরমাত্মাদেব তোমার সাথী থাকবেন, নর্মদামায়ী তোমাকে কৃপা করবেন। তোমার এই পরিক্রমাই তোমাকে অসামান্য সিদ্ধি দেবে, তোমার সাধক-জীবন ধন্য ও আদর্শ হবে। অতঃপর আমরা শিক্ষা-সিদ্ধ জ্ঞান-তাপস তরুণ সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাধন-পথে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী মহাপরিক্রমার সঙ্গে পরিচিত হব—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

যৌবনে

মহাপরিক্রমা

এক

সন্ন্যাসী একা যাত্রী। দীর্ঘায়ত দেহ-যষ্টি প্রশস্ত ললাট, গৌরকান্তি, সুগঠিত সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, প্রসন্ন মুখ, আনন্দোজ্জ্বল আয়ত দুটি চক্ষু, মাথার দীর্ঘ রুক্ষ জটাদল পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত—এমনই এক অপরূপ শ্রীমণ্ডিত দিব্যদেহী সাধু নর্মদা-তীরবর্তী ভীষণ দুর্গম বনভূমির ভিতর দিয়ে অসম্ভব দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বামহাতে একটি সুবৃহৎ কমণ্ডলু, দক্ষিণ-হাতে দীর্ঘ যষ্টি, পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র একটি গাঁটরি বাঁধা। এভাবে যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী নর্মদার তীরভূমি থেকে পুণ্যসলিলা জননী নর্মদাকে অর্চনা করে সন্নিহিত দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করেন—তাঁদের লক্ষ্যই হলো পরিক্রমা এবং এই পরিক্রমণকেই শ্রদ্ধা সহকার নর্মদা পরিক্রমা বলে অভিহিত করা হয়।

সাধুজীবনে সর্বাধিক কঠিন সাধনা এই নর্মদা-নদী-পরিক্রমা। নর্মদা নদীর তীরবর্তী কোন এক তীর্থ স্থান থেকে সাধুরা এই পরিক্রমা* আরম্ভ করেন। দুর্ভেদ্য অরণ্যানী অতিক্রম করে এই দীর্ঘ নদীর উৎপত্তি স্থান দুর্গম অমরকণ্টক পর্য্যন্ত গিয়ে, আবার সেখান থেকে নদীর অপর তীর ধরে পরিক্রমা চলতে থাকবে এবং যে মহাসমুদ্রে নর্মদা গিয়ে মিশেছেন, সেখানে উপনীত হলেই এই পরিক্রমার একটি পর্ব শেষ হবে। এই একটি পরিক্রমা ভাল ভাবে সম্পন্ন করতে হলে তিন চার বছর কেটে যায়। যাঁরা মহাপরিক্রমায় ব্রতী, তাঁরা আবার নর্মদা নদীর অপর কোন তীর ধরে নূতনভাবে পরিক্রমা আরম্ভ করেন। পরিক্রমাকালে পরিব্রাজক সাধুর নির্মল অন্তরে অধ্যাত্ম-জগতের কত বিচিত্র তথ্য, বেদ, উপনিষদ, শ্রুতি, সংহিতা প্রভৃতি মহাগ্রন্থগুলির উপাখ্যান,—জগতের কল্যাণকর আধ্যাত্মিক অবদানগুলি উদিত হয়ে—স্মরণ মনন অনুধ্যান প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিগুলির এমন উৎকর্ষ সাধন করতে থাকে যে, এই পর্য্যটন সূত্রেই মনোবিজ্ঞানী ও তপস্যাপরায়ণ তাপসের সিদ্ধি তাঁর করতলগত হয়। আশ্রম বা গুহা আশ্রয় করে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যার পর সাধারণতঃ সাধুরা তপঃশক্তিপরায়ণ ঋষিরূপে লোকসমাজে নমস্য হয়ে থাকেন! এরূপ বহু ঋষির সহিত ভারতবাসী পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নদ নদী,

* এই কঠিন পরিক্রমার নিয়ম এবং বিধি-নিষেধের কথা প্রথম খণ্ডে যথাস্থানে বলা হয়েছে।

বনস্পতি ও তীর্থভূমি পরিবৃত বিরাট বিরাট পর্বত ও অরণ্য-অঞ্চলগুলি বারবার পর্য্যটন করে স্বয়ংসিদ্ধ মহাতাপসরূপে দেশবাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন একমাত্র এই মহাপুরুষ সাধু বালানন্দ ব্রহ্মচারী— যাঁর তরুণ যৌবনকাল থেকে পরবর্তী প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী মহাপর্য্যটনের অপূর্ব কাহিনী এই খণ্ডে বিবৃত হচ্ছে।

চিত্রকূট আশ্রম থেকে রাজ-সন্ন্যাসী ভরত একদা অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকার সঙ্গে তাঁর আদেশ বহন করে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যপালনে ব্রতী হয়েছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বালানন্দজীও এই পুণ্য-পবিত্র তপোবন থেকে শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে তাঁর সাধকজীবনের অবদানগুলি আত্মস্থ করে—দীক্ষা-গুরু-দত্ত জ্ঞানামৃত পানে বিভোর হয়ে অপরূপ এক তপঃসাধনায় ব্রতী হলেন।

নর্মদা-তীরে শ্রদ্ধাসহকারে স্রোতস্বিনী নর্মদা মাতার পূজা-অর্চনার পর সাধু বালানন্দ নর্মদা-কান্তারে প্রবেশ করেন। প্রয়াগেব পথেই সাধারণভাবে পরিক্রমা-সাঙ্গকারী কতিপয় প্রৌঢ় বয়স্ক সাধুদের সঙ্গে বালানন্দের সাক্ষাৎ হয়। আলাপসূত্রে তাঁরা যেই জানলেন, তরুণ বয়সে একাই ইনি নর্মদা পরিক্রমায় চলেছেন, তখন তাঁরা বনের মধ্যে অসংখ্য বিপত্তির কথা তুলে তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন। বললেন: এ ত আর সাধারণ বন নয়— মহাবন। হেন হিংস্র জন্তু জানোয়ার নেই—এই বিরাট বনে, যাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, হাতী—এরা সব দিনের বেলাও ঘুরে বেড়ায় শিকার সন্ধানে। এমন সব মহাকায় অজগর আছে—যাদের সামনে পড়লে পালাবার জো নেই, একবার চোখোচোখি হলেই নিশ্বাস ছেড়ে কাছে টেনে এনে গিলতে থাকে! দল বেঁধে হৈ হুল্লোড় করতে করতে না গেলে, এমন বিপাকে পড়বে যে, না-পারবে এগুতে, ফিরেও আসবার পথ পাবে না। তাই বাপু, সাবধান করে দিচ্ছি—বনের মুখে অপেক্ষা করবে, এক সঙ্গে পরিক্রমার জন্যে দল বেঁধে বেরিয়েছে—এমনি কোন দল না পাওয়া পর্য্যন্ত একা কখনো সেঁধিয়ো না সে বনে।

বালানন্দ তাঁদের কথা শুনে বলে ওঠেন: ও-বন আমার দেখা আছে। ন' বছর বয়সে আমি পরিক্রমা আরম্ভ করি—একইভাবে চলেছে। মা নর্মদা যখন সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি; আবার যখন নিঃসঙ্গ

করেছেন, একাই গেছি ; মনে এইমাত্র ভরসা—ঐ বেটি ঠিক সঙ্গে আছেন। সেই জন্যেই বুঝি বাঘ ভাল্লুক কিম্বা অজগরের মুখে পড়েও দিব্যি বেঁচে আছি।

বালানন্দের কথা শুনে সাধুরা চমকে উঠলেন। ন' বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে এভাবে পরিক্রমা সুরু করে এখনো তাতে লিপ্ত আছেন শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বুঝলেন, বয়সে কাঁচা হলে কি হয়, ইনি সত্যই এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তারপর নর্মদা পরিক্রমা নিয়ে নিজেরা বড়াই না করে বালানন্দের মুখে তাঁরই দীর্ঘ ভ্রমণের কথা শুনতে থাকেন। কিন্তু শৈশবে ন' বছর বয়স থেকে প্রথম যৌবনের কিছুকাল পর্য্যন্ত একটানা পর্যটনের মধ্যে দস্যু ও হিংস্র শ্বাপদ কর্তৃক কখনো আক্রান্ত হন নি শুনে সাধুরা গভীরভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন। বালানন্দ বললেন : আমরা যদি কারো প্রতি হিংসা না করি, যত বড় হিংস্র প্রাণী হোক না কেন, হিংসায় বিরত থাকবে। সাপের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পায়, ভাবে—দংশন করাই তার স্বভাব। কিন্তু সেই সাপের সঙ্গে মেশামিশি হয়েছে, তবু সে কামড়ায় নি। নয় বছর বয়স থেকে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে বহু দুর্গম স্থানে ঘুরেছি ; বাইশ বছর বয়সে আবার নতুন করে পর্য্যটনে বেরিয়েছি, কিন্তু আগেও কোন দিন জীবন বিপন্ন হয় নাই, এখনো সেই ভরসায় নির্ভয়ে চলেছি, সহায় মা নর্মদা।

তবুও সাধুরা বর্তমানের অবস্থা জানিয়ে বালানন্দকে এইভাবে সতর্ক করে দিলেন : দশ বারো বছর পরে এখন দেশের লোকের মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। আগে সাধুদের দেখলে সবাই নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করত, মন্দ প্রকৃতির লোকগুলোও সাবধান হোত ; কিন্তু এখন আর সেদিন নেই—মহাবনের এক একটা ঝাড়ির মুখে দল বেঁধে ভীল দস্যুরা ওত পেতে থাকে, সাধুদের দেখলেই তাঁদের সম্বল লোটা কম্বল, এমন কি—ঝুলিতে ডাল চাল আটা থাকলে, সে সবও কেড়ে নেয়। আগে হয়ত এ রকম ছিল না, কিন্তু দেশে আকাল পড়ায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা দস্যুবৃত্তি ধরেছে। এ-সব ভেবে সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল।

বয়সে বরণ্য শ্রদ্ধেয় সাধুদের কথাগুলি শুনে বালানন্দ বললেন : 'আপনাদের উপদেশ মাথা পেতে নিলাম, সাবধান হয়েই অরণ্যে প্রবেশ করব।' শৈশব থেকেই এই আনন্দময় পুরুষটি তর্ক বিতর্কের ছলেও কারও মনে আঘাত

দেওয়া পছন্দ করতেন না। কথা প্রসঙ্গেও সকলে আনন্দ পান, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। হিংসা ও ক্রোধকে শৈশব থেকেই দমন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন বলেই, সকল অবস্থায় নিজেও যেমন আনন্দে মগ্ন থাকেন, সঙ্গী-সাথী বা স্থান বিশেষে আলোচনাকারীরাও যাতে সেই নির্মল আনন্দের আস্বাদ পান—সেইভাবেই কথা বলতে, বা আলাপ করতে যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যতেও শিষ্যদের ইনি প্রায়ই বলতেন—'মুখের কথা মিষ্ট করে বললে শ্রোতারা যখন তুষ্ট হন, তখন রুষ্ট হয়ে তিক্ত কথা শুনিয়ে লাভ কিছু আছে? মিষ্ট কথায় হাসিমুখে বুঝিয়ে দিতে পারলে, যে বিরুদ্ধ বিষয় নিয়ে তর্ক, তারা তার দোষ বুঝে নিজেরাই উপদেশ মেনে নেবে। এই জন্যই ঋষিরা তাঁদের 'অমৃত বাণী' আমাদের জন্য রেখে গেছেন :

অহং গৃভ্‌ণামি মনসা মনাংসি
মম চিত্ত মনু চিত্তেভিরেত।

অর্থাৎ—'আমার মন দিয়ে তোমাদের মনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, আবার চিত্ত দিয়ে তোমাদের চিত্তের সঙ্গেও সংযুক্ত হতে চাই।' তাই ঋষিরা শেষে এই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন—'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।' অর্থাৎ—"তোমরা পরস্পর সহৃদয় হও, সম্প্রীতিযুক্ত হও, সব কিছু বিদ্বেষ থেকে তোমরা মুক্ত হও।"

অতীতের ঋষিবাক্য আত্মস্থ করে, বাক্যের সঙ্গে চিত্ত সংযোগ করে, তিনিও এমনি সহৃদয় হন যে, অতি বড় দুর্বিনীত ক্ষমতাদৃপ্ত মানুষও উদ্ধত মূর্তিতে পশুশক্তি প্রয়োগ করতে এসে শেষে তাঁর অন্তর্নিহিত অমৃতের পরশ পেয়ে সংযত হন, নিজের দোষ ত্রুটি অন্যায় বুঝতে পেরে কাতরকণ্ঠে কৃপাভিক্ষা করতে থাকে ; এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

উদাত্তকণ্ঠে ঋষি বাক্যের ঝংকার তুলে সন্ন্যাসী বালানন্দ একাই চলেছেন। সম্মুখে দিগন্তবিসারী মহারণ্য—একাধিক্রমে চল্লিশ ক্রোশ অবাধে এই বনভূমি অতিক্রম করতে পারলে, তখন একটি ঝারি পাবেন, সেখানে আশ্রয় মিলতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধুরা জানিয়েছেন—ঝারিমুখে ভীল দস্যুরা লুণ্ঠন প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, সাধুদের লোটা কম্বল লুণ্ঠন করতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। বালানন্দ অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী নর্মদা দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানান—ভারতের অতীত ঐতিহ্য তুমিই রক্ষা কর মা। সাধু দর্শনে পাপী তাপীর

অন্তরও নির্মল হয়, সত্যের সন্ধান পায়। এ অনাচার যাতে নিবারণ করতে পারি, তুমিই সেই ভাবে চিত্তবৃত্তি চালিত কর মা। সত্যদর্শী ঋষিরা যে ভাবে অভয়ের বন্দনা করে অমর আদর্শ রেখে গেছেন, আমিও সেই প্রার্থনা করছি। সঙ্গে সঙ্গে নীরব নিস্তব্ধ অরণ্যাণী তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ঝংকৃত হয়ে উঠল :

অভয়ং নঃ করোত্যন্তরীক্ষম্
অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা—
দুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু॥
অভয়ংমিত্রাদভয়মমিত্রাদ্
অভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

স্তোত্র পাঠ করতে করতে আপন মনে বালানন্দ বনপথে অগ্রসর হচ্ছেন, দুর্গম পথের বাধাগুলি কে যেন আগে থেকেই সযত্নে সরিয়ে দিয়েছে, সংকীর্ণ একটি পথ যেন-বিসর্পিত ভঙ্গিতে আহ্বান করছে তাঁকে; এমনি সময় পার্শ্ববর্তী প্রকাণ্ড একটি গাছ থেকে সহসা ঝুপ ঝুপ করে তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়ল দুটি বলিষ্ঠ মনুষ্যমূর্তি।

বালানন্দও এ ব্যাপারে প্রথমে চমকে উঠলেন; তারপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কি হয়েছে? গাছে উঠেছিলে কেন—আর আমাকে দেখেই বা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়বার কারণ?

মানুষ দুটি বলল : আমরা এই বন ভেঙে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ বাঘের মত দেখতে একটা জানোয়ার আমাদের দেখতে পেয়েই থাবা পেতে বসল। আমাদের একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝতে পেরে আমরা গাছের উপর উঠে পড়ি। জানোয়ারটাও একটা হুঙ্কার তুলে গাছের গোড়ায় এসে চারপাশে ঘুরতে লাগল। এমনি সময় আপনি গান গাইতে গাইতে এসে পড়লেন; আপনাকে দেখেই হোক, আর গান শুনেই হোক, জানোয়ারটা যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে পালাল।

বালানন্দ বললেন : তোমরা যদি ওর কোন অনিষ্ট না করে থাক,

যতবড় হিংস্র জানোয়ার হোক,—তোমাদের উপর হিংসা করতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরে এই অরণ্যের সংশ্রবে থেকে ওদের সম্বন্ধে আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে।

উভয়েই স্বীকার করলেন যে, জানোয়ারটিকে দেখতে পেয়েই তাঁরা প্রথমে লাঠি তুলে ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর গর্জন করে তাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁরাই ভয় পেয়ে গাছের তলায় লাঠি ফেলে ডাল ধরে উপরে উঠে পড়েন।

এরপর বালানন্দ প্রশ্ন করে জানতে পারলেন তারা দুজনেই উদাসী সম্প্রদায়ের উপাসক। এই সম্প্রদায় শিখ গুরু মহাত্মা নানকের ধর্মমতাবলম্বী। গুরু নানকও তাঁর শিষ্যদের প্রতি নর্মদা পরিক্রমার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই সূত্রে উদাসী সম্প্রদায়ও সুদূর পাঞ্জাব থেকে নর্মদা অঞ্চলে এসে প্রতি বছর পরিক্রমায় ব্রতী হন। এঁরাও এই উদ্দেশে নর্মদার কান্তারে প্রবেশ করেছেন।

বালানন্দের চেয়ে এঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে, গুরুর মত তিনি শ্রদ্ধেয় ভেবে অনুরোধ করলেন যে, অতঃপর বালানন্দজীর সঙ্গেই তাঁরা পরিক্রমা করবেন। উদাসী সাধুদ্বয়ের একজনের নাম—'গনক', আর একজন 'জংলী বাবা' নামে পরিচিত। শেষোক্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্গম বনভূমি পর্য্যটন করে এই আখ্যা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে— নর্মদা অঞ্চলের এই বহু বিস্তীর্ণ বনভূমির মত দুর্গম ও হিংস্র-জন্তু জানোয়ার-পূর্ণ ভীষণ স্থান তিনি কোথাও দেখেন নাই।

বালানন্দ বললেন: আমার সঙ্গে অরণ্য পরিক্রমা করবে—এ ত খুব আনন্দের কথা। তবে, আমার প্রকৃতি আলাদা। পরমাত্মার ইচ্ছায় নর্মদা মায়ী পরিক্রমাকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন—এই অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে আমি বরাবর চলেছি। এমন কি, শুনলে তোমরা অবাক হবে—বহু পর্য্যটককে গাছে উঠে ডালের সঙ্গে বন্য লতা দিয়ে নিজেদের দেহ বন্ধন করে রাত্রিবাস করতে দেখেছি। নীচে থাকলে ঘুমন্ত অবস্থায় পাছে বাঘ, ভাল্লুক বা অজগর সাপের গ্রাসে পড়ে মারা পড়েন—এই আশংকায়। আমি কিন্তু এভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখে মনে মনে কৌতুক বোধ করি। কেননা,

প্রাণের মায়া যেখানে কাটিয়ে ফেলেছি, প্রাণরক্ষার জন্যে এত কাণ্ড করতে হবে ? আমি ত নদীর কিনারা কিম্বা বনের মধ্যেই একটু ফাঁকা জায়গায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হই—নর্মদা মায়ীর কোলেই যখন আশ্রয় নিয়েছি, আমার ভয় নেই।

শৈশব থেকে নানাভাবে বহু লোকের সঙ্গে মিশে আলাপ পরিচয় করার ফলে বালানন্দজীর অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্‌পটুতায় সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হতেন। নবাগত দুই সাধু—সনক এবং জংলীবাবাও পরিতুষ্ট হলেন। জংলীবাবা কৌতূহলী হয়ে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন : আপনি কি বরাবর একাই এভাবে পরিক্রমা করে আসছেন সাধুজী ?

বালানন্দ সহাস্যে বললেন : আগেই ত বলেছি, নর্মদামায়ী ছাড়া কারও পরোয়া করিনে—একাই বেরিয়ে পড়ি, তারপর পথে হয়ত সঙ্গী সাথী জুটে যায়, তাদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই দিন কাটে। কিন্তু একঘেয়ে জঙ্গল যাত্রা তাঁদের অনেকেরই পছন্দ হয় না—তাঁরা কাছাকাছি গাঁও, শহর কিম্বা কোন তীর্থের সন্ধান পেলেই আমাকে ছেড়ে সরে পড়েন। জানেন যে, আমার লক্ষ্য পরিক্রমা, ঠিক পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া—সে পথে কোন আস্তানা যদি মিলে যায় আর নদীর কাছাকাছি হয়, কুচ পরোয়া নেই—আশ্রয় নিই। কিন্তু তা বলে নিজের সুবিধার দিকে চেয়ে বিপথে পাড়ি দিতে রাজী নই। তোমাদের যতক্ষণ ভাল লাগবে, আমার সঙ্গে থেকো; তারপর যেই বুঝবে—একঘেয়ে লাগছে, বা মনে ধরছে না, তখন মন যা চাইবে, তাই করবে—আমার তাতে বাধা দেবার প্রবৃত্তি নেই।

উভয়েই ভাবের উচ্ছ্বাসে জানালেন যে, তাঁরা বালানন্দজীকে কিছুতেই ছাড়বেন না—বরাবরই তাঁর সঙ্গে থাকবেন। বালানন্দ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : ভালো।

অতঃপর অবাধ গতিতে তিন সাধুর পরিক্রমা চলল। জংলী বাবা গীতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ছিল কর্কশ। পক্ষান্তরে বালানন্দজী শৈশব থেকে তাঁর অনুপম সুকণ্ঠের জন্য সাধুমহলের প্রশংসা পেয়ে এসেছেন। কোন মন্দির বা তীর্থে আশ্রয় নিলে গুরু গৌরীশঙ্করের আদেশ হোত শিষ্যের প্রতি—'একটা ভজন ত শোনাও।' অমনি তাঁর সুকণ্ঠের ঝংকার উঠে এমন এক আনন্দময়

পরিবেশের সৃষ্টি করত যে, আশ্রমস্থ সকলে শ্রোতারূপে মুগ্ধ কণ্ঠে ধন্য ধন্য করতেন। সেই কণ্ঠ তাঁর দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে একই ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা গেছে।

কথাপ্রসঙ্গে সনকের মুখে বালানন্দজী যেই শুনতে পেলেন, জংলী বাবা গুরু নানকজীর তৈরী অনেক দোঁহা জানেন, আর নিজেই সে সব গীত করেন। অমনি তাঁকে নানকজীর একটি দোঁহা শোনাবার জন্য অনুরোধ করলেন। জংলী বাবা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করলেন :

সাধ কৈ সংগি মুখ উথল হোত।
সাধ সংগি মল সকলি খোত॥
সাধ কৈ সংগি মিটে অভিমান।
সাধ কৈ সংগি প্রগটৈ সুজ্ঞান॥
সাধ কৈ সংগি বুকৈ প্রভু নেরা।
সাধ সংগি সভ হোত নিবেরা॥

এই দোঁহার অর্থ হচ্ছে—সাধু সঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয়, সাধু সঙ্গে মনের ময়লা ধুয়ে যায়, সাধু সঙ্গে অভিমান দূরে পালায়। সাধু সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, সাধু সঙ্গে প্রভুকে নিকটে মনে হয়, সাধু সঙ্গে সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়।

জংলী বাবা তাঁর ভজন শেষ করে নিজেই অপ্রসন্ন চিত্তে বললেন—ভগবানজী গান গাইবার শক্তি দিলেও গলা দেন নি। তাই আমার গান শুনে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ার আক্রমণ করতে ছুটে আসে, কিন্তু সাধুজী আপনার মিঠে গলার আওয়াজ পেয়েই তারা হিংসা ভুলে এগিয়ে আসে।

এরপর বালানন্দজীকেও অনুরুদ্ধ হয়ে একটি ভজন ধরতে হলো। তিনি তখন নিজের অত্যন্ত প্রিয় ভজনটি ধরলেন :

জীয়া যো চাহে ত জীবকো রক্ষা করোরে।
ধন যো চাহে ত ধরমকো বাঢ়াও রে॥
নাচা যো চাহো ত, নাচ গোবিন্দ আগে।
গাওয়া যো চাহো ত, রামগুণ গাওরে॥
ভাগা যো চাহো ত, ভাগে বুরা করমসে।
আয়া যো চাহো ত, রাম শরণমে আওরে॥

সহজবোদ্ধ সরল ভজন। এর অর্থ হচ্ছে—যে লোক দীর্ঘকাল বাঁচতে

চান, তাঁর উচিত জীব হত্যা না করে জীবনকে রক্ষা করা। ধনের আকাঙ্খা যাঁর, তিনি যেন ধর্ম বৃদ্ধি করেন। নাচতে যাঁর সাধ, যেন গোবিন্দ বিগ্রহের সামনে নাচেন। গানের বাসনা মনে জাগলে রামচন্দ্রের গুণগান করা কর্ত্তব্য। পালাবার বাসনা হলে মন্দ কর্ম ছেড়ে পালাবেন। যিনি আসতে চান, যেন রামচন্দ্রের শরণ নিতে এগিয়ে আসেন।

সুকণ্ঠের ঝংকার গানের মিষ্ট শব্দগুলির সঙ্গে মিশে নির্জন বনভূমিকে মুখরিত করে তুলল। উদাসী সাধুদ্বয় মুগ্ধ হয়ে বার বার বলতে লাগলেন: আমাদের জীবন ধন্য হলো। এ হচ্ছে সাধু সঙ্গের ফল।

মনের আনন্দে ক্রমশ: এঁরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। এই সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চলতে লাগল। বালানন্দ সর্বক্ষণই তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে সতর্ক করে দেন: আমাদের এই যে পরিক্রমা, একেও তপস্যা বলে জানবে। চলতে চলতে আমরা এমন প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করব, যাতে জ্ঞানলাভ হয়।

কথায় কথায় গুরুলাভের প্রসংগ উঠতে উদাসী সাধুরা বললেন যে, গুরু কৃপা লাভ করতে তাঁদের বহুদিন বৃথাই কেটে গেছে। এক গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য গুরু ধরতে হয়েছে। শেষে এমন এক সিদ্ধ গুরুর সন্ধান মিলে গেল—যিনি বার কয়েক নর্মদা মায়ীকে পরিক্রমা করেছেন, তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েই ত এই পথের সন্ধান পেয়েছি। কৌতুহলী হয়ে এঁরা বালানন্দজীর গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হাসিমুখে বললেন: নর্মদা মায়ীর এমনি দয়া আমার উপর যে, আমার গুরুদেব তাঁর এই শিষ্যটির জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন—তখন আমি নয় বছরের বালক।

জংলী বাবা একথা শুনেই সোল্লাসে তাঁর সাথীর পৃষ্ঠে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন: শুনছ ভায়া—সাধুজীর কি সৌভাগ্য। অত কম বয়সে গুরু কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

বালানন্দ সহাস্যে বললেন: এই গুরু সম্বন্ধে ঋষিরা কি বলেছেন শোন—

গুরু বিন্ না মিলে জ্ঞেয়ান, ভাগ্ বিন্ না মিলে সজ্জন।
তপ বিন্ না মিলে রাজ, বল বিন্ না হটে দুর্জন॥

অর্থাৎ—গুরু বিনা জ্ঞান মিলে না, ভাগ্যে না থাকলে সাধু সঙ্গ হয় না, বিনা তপস্যায় রাজ্য মিলে না, শক্তি ছাড়া শত্রুকে পরাজয় করা যায় না। কাজেই জ্ঞানলাভ করতে হলে গুরু চাইই।

এই ভাবে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনার সঙ্গে এ দের পরিক্রমা চলতে থাকে। উদাসী সাধুদ্বয় হিসাবী মানুষ। ভ্রমণের সঙ্গে ভোজনের ব্যবস্থার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য তাঁদের। বলেন দেহ রক্ষার জন্য এর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সেজন্য, আটা, ডাল, ঘী এবং মশলাপত্র সঙ্গের গাঁটরি মধ্যে উভয়েই কিছু বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করেছিলেন। সারাদিন পর্য্যটনের পর সন্ধ্যার দিকে নদীতীরে এসে পাকের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বালানন্দকে এ বিষয়ে উদাসীন দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। তাঁর গাঁটরির মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কিছু বস্তু থাকে—আপদে বিপদে ঔষধের মত যেগুলি কাজে লাগে। যেমন—মধু, আদা, হরিতকী, আমলকী, এমন কি উগ্রশক্তি-সম্পন্ন বিষও ঐ সঙ্গে থাকে। খাদ্যবস্তুর কথা সাধুরা তুললে বালানন্দ সহাস্যে বলেন—আগেই ত বলেছি, এসবের কোন পরোয়া করি না, প্রয়োজনও মনে করি না। নর্মদা মায়ীই ব্যবস্থা করবেন এই আমার ভরসা।

সাধুরা তখন সবিনয়ে অনুরোধ করতে থাকেন—তাঁরা ডাল রুটি তৈরী করবেন, সাধুজীকে গ্রহণ করতে হবে। পাছে তাঁরা মনঃক্ষুন্ন হন, এই আশঙ্কায় বালানন্দ আপত্তি না করে বলেন—সামান্য আহার্য্যেই আমার তৃপ্তি। তোমাদের ভোজ্য গ্রহণ করলেই যদি সন্তুষ্ট হও, তাহলে আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। তবে দু'খানি রুটি, আর সামান্য কিছু ভাজি আমার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী কিছু নয়।

জংলী বাবা কথাটা শুনে বলেন—এ যে পাখীর আহার সাধুজী! এতে শরীর টিকবে কি করে? আমরা প্রত্যেকে যে এর চার পাঁচগুণ বেশী ভোজন করি।

ভোজ্য বস্তুর দিকে কটাক্ষ করে বালানন্দ সহাস্যে বলেন—সে ত চোখের সামনেই দেখছি। যার যেমন রুচি, তার উপর আগ্রহ থাকলে পরমাত্মার কৃপায় সেটা সিদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু এ কথা গৃহীর পক্ষেই খাটে॥ সাধু সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা, অনাহার বা অনশনেও তাদের অভ্যস্ত হতে হয়। তবে ভগবানের ওপর বিশ্বাস থাকলে, তিনি ভক্তের বাসনা পুর্ণ করে থাকেন।

বালানন্দজীর উপদেশগুলি উভয় সাধু সানন্দে শোনেন। এই যে পবিত্র পর্য্যটন, এঁরা তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের উপায় বলে গ্রহণ করতে পারেন নি—পরিক্রমার পর লোক-সমাজে অভিজ্ঞ হবেন, খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে, সকলে

শ্রদ্ধাভক্তি করবে—এই উদ্দেশ্যেই এঁদের পরিক্রমা। বালানন্দও এঁদের উভয়ের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছিলেন। জেনেছিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি যাতে উন্মোচিত হয়—সেদিকে এঁদের আদৌ লক্ষ্য নেই। দিনান্তে আহার ও বিশ্রামের সুখ সুবিধা ভোগ করবার জন্যই এঁরা যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, সেইজন্য নির্জন বনানী অপেক্ষা নদীতীরবর্তী বসতিবহুল অঞ্চলগুলির দিকেই এঁরা বেশী আকৃষ্ট হতেন, যেহেতু সেখানে আহার্য্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বালানন্দজীর ইচ্ছার একান্ত প্রতিকূল। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যে, গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, নিকটে নদীর সন্ধান না পেয়ে, সন্ধ্যাকালে অনুমানে নদীর অবস্থিতি স্থির করে নিয়ে অরণ্যবক্ষেই রাত্রিবাস করেছেন—ব্যাকুল ভাবে নর্মদামায়ীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, এই স্থানে তিনি অধিষ্ঠিতা হয়ে তাঁকে ধন্য করুন, তিনি অন্তরে ধারণা করে নিয়েছেন—মায়ীর পদতলেই রাতের শয্যা পেতেছেন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনিও এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছেন যে, মা তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু উদাসী সাধু দুটির মতিগতি অন্য দিকে—অরণ্য যেখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে কোন পল্লীর সঙ্গে মিশেছে, সেই দিকেই তাঁদের চিত্ত আকৃষ্ট হতে থাকে। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা একদা নর্মদা তীরবর্তী মাণ্ডলা নামক একটি স্থানে এসে পড়লেন। এ অঞ্চলে তখন দস্যুদের খুব প্রাদুর্ভাব; তারা অবাধে গ্রামবাসীদের ধন সম্পত্তি গরু মহিষ ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলি পর্য্যন্ত লুঠ করে সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করে নিশ্চিন্ত হয়। দুর্গম বনপথে তাদের অনুসরণ করাতে কেউ সাহস পায় না। এরূপ অনাচার ব্যাপক হয়ে পড়ায়, মাণ্ডলা জেলার কমিশনার সাহেব সদলবলে এর প্রতীকারের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি গ্রামের সীমানা ত্যাগ করে দুর্গম বনের মধ্যেই তাঁর শিবির পাতাবার ব্যবস্থা করেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, কতিপয় উপযুক্ত পুত্র কন্যা, বহু বরকন্দাজ ও খিতমতদারদের সমাগম হওয়ায় স্থানটি বেশ জমকে ওঠে।

এদিকে বালানন্দ এবং তাঁর দুই সাথী সাহেবের তাঁবুর কাছাকাছি একটা স্থানে এসে পড়লেন। কতিপয় গ্রামবাসীও এই বনে কাঠের সন্ধানে এসেছিল। সাধু দর্শনে তারা ধন্য হয়ে ভক্তি নিবেদন করতে এগিয়ে এলো।

স্থানটি কিছু ফাঁকা দেখে এখানেই বালানন্দজী আশ্রয় নেবার জন্য সঙ্কল্প করলেন। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তখন বনভূমি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। উদাসী সাধুদ্বয়ের ইচ্ছা, আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নদীতীরে আশ্রয় নেন। বালানন্দকে সে কথা জানাবার উদ্দেশ্যে সুধালেন: সাধুজী, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তানা পাতলে হয় না?

বালানন্দজী গম্ভীর মুখে বললেন: না—বরং আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে আস্তানা পাতলে ভাল হোত, শান্তিতে রাতটা কাটাতে পারতে।

জংলী বাবা এ কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন: কেন? নর্মদামায়ীর প্রতি আপনার কত ভক্তি, অথচ এখন তাঁর তীরে যেতে নারাজ? মায়ীকে দর্শন করবেন না?

বালানন্দ বললেন: হ্যাঁ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেই নদীমায়ীকে দর্শন করতে যাব, সেখানে স্নান আহ্নিক শেষ করে আবার এখানে ফিরব। কিন্তু এখানকার আস্তানা আরও গভীর বনে পাতলেই ভাল করতে।

এমনি সময় কাষ্ঠআহরণকারী গ্রামবাসীরা সাধু দর্শনে এসে জানাল যে, কাছেই কমিশনার সাহেবের তাঁবু পড়েছে—ডাকুর সন্ধানে তিনি এসেছেন। ভারি কড়া সাহেব, আমাদের মত গ্রামীনদের গ্রাহ্য করেন না, মানুষ বলেই ভাবেন না। আপনারাও খুব হুঁসিয়ার থাকবেন মহারাজজী—সাধুসন্তের উপর সাহেবের ভারি রাগ।

উদাসী সাধুরা এতক্ষণে বুঝলেন, কেন বালানন্দ মহারাজ আরো গভীর জঙ্গলে পিছিয়ে গিয়ে তাঁদের আস্তানা ফেলবার জন্যে বলেছিলেন। গ্রামবাসীদের কথা শুনে এবং তাদের নির্দ্দেশমত বনের একদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই তাঁরা দেখতে পেলেন, কমিশনার সাহেবের তাঁবু, তার সামনে টহলদার সশস্ত্র বরকন্দাজ দল।

বালানন্দ বললেন: এত কাল পর্য্যটন করছি, কিন্তু কখনো ঐ সাহেবদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। আজও ওদের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়, এটা আমার ইচ্ছা নয়। একটা অমঙ্গলের আভাস আমি পাচ্ছি।

বালানন্দের কথা শুনে জংলী বাবা রুখে উঠে বললেন: আমরা জানি ওরা সয়তান আছে, পাঞ্জাবকে ওরা জ্বালিয়ে এসেছে। কিন্তু আমরা সাধু, আমাদের সঙ্গে ওরা দুশ্‌মনি করবে কেন—ওদের কি এক্তিয়ার?

জংলী বাবার কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল -জন দুই বরকন্দাজ বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে তাঁদের দিকেই সবেগে আসছে।

উদাসী সাধুদ্বয় তখন সারাদিনব্যাপী পথশ্রমের পর নৈশ আহার্য প্রস্তুতে ব্যস্ত। একজন রুটির আটা মেখে একখানা লৌহপাত্রে রেখে জোর দিয়ে ডলছেন। এঁদের ঝোলার মধ্যেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র থাকে, সেই সঙ্গে আহার্য প্রস্তুতের সাধারণ উপাদানও। আর একজন ধুনি সাজিয়ে পাথর ঠুকে ঠুকে অগ্নি উৎপাদনে আগ্রহশীল। একটু তফাতে বালানন্দজী তাঁর আসনে বসে গুণ গুণ স্বরে একটি দোঁহার কীর্তন তুলে সকৌতুকে ক্ষুধার্ত দুই সাথীর আহার্য প্রস্তুতের উদ্যোগ-পর্ব দেখছেন। কমিশনার সাহেবের বরকন্দাজদ্বয় সঙ্গীন উঁচিয়ে সবেগে তাঁদের দিকে আসছে জেনেও তাঁরা তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজেই যেন ব্যস্ত বা লিপ্ত। কিন্তু একটু পরেই উভয় বরকন্দাজ সেখানে এসে উদ্ধত কণ্ঠে জানাল যে, কমিশনার হুজুর তলপ করেছেন, এখনি তাদের তিন জনকে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। হুজুর তাঁবুতে আছেন।

সনক ও জংলী বাবা দুজনেই যুগপৎ বালানন্দজীর পানে তাকালেন—তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই প্রশ্ন সূচিত হলো—এখন কি করবেন তাঁরা? বালানন্দ একইভাবে কীর্তনে মগ্ন। একটু পরে সহসা তিনি বরন্দাজদের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: তোমাদের হুজুরকে বলগে, আমরা ভ্রমণকারী সাধু সন্ন্যাসী, গৃহীর বাড়ীতে আমরা যাব না। তা ছাড়া সাহেবদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা দুনিয়ার কোন খবর রাখি না। তোমাদের হুজুরকে এই কথাগুলিই বল।

দুই বরকন্দাজ সাধুর কথা শুনে প্রথমে নিজেরা পরামর্শ করল, তারপর একজন সাধুদের উপর নজর রাখবার জন্য সেখানে রইল, অপর বরকন্দাজ তাঁবুতে ফিরে গেল সাধুজীর কথা সাহেবকে শোনাবার জন্য।

সাহেব তখন তাঁবুর প্রাঙ্গণে পাইপ টানতে টানতে পাইচারী করছিলেন। তাঁর মেজাজটিও ভাল ছিল না; বড় ছেলেটি প্রত্যুষেই জঙ্গলে সেঁধিয়েছে... শিকারের উদ্দেশ্যে—এখনো পর্যন্ত ফেরবার নাম নেই। খানিক আগে কয়েক-জন সিপাহীকে পাঠিয়েছেন ছেলের সন্ধানে, কিন্তু তারাও ফেরেনি। এমনি সময় বরকন্দাজ এসে বালানন্দ সাধুর কথা সাহেবকে বলল।

শুনেই সাহেব একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন, কমিশনার সাহেবের হুকুম অমান্য করে এত বড় আস্পর্দ্ধা। তিনি সেই বরকন্দাজকে বললেন: নেহি, নেহি, জরুর হিঁয়া আনে হোগা, আবি লেযাও।

হুকুম শুনে বরকন্দাজ ছুটল সেখানে। বালানন্দকে বলল যে, সাহেব ভারি রেগে গেছেন—তাঁদের হাজির হতে হবে সাহেবের কাছে এখনই।

উদাসী সাধুরা আবার তাকালেন বালানন্দের দিকে। কিন্তু বালানন্দ নির্বিকার; তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগ বা আশঙ্কার কোন ছায়াই পড়েনি। তেমনি শান্তভাবে স্নিগ্ধস্বরে তিনি বরকন্দাজকে বললেন: সাধুদের মুখ থেকে একবার যে কথা বার হয়, তার আর অদল বদল হয় না। সারাদিন অরণ্য ভ্রমণের পর তাঁরা যেখানে আসন পেতেছেন, সেখান থেকে স্বেচ্ছায় উঠবেন না। সাহেব ইচ্ছা করলে জোর-জবরদস্তি করে তাঁদের ধরে নিয়ে যেতে পারেন।

আবার সেই বরকন্দাজ ছুটল সাহেবের কাছে সাধুর জবাব নিয়ে। পুত্রের ব্যাপারে সাহেব একেই উদ্বিগ্ন ছিলেন, এখন এই ভিখ্ মাংগা বুজরুকদের কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁবুর মধ্যে ঢুকে হাণ্টারটা টেনে নিয়ে বরকন্দাজকে বললেন: চলো জল্দি।

ব্যাপার দেখে বালানন্দের উভয় সাথী ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং বার বার বালানন্দকে বলছিলেন যে, সাহেবের হুকুম তামিল না করলে যদি সাহেব কোন হাঙ্গামা বাধায়?

অর্থাৎ তাঁরা বেগতিক দেখে সাহেবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বালানন্দ বরাবরই অটল। তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন: নর্মদামায়ী আর গুরুজী ছাড়া কারো হুকুম তামিল করতে আমি শিখিনি। তারপর একবার যে কথা বলেছি, তার খণ্ডন করবার শক্তিও আমার নেই। সাহেবের গরজ থাকে ত নিজেই এখানে আসবে।

বালানন্দের কথা শেষ হতে না হতেই সাহেবকে উদ্ধত ভঙ্গিতে আসতে দেখা গেল। বালানন্দ তাঁর সাথীদের বললেন: তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক—আমার সঙ্গেই সাহেবের বোঝাপড়া হয়ে যাক।

সাহেব সেখানে এসেই হাতের হাণ্টারটি বার দুই আস্ফালন করে বালানন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বরকন্দাজ ইতিমধ্যেই আদেশ অমান্যকারী সাধুটিকে

দেখিয়ে দিয়েছিল। সাহেব প্রথমে হুকুম না শোনার জন্য চড়া গলায় বালানন্দকে ধমক দিলেন। বালানন্দ নীরবে সাহেবের হুমকী শোনেন, আর মিট মিট করে চেয়ে থাকেন, চোখে মুখে ফুটে ওঠে হাসির মৃদু আলো। সাহেব তাতে আরও চটে ওঠেন। শেষে শক্ত হয়ে বললেন : শোনো। এ অঞ্চলে বহু স্থানে চুরি ডাকাতি হচ্ছে। আমার বিশ্বাস—সে সব তোমাদেরই কাজ।

বালানন্দকে তখন শান্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হলো ; তিনি বেশ স্পষ্ট করে সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন—অনেক রকমের সাধুসন্ত আছে, তাঁরাও এক শ্রেণীর সাধু—নর্মদা নদীর তীরবর্তী দুর্গম অরণ্যে ভ্রমণ করাই তাঁদের সাধনমার্গের লক্ষ্য। চোর দস্যুদের সঙ্গে সাহেব তাঁদের নাম করে খুবই অন্যায় কাজ করেছেন।

বালানন্দের ঝুলিটি সামনেই পড়ে ছিল। সাহেব সেটি তুলে বললেন যে, তাঁর কথা মিথ্যা নয়, আর তিনি যে অন্যায় কিছু বলেন নি, এ থেকেই প্রমাণ হবে। এর পর একান্ত অবজ্ঞাব সঙ্গে সাহেব সেই ঝুলিটি সেখানে উপুড় করে দিতেই তার ভিতরের জিনিষগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে ইস্পাতে তৈরী ছোট একটি শাবল, আর সেই রকম আয়তনের একটি টাঙ্গি সর্বাগ্রে সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। তিনি তখন রূঢ় বিদ্রূপের সুরে বললেন : ঠিক হায় !

সাহেবের কথার ভঙ্গি থেকেই বালানন্দ বুঝতে পারলেন যে, অস্ত্র দুটিকে সাহেব তাঁর আগেকার উক্তির প্রমাণ স্বরূপ ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তিনি তখনই সাহেবের সন্দেহ মোচনের উদ্দেশ্যে বুঝাতে লাগলেন যে, যারা বনে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে, এ রকম অস্ত্র সব সময়ই তাদের সঙ্গে রাখতে হয়। এ দুটো এমন কিছু মারাত্মক অস্ত্র নয় যে, সাহেব বড় রকম কিছু আবিষ্কার করেছেন ভেবে অত উল্লাস করছেন। জঙ্গল মধ্যে গাছের মূলে এমন অনেক খাদ্য বস্তু থাকে, যেগুলি তোলবার জন্য এই শাবলের প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী আস্তানা নির্মাণ করবার জন্যও এই জিনিষটি কাজে লাগে। গাছ থেকে ধুনির কাঠ সংগ্রহ করতে টাঙ্গিরও আবশ্যক আছে।

সাহেব বালানন্দের কথা অগ্রাহ্য করে দৃঢ়স্বরে বললেন : নেহি, নেহি, তোম্ লোক মোকাম তোড়তে হৈ, সিঁদ দেতে হৈ, আদমীকো ঘাল করতে হো, ইসি ওয়াস্তে ইসব ঝুলিমে রাখ দিয়া।

সুতরাং এই দুটি অস্ত্র রাখার দরুণ বালানন্দকে এক প্রকার অপরাধী সাব্যস্ত করেই সাহেব ঝুলি থেকে বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলিও তদারক করতে লেগে গেলেন। প্রথমেই একটি পুলিন্দা খুলে ফেলতেই তার ভিতর থেকে খানিকটা গঞ্জিকা বেরিয়ে পড়ল। আবগারী ব্যাপারে গাঁজা আফিমের সঙ্গে সাহেবের পরিচয় ছিল। তথাপি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: এত বেশী পরিমাণে আবগারী জিনিস রাখা হয়েছে কেন ?

বালানন্দ বললেন: সেবন করবার উদ্দেশ্যে। তোমরা যেমন পাইপে তামাক ভরে তার ধূমপান করে আনন্দ পাও, আমরাও মাটির কলিকায় এই জিনিষটি রীতিমত তদ্বির করে সেজে আগুনের আঁচে পুড়িয়ে এর ধূম সেবন করি। দিনরাত বনে জঙ্গলে নদীর কিনারায় পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়, মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি বহে যায়। সে সব দৌরাত্ম্য সহ্য করবার শক্তি পাই এই বস্তু সেবন করে। তোমাদের পাইপের ঐ শোধন করা শক্তিহারা তামাকের চেয়ে আমাদের এই তামাকের তেজ আর গুণ অনেক বেশী।

এই সময় আর একটি পুঁটলি খুলতেই যে ভীষণ বস্তুটি বেরিয়ে পড়ল, সেটিও কার্য্যসূত্রে সাহেবের সুপরিচিত। সাহেব সেটি দেখে চমকে উঠে বললেন: কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি আরসেনিক (শঙ্খবিষ)। এ বস্তু তোমার ঝুলিতে কেন ? জান, বেশী পরিমাণে এই গাঁজা ও শঙ্খবিষ কারও কাছে যদি ধরা পড়ে, তাহলে তখনি তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয় ? তোমার ঝুলি থেকে এ দুটো জিনিস যখন মিলেছে, তোমারও এ শাস্তি হবে।

বালানন্দ বললেন: গাঁজার কথা আগেত বলেছি, ওর ধূম পান করি। আর, আমাদের মত সাধুরা—বারমাস বনে জঙ্গলে যারা ঘুরে বেড়ায়, এই বিষও তারা ব্যবহার করে ঔষধের মত। তার পর, সব সময় এ দুটো জিনিস পাওয়া যায় না বলেই, মরশুমের সময় কিছু বেশী পরিমাণে কিনে ঝুলির মধ্যে রাখা হয়েছে। যে জিনিস ঔষধের মত ব্যবহার চলে, এ রকম অবস্থায় সঙ্গে কিছু বেশী থাকলেও আবগারী আইনের আমলে পড়ে না।

সাহেব তাঁর অভ্যাস মত পুনরায় ধমক দিয়ে বললেন: তুমি দেখছি সবজান্তা সাধু, আইন কানুনও জেনে রেখেছ। কিন্তু শঙ্খবিষ কেউ যে ওষুধের মত খাবার জন্যে সঙ্গে রাখে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ মারবার জন্যই এই বিষের পাথর সঙ্গে রেখেছ তুমি।

বালানন্দ বললেন : সাধুরা কখন মিথ্যা বলে না। এখন আমার কথা বিশ্বাস করা বা না-করা, তোমার ইচ্ছা। আমি এখনো বলছি, খাবার জন্যই এ বিষ সঙ্গে রেখেছি।

সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই বিষ থেকে একটা ডেলা তুলে নিয়ে বললেন : যদি আমার সামনে তুমি এটুকু খেতে পার, তাহলে বুঝব তোমার কথা সত্যি। নতুবা বুঝব, তুমি মিছে কথা বলেছ, আর সেজন্য তোমাকে এই হাণ্টার দিয়ে চাবকাব।

বিষের ডেলাটুকু বালানন্দের হাতে দিয়ে সাহেব হাণ্টারটি নিয়ে আস্ফালন করতে লাগলেন। বালানন্দের অন্তর এখন সাহেবের কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সাহেব তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে! মানুষ মারবার জন্য এই বিষ বেশী পরিমাণে তিনি সঙ্গে রেখেছেন! বিষ-পাথরের যে অংশটুকু সাহেব তাঁকে খেতে বললেন, তার পরিমাণ বিচার না করেই তৎক্ষণাৎ তিনি মুখের মধ্যে ফেলে গিলে ফেললেন। এ-কাণ্ড দেখে চোখ দুটো কপালের দিকে তুলে সাহেব অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ; উদাসী সাধুদ্বয় এবং সাহেবের বরকন্দাজরাও স্তম্ভিত।

একটু পরে সাহেব বললেন : সত্যিই তুমি সবটা খেয়ে ফেললে—মরবে যে ?

বালানন্দ বললেন : তুমিই ত আমাকে মরতে বাধ্য করলে সাহেব। তোমার কথামত হাজতে বা জেলখানায় শাস্তি ভোগ করতে যাওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা অনেক ভাল আমার পক্ষে।

বালানন্দ যেখানে আসন করেছিলেন, তার পিছনেই একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের গুঁড়িতে পীঠের ঠেস দিয়ে তিনি শক্ত হয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য, বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হলে মাটির উপর সহজে না পড়ে যান। উদাসী সাধুদের লক্ষ্য করে বললেন : যদি আমার মৃত্যু হয়, দেহটি নর্মদা মায়ীর জলে ভাসিয়ে দিও, এই আমার অনুরোধ।

এমনি সময় ঝুলির জিনিসপত্রগুলি ছড়ানো অবস্থায় দেখে তিনি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন : অনেক দরকারী জিনিস থলিতে ছিল, সাহেব সেগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, যদি থলির মধ্যে ভরে রাখ ভাল হয়, এর পর অনেকেরই উপকার হবে।

সাহেব আগতেই উদাসীদের হাণ্ডের কাজ বন্ধ হয়েছিল। বালানন্দের

কথায় তখনই তাঁরা জিনিসগুলি ঝেড়ে ঝুড়ে থলিতে ভরতে লাগলেন। সাহেবও সেখানে এক পাশে স্থাণুর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে তখন অনুতাপ এসেছে—এভাবে সাধুকে এতখানি বিষপাথর খেতে বলে প্রকারান্তরে তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন—এই কথাই তাঁর মনে একটা অস্বস্তিকর চিন্তার উদ্রেক করছিল। সাধুর দিকে তাকাতেই দেখেন, একই ভাবে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, কোনরূপ চাঞ্চল্য বা অস্থিরতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। সাহেবের ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করেন—দেহের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে কি না? বিষপায়ীরা যে নিদারুণ যাতনা ভোগ করে থাকে, সাহেবের সেটা জানা ছিল। এই অদ্ভুত সাধুর অবস্থাটি ভালভাবে বুঝবার অভিপ্রায়ে তিনি হাতের হাণ্টারটি তাঁর ঘাড়ের দিকে আস্তে আস্তে চালনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও বালানন্দের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এমনি সময় তাঁর শিবির থেকে একটা কোলাহল উঠে সাহেবকে সচকিত করল। তিনি জনৈক বরকন্দাজকে উক্ত কোলাহলের কারণ জানাবার জন্য শিবিরে পাঠালেন। কিন্তু পরক্ষণেই শিবির থেকে এক অনুচর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—সাহেবের বড় ছেলে এইমাত্র শিকার করে ফেরেন; কিন্তু ঘোড়া থেকে নামবার সময় এমন বেকায়দায় পড়ে যান যে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

সাহেব আর কোন দিকে না চেয়ে, কাউকে কিছু না বলে, মুখ দিয়ে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে শিবিরের দিকে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

দুই

সংজ্ঞাহীন সাহেব-পুত্রকে নিয়ে শিবিরে তখন হৈ চৈ পড়ে গেছে। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য সাধারণত যে সব প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে, সেগুলির যথাসাধ্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোন ফল পাওয়া গেল না। সাহেব তখন মাণ্ডলার সদরে ঘোড়সওয়ার পাঠালেন সেখানকার ডাক্তারকে আনবার জন্য। বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের শিবিরে বিপত্তির খবর পেয়ে ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে চিকিৎসা করেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

এদিকে উদাসী সাধুরা তাঁদের আহার্য্যের উদ্যোগ-পর্ব শেষ করেই ধুনি জ্বালিয়ে পাকের ব্যবস্থা করলেন। মধ্যে মধ্যে বালানন্দের অবস্থাটা পরীক্ষাও করেন। তিনি সেই একইভাবে গাছের পীঠে ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট, চক্ষু দুটি নিমীলিত। তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন যে, ওষ্ঠ দুটি যেন ঈষৎ স্পন্দিত হচ্ছে। তখন তাঁরা অনুমান করেন, সাধুজী মনে মনে কোন মন্ত্র জপ করছেন। তা'হলে ভয় নেই, তাঁর যেরূপ প্রবল যোগবল, তাতে ঐ শঙ্খবিষ তিনি পরিপাক করে ফেলবেন এবং তাঁদের এত যত্নে প্রস্তুত আহার্যও গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে কতিপয় উৎসাহী বর্ষীয়ান ব্যক্তিও সেই স্থানে সমবেত হয়েছিল। তারা সমস্ত ঘটনা শুনে দৃঢ়স্বরে মত প্রকাশ করল—সাধুর প্রতি কুব্যবহার করাতেই সাহেবের শিবিরে সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ বিপত্তি ঘটেছে। সাধুকে তুষ্ট না করলে সাহেবের ছেলে সেরে উঠবে না—যতই ডাক্তার বদ্যি আনুক। উদাসী সাধুরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন—কতক্ষণে বালানন্দজীর বাহ্যিক চৈতন্যোদয় হবে—তাঁদের সঙ্গে একত্র ভোজনে বসবেন।

শিবিরের মধ্যে পুত্রের চিকিৎসা ও নানারূপ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সাধুর মুখখানা মধ্যে মধ্যে সাহেবের মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে তাঁকে বিচলিত করতে থাকে! হঠাৎ তিনি ডাক্তারকে বললেন: দেখুন, কাছেই একজন সাধু শঙ্খবিষ সেবন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই সময়েই আমার শিবিরে এই দুর্ঘটনা হয়। আপনি ঝাঁ করে তাঁকে দেখে আসুন ত। যদি বাঁচাতে পারেন ত কথাই নেই, নতুবা তার জন্যে যে চিকিৎসা করবেন আমিই তার সমস্ত খরচা দেব। পূর্বের এক বরকন্দাজ একটা লণ্ঠনের সাহায্যে ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

উদাসী সাধুরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন—বালানন্দজী কতক্ষণে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এমনি সময় লণ্ঠনের আলোকে দুই ব্যক্তিকে দেখে তাঁরা চমকিত হয়ে উঠলেন—সাহেব কি কোন কারসাজি করবার জন্যে এদের পাঠিয়েছেন? কিন্তু তাঁরা যখন জানতে পারলেন, সাহেব নিজের ছেলের চিকিৎসার জন্যে সদর থেকে যে ডাক্তার আনিয়েছিলেন, তাঁকেই পাঠিয়েছেন সাধুর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, তখন তাঁরা বুঝলেন, তাহলে সাহেবের মনে অনুতাপ হয়েছে। একেই বলে—গরু মেরে জুতো দান।

জংলীবাবা ত হেসেই খুন। ডাক্তারকে বললেন: আপনি এই সাধু-বাবার কি চিকিৎসা করবেন ডাক্তার সাব—সাধুজী নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছেন। আপনি বরং পরীক্ষা করে দেখলে তাজ্জব হবেন।

সত্যিই অভিজ্ঞ ডাক্তার 'তাজ্জব' হন সাধুর অবস্থা দেখে। দিব্য শ্বাস প্রশ্বাস চলেছে, নাড়ীর গতিও বেশ দ্রুত, কিন্তু সেটা কোনরূপ উত্তেজনা প্রসূত বলে মনে হয় না, জ্বর বা কোন ব্যাধিরও সন্ধান পান না। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন: সাধুজী কি সত্যই শঙ্খবিষ খেয়েছিলেন ?

জংলীবাবা তর্ক না করে সাধুর ঝুলি থেকে বিষপাথরটি বা'র করে ডাক্তারকে দেখালেন; বললেন: এরই কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে—সাহেবের কথায় তখনি গিলে ফেলেন। তারপরই এই অবস্থা।

ডাক্তার বিষপাথরটি অতি সন্তর্পণে পরীক্ষা করে শিউরে উঠলেন—তীব্র শক্তিসম্পন্ন হলাহল। আঘ্রাণেই বিষের ক্রিয়া অনুভূত হবার কথা। এই বিষম বিষ সেবন করে সাধু এখনও জীবিত আছেন। অথচ, এখন তাঁর নাড়ী দেখে কিছুতেই উপলব্ধি হয় না যে, কোনরূপ বিষ বা উগ্র মাদক দ্রব্য তিনি সেবন করেছেন চার পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে।

সহসা সোৎসাহে জংলীবাবা বললেন: সাধুজীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিনি তাড়াতাড়ি এক লোটা জল বালানন্দের সামনে রেখে বললেন: মহারাজ, পানি এনেছি; আচমন করে পবিত্র হোন।

সত্যই বালানন্দ যেন গাঢ় নিদ্রা থেকে সদ্য জাগ্রত হয়েছেন। এতক্ষণ একই ভাবে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন; এখন ধড়মড় করে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বিহ্বলভাবে চারদিকে চেয়ে বললেন: মা-জী চলে গেছেন তাহলে। এতক্ষণ আমাকে কোলে করে বসেছিলেন, আমাকে তাঁর সিদ্ধ মরিচ খেতে দেন। তিনিই ত বললেন—ভয় নেই।

আর কোন কিছু না বলে লোটা থেকে জল নিয়ে মুখ ধুতে লাগলেন। সনক নামে সাধুটি বললেন: তোমার মা-জী সাহেবকেও রেহাই দেননি। তাঁর ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হন। সাহেব তখন সদর থেকে ডাক্তার আনান। তারপর তিনি কি ভেবে তোমার চিকিৎসার জন্য তাঁকে

পাঠিয়েছেন—ইনিই ডাক্তার সাহেব। মাতাজীর কৃপায় তুমি সেরে উঠলে, কিন্তু সাহেবের ছেলের জ্ঞান এখনো হয় নি—হয়ত' হবে না।

বালানন্দের মুখখানি এখন আনন্দে যেন ঝলমল করছে। সেই মুখ থেকে স্নিগ্ধ বাণী নির্গত হলো: মা-জী যখন বলে গেলেন—ভয় নেই, তখন সাহেবের ছেলেও জ্ঞান হারিয়ে থাকতে পারে না, আমারই মত চাঙ্গা হয়ে উঠবেই। মায়ী যে জানে, নিজের ভালো নিয়েই চুপ করে থাকবার মত ছেলে আমি নই।

বালানন্দের ঝুলিটি একটু তফাতে ছিল; সেটি কাছে আনবার জন্য জংলীকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর সেই ঝুলির মধ্যে হাতখানা ঢুকিয়ে একটি ছোট পাথরের ডিপা বার করলেন। সেটি ভস্মে পূর্ণ ছিল। গাছের একটি ঝরা পাতায় সেই ভস্ম খানিকটা রাখলেন, তারপর একটি মোড়ক বেঁধে ডাক্তারকে দিয়ে বললেন: যদি দৈবের প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহলে এই ভস্ম রোগীর গায়ে মাখিয়ে দিতে বলবেন সাহেবকে। তাঁর ছেলে সুস্থ হবে।

ডাক্তার শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধুদত্ত মোড়ক গ্রহণ করে বললেন: আমার ধারণা মহারাজজী, যে ডাক্তার দৈবকে, অর্থাৎ ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তার চিকিৎসা-শক্তির উপরও বিশ্বাস থাকতে পারে না। আমি আজ এখানে দৈবের যে অপূর্ব লীলা দেখেছি, তাতে বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে; তাই আমি ভরসা করছি, এরপর কমিশনার সাহেবেরও চৈতন্য হবে। সাধুসন্তদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগবে। যেহেতু, আমি বিশ্বাস করি,- সাধুজীর এই ভস্মের শক্তি ব্যর্থ হবে না।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজকে সঙ্গে করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

তিন

সাধুদত্ত ভস্ম কমিশনার সাহেবের সংজ্ঞাহীন পুত্রের অঙ্গে লেপন করবার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চৈতন্যোদয় হওয়ায় শিবিরের সেই আতঙ্ককর পরিবেশের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আনন্দের রোল উঠে ঘরে বাইরে সকলকেই চমৎকৃত করল। গিনির একটা থলি নিয়ে সাহেব বেরিয়ে পড়লেন সাধুকে বখশিস্ দেবার উদ্দেশ্যে। খানিক আগে যাঁকে সিঁদেল চোর ভেবে চাবুক হাতে করে সায়েস্তা করবার মতলবে ধেয়ে এসেছিলেন, তাঁরই অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ

হয়ে অর্থদানে তুষ্ট করবার জন্য সাহেবের কি আগ্রহ। এখন সেই সাধারণ মানুষটি সাহেবের দৃষ্টিতে অনন্য-সাধারণ অতিমানুষ। এই শ্রেণীর মানুষরাই জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন—এই ধারণাই সাহেবের মনে এখন দৃঢ় হয়েছে।

সেই প্রকাণ্ড গাছটির পীঠে পীঠ রেখে বালানন্দজী একইভাবে বসে আছেন। খানিক দূরে উদাসী সাধুদ্বয় কোন রকমে শয়নের ব্যবস্থা করে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাহেবের সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে আরও অনেকেই এসেছেন—সাধু দর্শনে ধন্য হতে।

সাধুর সেই একই ভাব। জনসমাগমেও চিত্তচাঞ্চল্যের কোন আভাষ পাওয়া গেল না। সাহেবও স্থিরভাবে নিষ্পলক নয়নে সাধুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সাধুদের যোগ' ও 'ধ্যানে'র কথা সাহেব শুনেছেন, গ্রন্থেও পড়েছেন। কিন্তু এসব আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কোনদিনই তাঁর আস্থা ছিল না। এখন এই সাধুর সামনে নীরবে একইভাবে এতক্ষণ, দাঁড়িয়ে থেকে সাহেবের মনে হলো, হয়ত সেই যোগ বা ধ্যানে সাধুজী মগ্ন হয়েছেন, কিম্বা এমনও হোতে পারে, সেই বিষ-পাথরের ক্রিয়ায় তিনি আচ্ছন্ন। যাই হোক, পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সাহেব পুনরায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করতে লাগলেন : সাধুজী। সাধুজী। সাধুজী।

তৃতীয় ডাকের পর সাধুর মুদিত চক্ষু দুটি উন্মীলিত হলো; সেই সঙ্গে সাহেবের শান্ত মূর্তিও তাঁর চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল। বনের মধ্যে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেও, তিনি এখন আশ্রমী। আশ্রমে অতিথির সমাগমে প্রফুল্লমুখে হাত তুলে ইঙ্গিতে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। কিন্তু সাহেবের বসবার যোগ্য আসন না থাকায় আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে পারলেন না। শেষে সহাস্যে মৃদুস্বরে বললেন : স্বাগতম্‌! আইয়ে—

সাহেবও ললাটের দিকে তাঁর লম্বা লম্বা দু'খানি সংযুক্ত হাত তুলে অভিবাদন করলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন : সাধুজীর দাওয়াই আমার ছেলেকে সুস্থ করেছে।

সাধু বললে : আমি জানতাম, তোমার ছেলে সুস্থ হবে। যে মঙ্গলময়ী মায়ী আমার দেহ থেকে সমস্ত বিষ ঝেড়ে দিয়েছেন, তিনিই তোমার ছেলেকে সুস্থ করে দিয়েছেন। মায়ীদের ত এই কাজ।

সাধুর কথাগুলি সাহেব বুঝতে পারলেন না, সাধুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তখন বালানন্দ বললেন: এ সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন। তবে এইটুকু জেনে রাখো, সত্যকে আশ্রয় করলে কোন ভয় থাকে না, অমঙ্গল আসে না, সত্যের সঙ্গেই ভগবান থাকেন। তোমার ছেলের হৃদয়ে সত্য আছে, তাই ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন।

সাঁচ বরাবর তপ্ নহী হৈ, ঝুট বরাবর পাপ।
জবকো হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকে হিরদৈ, আপ॥

ছড়াটি বলেই সাধুজী তার অর্থটি সোজা করে বুঝিয়ে দিলেন—সত্যের মতন তপস্যা নেই, মিথ্যার পতন পাপ নেই। যার হৃদয়ে সত্য, ভগবান ও তার হৃদয়ে থাকেন।

সকল দেশের সকল মানব, সকল জাতি এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের বোঝবার ও মানবার মত উপদেশ। সাহেব শুনে মুগ্ধ হন।

এই সময় তিনি সেই গিনির থলিটা সাধুর সামনে রেখে বললেন: এই থলিতে গোটাকয়েক মোহর আছে—সাধুজীর সেবায় লাগলে আমি ভারি খুশি হব।

সাহেবের কথায় সাধুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন: তখন আমার ঝোলা উল্‌টে দেখেছিলে, আমার একটি পয়সাও তার মধ্যে পাওনি। এখন এই মোহর নিয়ে আমি কি করব বলতে পার, সাহেব? বনে জঙ্গলে ঘোরাই আমার কর্ম, সেই আমার সাধনা। সেখানে টাকা পয়সার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ঝুলির মধ্যে দুটো লোহার জিনিষ দেখে তুমি আমাকে সিঁদেল চোর ঠাওরেছিলে, এমনি এক থলি গিনি থাকলে কি ভাবতে বলত? তুমি ও থলি তুলে নাও, ওর মধ্যে যা আছে আমার কোন কাজেই লাগবে না।

সাহেব বললেন: আপনাকে ত গাঁজা কিনতে হয় সেইজন্যই আমি এই থলি দিচ্ছি মনে করুন।

বালানন্দ বললেন: ও-বস্তুও আমাদের অমনি মিলে যায়। আর জঙ্গলে ত গাঁজার দোকান নেই—যে কিনব। অল্প দামে ও জিনিষ মেলে, মোহর ভাঙিয়ে কেউ গাঁজা কেনে না।

সাহেব বললেন: সাধুজীকে কিছু দিতে না পারলে আমি কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাব না।

'সাধুজী সহাস্যে বললেন: আমার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়ে থাকে, তাহলে সেই শ্রদ্ধা ঈশ্বরকে দাও; তাঁকে বিশ্বাস কর। আর, এই থলির অর্থ যারা প্রকৃত দুস্থ, তাদের প্রয়োজনে দান করলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সাহেব আর অনুরোধ করতে সাহস পেলেন না। থলিটি সাধুজীর সামনে থেকে তুলে নিলেন। তারপর বললেন: আমিও কালই এখান থেকে শিবির তুলে মহারাজপুরে যাচ্ছি। যদি সেখানে সাধুজীর দেখা পাই, দুস্থদের আপনার কাছে এনে দান খয়রাতের ব্যবস্থা করব।

বালানন্দজী মৃদু হাসলেন; কিছু বললেন না।

পরদিন কমিশনার সাহেব শিবির তুলে স্থানান্তরে যাবেন স্থির হয়েছে। প্রাতরাসের পর তারই আয়োজন চলেছে। এমন সময় তিনি সাধুর খবর নিতে এক বরকন্দাজকে পাঠালেন। সে লোক ফিরে এসে খবর দিল—রাত্রি প্রভাত হবার আগেই সাধুরা চলে গেছেন।

সাহেব একটু বিমর্ষ হলেন। সাধুর সঙ্গে আর একবার দেখা করবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সাধুর উপদেশগুলি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, আরও কিছু শোনবার বাসনা ছিল। ভেবেছিলেন, প্রাতরাশের পর সাধুস্থানে যাবেন। কিন্তু সে আশা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেল।

পর্যটন কালে গৃহী বা সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা সাধুদের রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। এখানে কমিশনার সাহেবের পরবর্তী আচরণে তারই সম্ভাবনার আভাস পেয়ে বালানন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং রাত্রির চতুর্থ প্রহরে তাঁর সঙ্গীদের তাড়া দিয়ে তুলে অমর-কণ্টকের দুর্গম অরণ্য-পথে যাত্রা করেন।

বালানন্দের প্রতি উদাসী সাধুদ্বয়ের এখন আস্থা ও বিশ্বাসের অন্ত নেই। পথে যেতে যেতে জংলী বাবা বললেন: সাধু বাবা, আপনি ত নীলকণ্ঠ হয়েছেন। শুনেছি, বিশ্বনাথজী বিষপান করে বিশ্বসংসার রক্ষা করেছিলেন; আপনিও আমাদের সঙ্কটের সময় বিষ ভোজন করে মুস্কিল আসান করেছেন।

সনকজী বললেন: আপনি যা করেছেন, তা অলৌকিক। এমন করে বিষ খেয়ে হজম করতে কাউকে দেখিনি।

বালানন্দজী শুধু একটি কথা বলেই সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন: ও-ব্যাপারে আমার বাহাদুরী কিছু ছিল না—সবই নর্মদা মায়ীর কৃপা।

কিন্তু নর্মদামায়ীর প্রতি উদাসী সাধুদ্বয়ের আস্থা তেমন গভীর নয় বলেই, তাঁরা শুধু বালানন্দের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। বরাবরই তাঁরা সাধুজীকে একাই দেখেছেন—নর্মদা মায়ী সেখানে কখন তাঁকে কৃপা করতে এসেছিলেন ?

এরপর তাঁরা সাহেবের প্রসঙ্গ তুলে বললেন : সাহেব যখন সকালে জানতে পারবে, আমরা রাতারাতি সরে পড়েছি ; তখন তার মনে কি ভাব হবে সাধুজী ? রাগ করবে, খুশি হবে, না—আমাদের তল্লাশে লোক পাঠাবে ?

বালানন্দ বললেন : আমার মনে হয়, সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ হবেন। সকাল হলেই তিনি আসতেন আমাদের স্থানে। খুব চেষ্টা করতেন, আমরা যাতে সাহেবের কথামত তাঁর সঙ্গে মহারাজপুরের সদরে যেতে সম্মত হই। সাহেবের সে অনুরোধ আমরা রাখতে পারব না বলেই ত রাতারাতি এভাবে জঙ্গলের সদরে চলেছি।

জঙ্গলের সদর শুনে দুই সাধুই হো হো করে হেসে উঠলেন। বালানন্দ বললেন : হাসি নয়, ভোর হলেই দেখবে, আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, কি রকম জবর জঙ্গল সেটি। জনপদের সদর বলতে যেমন সেরা স্থানকে বোঝায়, জঙ্গলের সদর বললে তেমনি জবর রকমের জঙ্গল বুঝতে হবে। পরে দেখলেই চোখে মনে চমক লাগবে।

জংলীবাবা জিজ্ঞাসা করলেন : চমক লাগুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের রসদ মিলবে ত ? যে রসদ কাছে আছে, একখানা করেও রুটি আমাদের ভাগে পড়বে না।

বালানন্দ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন : তোমাদের খালি খাবার চিন্তা। কিন্তু বারবার আমি বলছি, যে মায়ীর নাম নিয়ে পরিক্রমায় বেরিয়েছি, তাঁর ওপর যদি সত্যই বিশ্বাস থাকে, তাঁর কৃপার উপর যদি নির্ভর করিতে পার, তাহলে খাদ্যের জন্য ভাবতে হয় না—তিনিই যুগিয়ে দেন।

জংলীবাবা বললেন : ব্যস্ - এবার তাহলে মায়ীর কৃপার দিকে তাকিয়ে আমরা নিজেরা কোন চেষ্টাই আর করব না।

সকাল হতেই দিনের আলো আস্তে আস্তে সেই নিবিড় বনানী মধ্যে প্রবেশ করতেই তাঁরা বুঝতে পারলেন, অজ্ঞাত পথে নূতন কোন গভীরতম অরণ্যের পাদদেশে তাঁরা এসে পড়েছেন। অদৃষ্টপূর্ব সেই মহারণ্যের

ভীতিপ্রদ নিদর্শন দেখে জংলীবাবা সভয়ে বালানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন : দেখছেন, কি রকম ভীষণ অরণ্যের সামনে এসে পড়েছি। এখন কি করবেন? মহাবনের মধ্যে আমরা সেঁধুবো নাকি?

গম্ভীরমুখে বালানন্দজী বললেন : নিশ্চয়ই। একটু আগে বলছিলে না—মায়ীর উপর নির্ভর করে তাঁর কৃপা পরীক্ষা করবে? সামনে এখন মহাবন দেখে পেছুলে চলবে না ত। মনে কর—নর্মদা মায়ীরই এই খেলা। নির্ভর যখন করেছ, তাঁকে স্মরণ করে এগিয়ে চল—ভয় কি? এমনই ভয়ঙ্কর বনে পরিক্রমা করেই ত আনন্দ—জাননা, ভয়ঙ্করের ভিতরেই মনোরম সৌন্দর্য।

চার

দুর্গম অরণ্যের ভীষণ রূপ দেখে বালানন্দের অন্তর পরমানন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে। হাতের যষ্টির দ্বারা চলার পথের বাধা সরাতে তিনি যেমন এগুতে থাকেন, তাঁর দুই সাথীকেও সাহায্য করেন। কোন কোন স্থানে গাছের শক্ত শাখাটিকে সবলে নত করে নিজে এগিয়ে এসেই সাথীদের আসবার সুবিধার জন্য স্থানটি অতিক্রম না করা পর্যন্ত সেই শাখাটিকে আয়ত্তে রাখেন; তারপর তাকে মুক্তি দিতেই হস্তচ্যুত শাখাটি সশব্দে তার স্থানটি আবার অধিকার করে। এইভাবে বাধার পর বাধা সরিয়ে অনুসরণকারী দুই সাথীকে নিয়ে অগ্রগামী হন—তাঁর উৎসাহ ও বন-পর্যটনের কৌশল দেখে বিস্ময় ও লজ্জায় সাথীরা অভিভূত হয়ে পড়েন। সময় সময় তাঁরা এগিয়ে যাবার জন্য আগ্রহান্বিত হন, কিন্তু বালানন্দ বাধা দিয়ে বলেন : এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, এভাবে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেও শিক্ষার অনেক কিছু আছে; আমি যেভাবে এগিয়ে চলেছি, সেটা লক্ষ্য করে চলতে থাক, এ থেকেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।

এমন গভীর সেই অরণ্য যে, মধ্যাহ্নকাল অতীত হ'লেও পত্রবল্লরীর আচ্ছাদনী ভেদ করে সূর্যালোক প্রবেশের উপায় নেই। একটানা দীর্ঘ পর্যটনেও বালানন্দের দেহ মন ক্লান্তিহীন, কিন্তু দুই সাথী একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন; এখন কিছু আহার্যের ব্যবস্থা না হ'লে তাঁদের পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া কঠিন। তাঁদের সঙ্গে একবারের মত সামান্য পরিমাণ যে খাদ্যদ্রব্য আছে, তাই পাক করে ক্ষুধানল শান্ত করতে চান।

বালানন্দ বললেন : পরিক্রমা সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে। সারাদিন অবিশ্রান্তভাবে পথ চলবে ; তবে যদি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'ও, একটু বিশ্রাম ও জলপান করতে পার। কিন্তু গৃহীর মত পাকের ব্যবস্থা সন্ধ্যার আগে কিছুতেই হতে পারে না। অপরাহ্ণের দিকে এমনভাবে হিসাব করে পথ চলতে হবে—সন্ধ্যার মুখেই যেস্থানে আমরা গিয়ে পৌঁছাব, সেখান থেকে নর্মদামায়ী যত দূরেই থাকুন না কেন—যেন সেই স্থানটির অবস্থিতি ঠিক সামনে বলেই অনুমান করা চলে অর্থাৎ সেখান থেকে সোজা চলতে আরম্ভ করলে নদীতীরে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

বালানন্দের এই আপত্তি শুনে জংলীবাবা সবিনয়ে জানালেন : এর পর আমরা নিয়ম কানুন মেনে চলব, কিন্তু আজ এখানেই যাতে পাকের ব্যবস্থা করতে পারি, সাধুজী সেই রকম কোন ব্যবস্থা দিন কৃপা করে—আমরা একেবারে আতুর হয়ে পড়েছি।

বালানন্দজী সহাস্যে বললেন। তাহলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাই তোমাদের সহায় হোক। শাস্ত্রে আছে—

আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈবচ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

অর্থাৎ—আতুর অবস্থায় নিয়ম নেই, বালক বৃদ্ধদের সম্বন্ধেও এই কথা। এ ছাড়াও যাঁরা কুলাচারের মধ্যে, তাঁদের পক্ষেও নিয়ম না মেনে চলায় দোষ নেই। এ হচ্ছে সনাতন ধর্মের ব্যবস্থা। তোমরা দুজনেই যখন পথশ্রমে কাতর হয়ে পড়ছে, তখন আতুর বলেই ধরা গেল। বেশ, কাছাকাছি কোথাও জল যদি পাও, সেইখানেই ভোজনের ব্যবস্থা কর। আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ধ্যানে বসি।

জংলীবাবা ও সনকজী উভয়েই অনুরোধ করতে লাগলেন, বালানন্দজীও নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁদের সঙ্গে ভোজনে বসেন। কিন্তু বালানন্দ সহাস্যে সে অনুরোধ উপেক্ষা করে বললেন: আতুর হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ভোজন করতাম ; কিন্তু দেখ্‌তেই পাচ্ছ ত, আমার দেহে বা মনে কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে নি। আমার জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না, নিজেদের ভোজনের পর্বটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

একথা বলেই বালানন্দজী ভূমির উপর দক্ষিণ কানটি কিছুক্ষণ রেখেই

সহর্ষে বললেন : কাছেই ঝর্ণা আছে—পাহাড় থেকে জল পড়ছে, তার আভাস পাচ্ছি।

এ-অনুমান যে সত্য, অল্প অন্বেষণেই সেটা জানতে পারা গেল। জঙ্গলের এই অংশে অনুচ্চ একটি পাহাড় চারদিকে গাছপালা ও বন্যলতায় আবৃত হয়েছিল, তারই একটা অংশ ভেদ করে অবিরাম গতিতে জলধারা নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই জলে তাঁরা তৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করলেন এবং তাঁদের সঙ্গে জলের যে পাত্র ছিল, ভরে এনে পাকের আয়োজন করতে লাগলেন। ওদিকে বালানন্দজী দুটি আতুর আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হচ্ছে জেনে প্রসন্ন মনে ধ্যানে বসলেন।

অরণ্যের যে অংশে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন, সে স্থানটি অনেকটা ফাঁকা ; কিছু দূরে বড় বড় কতকগুলি গাছের শাখা-প্রশাখা গায়ে গায়ে মিশে এক শ্রেণীর বড় বড় পাতা বহুল লতায় আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে চন্দ্রাতপের মত নীচের স্থানটিকে এমনভাবে আবৃত করেছে যে, আকাশের আলোও বিকীর্ণ হবার পথে বাধা পাচ্ছে। এজন্য স্থানটি বেশ মনোরম, আহার, বিশ্রাম এবং ধ্যান-ধারণার পক্ষে একান্ত উপযোগী। বালানন্দ একটা গাছের পীঠে পীঠ রেখে ধ্যানে বসলেন। জংলীবাবা ও সনকজী তাঁদের ঝোলা থেকে আটা বা'র করে আহার্য প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

খানিকটা স্থান ফাঁকা হলেও, আশে পাশে জঙ্গল। সেদিকে কিছু শুকনো কাঠ দেখতে পেয়ে জংলীবাবা ইন্ধন দেবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতে গেলেন। গাছটি শুষ্ক অবস্থায় সেখানে পড়েছিল। তার একটা শাখা ধরে টানতেই পরিচিত একটা ভীষণ তর্জন শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ফণা উদ্যত করে উঠল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে জংলীবাবা সসঙ্কে পিছিয়ে এলেন ; সনকজীও চীৎকার করে উঠলেন—মহারাজ, কাল সাপ।

সাপটা তখন ক্রোধে গর্জন করতে করতে দুলছিল। যদি এগিয়ে এসে আক্রমণ করে—পালাবার পথ নেই, চারদিকেই নিবিড় জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ। সাপের দৃষ্টিও যেন তাঁদের দুজনকেই অভিভূত করে ফেলেছে। এত বড় সাপ এই জাতের—এর আগে তারা দেখেন নি ; মনে হতে লাগলো—মৃত্যু করাল মূর্তি ধরে একবারে সামনে উপস্থিত।

আশ্চর্য কাণ্ড। সহসা সাপটা তার সেই ভীষণ ফণা অন্যদিকে ফিরিয়ে

নিজের দেহটাকে কুণ্ডলীবদ্ধ করতে লাগল। পরক্ষণেই একটা নেউলও গর্জন করতে করতে সাপটার মুখোমুখা হয়ে যেন তাকে সংগ্রামে আহ্বান করল। যেমন প্রকাণ্ড সাপ, নেউলটিও তেমনি বৃহদাকৃতি, সচরাচর এত বৃহৎ নেউল দেখা যায় না। নির্বাক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তাঁরা সাপ ও নেউলের অদ্ভুত সংগ্রাম দেখতে লাগলেন। এমন কি, উভয়ের তর্জনের আওয়াজ শুনে বালানন্দজীও এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল - নর্মদামায়ীর কৃপার কথা; তাব ভক্তদেব বিপন্ন অবস্থা জেনেই এই আশ্চর্য লীলা দেখালেন। তিনি এই জাতের সাপগুলোকে চেনেন, শুধু ফণা তুলেই এরা ভয় দেখিয়ে নিরস্ত হবার পাত্র নয়; আততায়ীদের অবস্থা বুঝে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে আসে, দংশন করেই বিষ ঢেলে দেয়। এখন এই নেউলটিই আকস্মিকভাবে এসে এঁদের দুজনকে রক্ষা করল। বালানন্দজী বিমুগ্ধচিত্তে নর্মদামায়ীকে তাঁব এই কৃপাব জন্য আবাব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে প্রণতি জানালেন।

ওদিকে একটি ঘণ্টা ধরে চলল এই প্রচণ্ড সংগ্রাম। একদিকে নকুলের অদ্ভুত কৌশল ও চতুরতা, অন্যদিকে প্রচণ্ড গোখুব সাপেব শক্তি ও বিক্রম—ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে লাগল। হঠাৎ সাপটা তাব সমস্ত দেহ দিয়ে নেউলটিকে আষ্টে পৃষ্টে জড়িযে ফেলল, কিন্তু একটু পবেই বিচিত্র কৌশলে নেউলটি সে সর্প-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কবেই সাপটার উপর প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে সাপটাই ক্রমশ: নির্বীর্য হয়ে পড়ল, আর নেউলটা যেন মবিয়া হয়ে উঠে তাকে বারবার আক্রমণ করতে লাগল। এর ফলে সাপটাকে মৃতকল্প অবস্থায় দেখে বালানন্দজী ঘন ঘন করতালি দিয়ে নেউলটাকে বলতে লাগলেন : সাবাস্। বহুৎ খুব, আবি ভাগো।

নেউলটা একবার ঘাড় তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল—এতক্ষণ তার সমগ্র লক্ষ্য সাপটার উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কি ভেবে উল্লাসে কি বিষাদে কে জানে, নেউলটা বিজয়গর্বে বনের মধ্যে প্রবেশ করল এক অপরূপ চালে।

এতক্ষণে দুই সাধুর উৎসাহ স্ফুরিত হয়ে উঠল। উভয়েই তাঁদের লাঠি নিয়ে মরণাপন্ন সাপটাকে হত্যা করতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বালানন্দজী বাধা দিয়ে বললেন : করছ কি? মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কোন লাভ নেই। প্রথমেই যখন ফণা তুলে উঠেছিল তখন তোমাদের এ

বিক্রম কোথায় ছিল? নর্মদামায়ীর ওপর নির্ভর করেছিলে বলেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেছ। এখন আবার হিংসাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছো? সরে এসো। ওর প্রতি আমাদেরও কর্তব্য আছে।

বলতে বলতে বালানন্দজী তাঁর ধ্যানের আসন থেকে উঠে মুমূর্ষু সাপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে দু' হাতে তুলে ধ'রে ফাঁকা জায়গায় আনলেন। সাপটা তখন লম্বা হয়ে শুয়ে পিটপিট করে তার উদ্ধারকর্ত্তার পানে তাকাচ্ছিল, এ দৃষ্টি শান্ত, সেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি একবার বনের দিকে তাকালেন, তারপর দ্রুত গতিতে একটা গাছ থেকে গোটা কতক পাতা ছিঁড়ে এনে হাতের চাপে তার রস বা'র করে সাপটার আহত স্থান-গুলিতে প্রলেপের মত করে মাখিয়ে দিতে লাগলেন। সাথী সাধু দু'জন অবাক বিস্ময়ে সাধুজীর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

পাঁচ

বালানন্দের পরিচর্য্যায় সুস্থ হোলেও সাপটিকে আর হিংসাচারে প্রবৃত্ত হোতে দেখা গেল না, যতক্ষণ তিনি তাকে আয়ত্তাধীনে রেখেছিলেন, একটিবারও সে ফণা উদ্যত করে নি—বরাবর বিষহীন সাপের মত মাটির উপর মাথাটি নত করে একই ভাবে পড়ে থাকে। স্বামীজীর ইচ্ছা বেচারাকে কিছু খেতে দেন; বললেন: দুধই এর পক্ষে এখন সুপথ্য।

জংলী বাবা বললেন: কাছে যদি লোকালয় থাকত, লোটা নিয়ে গ্রাম থেকে দুধ চেয়ে আনতাম।

সনকজী সহাস্যে বললেন: এক সাধু এসেছেন, তিনি গোখরা সাপ নিয়ে খেলা করেন—তার জন্য দুধ চাই। একথা শুনলে গাঁয়ের লোক সব ছুটে আসত তামাশা দেখতে।

বালানন্দজী বললেন: কাজ নেই বাপু অত হাঙ্গামায়, তার চেয়ে জঙ্গলে চলে যাক।

এরপর তিনি ধীরে ধীরে হাতের তালি দিতেই সাপটি যেন তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেই আস্তে আস্তে অদূরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল।

দুই সাধুকে লক্ষ্য করে বালানন্দ বললেন: তোমাদের ভোজন ব্যাপারে আজ ক্রমাগত বিঘ্ন পড়ছে, দিনও শেষ হয়ে আসছে। এখন আত্মাকে তৃপ্ত

করবার জন্য তদ্বির কর। এ ব্যাপারটি ইচ্ছা করলেই ঠিক মিলে না— বিধাতার ইচ্ছা হোলে তবে জোটে।

ভোজের তদ্বির করতে করতে জংলীবাবা হাসতে হাসতে বললেন: গুরুজী, আপনার নর্মদামায়ীর ইচ্ছাতেই এসব ব্যাঘাত ঘটেছে। আপনি পণ করে বসে আছেন—সন্ধ্যার আগে কিছুতেই ভোজন করবেন না। এখন যে অবস্থা দেখছি, সন্ধ্যার আগে পাকও হয়ে উঠবে না।

দুর্গম অরণ্যপথে পরিক্রমার ফলে সকলেই ক্লান্ত হয়েছিলেন, সেজন্য এই স্থানেই রাত্রিবাস করবেন স্থির থাকে। বালানন্দজী তাঁর অভ্যস্ত কৌশলে নর্মদার অবস্থিতি সম্বন্ধে যে অনুমান করেন, কখনো তা ব্যর্থ হয় না। অপরাহ্ণের দিকে দুই সাধু আহার্য প্রস্তুত করতে তৎপর হলেন। বালানন্দজী উদাত্তকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করে তাঁদের অন্তরে উৎসাহ সঞ্চার করতে লাগলেন।

নিকটে ঝরণা থাকায় তাঁদের রন্ধন ও স্নানাদির বিশেষ সুবিধা হলো। সন্ধ্যার পর মন্ত্র জপ এবং নর্মদা দেবীর অর্চনা করে সাধুরা ভোজনে বসলেন। আয়োজন সামান্য; আটার মোটা মোটা রুটি এবং কিছু ভাজি--পর্যটনের সময় বন থেকেই এঁরা শাক সব্জী সংগ্রহ করেছিলেন। বালানন্দজীকেও ভোজ্যাংশ গ্রহণ করতে হলো, তাঁর আপত্তি এখানে টিকল না।

ভোজন করতে করতেই জংলীবাবা বললেন: আমাদের পুঁজিপাটা সব শেষ হয়ে গেল। এই ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করে লোকালয়ে যেতে না পারলে এক মুঠি আটাও মিলবে না।

বালানন্দ সহাস্যে বললেন: মিলাবার মালিক যিনি তাঁকে জানাও। তাঁর ইচ্ছা হলে এই মহাবনের মধ্যেও তোমাদের ক্ষুধা শান্তির ব্যবস্থা হবে। পরিক্রমায় যখন বেরিয়েছ, মায়ীর ওপর বিশ্বাস রাখ, যেমন করেই হোক তিনি সব সুসার করে দেবেন।

চারদিকে জঙ্গল, মাঝখানে কিছুটা স্থান ফাঁকা—যেখানে এঁদের আসন আস্তৃত হয়েছে। বালানন্দজীর আসনের সামনেই এক ধুনী জ্বলছে। ফাঁকা স্থানটুকুর চার কোণে আরও চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে স্থানটিকে যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করা হয়েছে। তথাপি জংলীবাবা ও সনকজীর আতঙ্কের অন্ত নেই। যদি কোন হিংস্র শ্বাপদ এসে হানা দেয়, কিম্বা তখনকার মত কোন বিষধর সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়ায়।

তাঁদের আতঙ্ক দেখে বালানন্দজী মুখ টিপে হাসেন। ভাবেন, তথাপি এরা ঐশী শক্তির উপর নির্ভর করতে পারছে না! তাঁদের মনে বিশ্বাস দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে বালানন্দ বললেন: একটা গল্প বলি শোন, বানানো নয়, বাস্তব। বছর ছয়েক আগের কথা, সেবার আমার গুরুজীর সঙ্গে পরিক্রমা চলেছে। একটা জঙ্গলের মুখে একদল সাধুর সঙ্গ পাওয়া গেল, তাঁরাও পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক সাধুর আবার আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তাঁর ঝোলার মধ্যে যথেষ্ট আফিম ছিল। কিন্তু বনের পথে একদল ডাকাত তাঁর ঝোলাটি লুঠ করে নিয়ে যায়। এদিকে আফিম অভাবে তাঁর মৃতকল্প অবস্থা—দলের সাধুদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আমার গুরুজীর দয়া হলো সেই আফিমখোর সাধুটির প্রতি। আমাকে বললেন--তুমি ত জোয়ান ছেলে, তোমার কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে দেহের ভারটা চাপিয়ে উনি চলতে থাকুন। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে এগিয়ে গেলাম। আফিম না খেতে পেয়ে তিনি তখন অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁর হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে তখন। আমি একটা হাত টেনে নিয়ে কাঁধে রেখে বললাম—আপনার দেহের সমস্ত ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিন, আমি ভার বহে নিয়ে যেতে পারব। আমার দেখাদেখি আর একজন যুবক সাধু এগিয়ে এসে তাঁর আর একখানা হাত নিজের কাঁধের উপর টেনে নিলেন। সাধু কোন রকমে এগিয়ে যান, ঘন ঘন হাই তোলেন, আর আর্তস্বরে নর্মদা-মায়ীকে ডেকে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে থাকেন। তাঁর সেই আহ্বান শুনে আমিও যেন একটা উপায় পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে কাতরকণ্ঠে ডাকতে লাগলাম নর্মদামায়ীকে মনে মনে। এইভাবে আমরা অনেকখানি পথ এগিয়ে এলাম তাঁকে ঐ ভাবে নিয়ে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সাধু ক্রমশঃই অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। এমনি সময় এক অদ্ভুত ব্যাপারে আমরা সকলে সচকিত হয়ে উঠলাম। আমাদের আগে আগে যাঁরা যাচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আফিম অভাবে ভেঙ্গে পড়া সাধুটিকে দেখছিলেন - হঠাৎ তাঁদের ভিতর থেকে উল্লাসের সুরে একটা কলরব উঠল: আফিম, আফিম! আফিমের নামে আমাদের সঙ্গের মৃতকল্প সাধুটিও যেন উল্লাসে নেচে উঠলেন। পরক্ষণে দেখা গেল, পথে একটা আফিমের কৌটা পাওয়া

গেছে, তার মধ্যে আফিমের যে ডেলাটি রয়েছে দু'ভরির কম নয়। আফিম দেখে সাধুর কি আনন্দ- বুঝি মনের অবসাদ কালাচাঁদ দর্শনেই অনেকটা হ্রাস পেল। তিনি কিন্তু করলেন কি—যে পরিমাণ আফিম খেতেন, আন্দাজ করে সেইটুকু নিয়েই সেবন করলেন, তারপর আর একবারের মত এক ডেলা রেখে বাকি আফিম শুদ্ধ ডিবাটি- যিনি পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাঁর হাতে দিয়ে বললেন- নর্মদামায়ীর দেখা যেখানে পাবে, তুমি এই ডিবাটি তাঁর জলে ফেলে দিও—মায়ের দেওয়া জিনিষ মায়ের কাছেই থাক।

তাঁর কাণ্ড দেখে অনেকে নিষেধ করলেন; বললেন—পথে যখন পাওয়া গেছে, জলে ফেলে দিতে বলছ কেন, এরপর আবার কোথায় পাবে?

সাধু বললেন: ঐ মায়ীই আবার যোগাবে। ওঁর নাম নিয়ে যখন পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি, সব দায় যে ওঁরই। আমার যেটুকু দরকার ছিল, তাই নিয়েছি। বেশী নিলে উনি ভাববেন—লোভী ছেলে।

তাঁর কথামত এর পর নর্মদা তীরে উপস্থিত হবা মাত্রই আফিমের ডিবাটি নর্মদার জলে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর মুখে বা মনে কোনপ্রকার বিকার দেখা যায় নি। রাত্রিটা নর্মদাতীরে কাটিয়ে পরদিন যাত্রাপথে আমরা একটা গঞ্জের কাছাকাছি আসতেই সেই অহিফেনসেবী সাধুর এক ব্যবসায়ী শিষ্য এসে আমাদের পথ রোধ করলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, দলের সমস্ত সাধুদের সম্মানের জন্য এক ভাণ্ডারা দেন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হলো, নর্মদা তীরবর্তী দেবালয়ে তিনি সাধুদের সেবার ব্যবস্থা করবেন। দীর্ঘ বন পর্যটনের পর এভাবে ভক্তের উদ্যোগে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা হওয়ায় পর্যটনকারী দলটি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। সেই সাধুই এক সময় দলের সকলকে একটি বড় ডিবা দেখিয়ে বললেন নর্মদামায়ীর কৃপা দেখ। আমার ঐ শিষ্য এই ডিবার ভিতর এত আফিম দিয়াছেন যে, সম্বৎসরের মধ্যে আর আফিমের জন্য ভাবতে হবে না। নর্মদামায়ীর উপর বিশ্বাস রাখলে কোন ভাবনাই থাকে না।

গল্পটি শেষ করে বালানন্দজী বললেন—আমার জানা ঘটনা এটা, বানানো নয়। আর, আমিও সেই সাধুর মত নর্মদামায়ীর উপর সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিয়ে এই পরিক্রমায় নেমেছি। তাই বলছি, তাঁকে স্মরণ কর—তাঁর কৃপা হোলে কোন বিপদই আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না।

যাই হোক, রাতটা কোন ভাবে কেটে গেল। হিংস্র শ্বাপদের শুভাগমন না হোলেও, তাদের তর্জন গর্জনের ধ্বনির বিরাম ছিল না। নর্মদামায়ীর কৃপা-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বালানন্দজী নিস্তব্ধ হন তাঁর অভ্যাসমত। কিন্তু ঘন ঘন বাঘের হুঙ্কারে জংলীবাবা ও সনকজী উভয়েই শিউরে শিউরে উঠছিলেন সারা রাত, সুনিদ্রা একেবারে হয় নি।

প্রভাতে বালানন্দজী দুজনকেই বললেন: হিংস্র পশুর ভয়ে তোমরা ঘুমাতে পার নি আমি জানি। তোমাদের ভয় ভেঙে দেবার জন্য আমি সেই বাস্তব গল্পটি শুনিয়েছিলাম, কিন্তু তবু তোমরা আশ্বস্ত হতে পারনি। যাই হোক, আরও কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে তোমাদের ভয় ভেঙে যাবে, আর মায়ীর উপর বিশ্বাসও দৃঢ় হবে।

জংলীবাবা বললেন: দেখুন সাধুজী, জঙ্গলে ঘোরাঘুরি আমিও অনেক করেছি, আর অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু এবার আমরা এমন একটা জঙ্গলে সেঁধিয়েছি, যেখানে সুযোগ সুবিধা কিছুই নেই, যে দিকে তাকাই— খালি বন আর বন, যেন এর কূল কিনারা নেই—মহাসাগরের মত অসীম।

বালানন্দ বললেন: এই মহাবন পরিক্রমা করেই ত আনন্দ। এরই মধ্যে তোমরা মহামায়ীর পরম মাহাত্ম্য, তাঁর লীলার রহস্য জানবার সুযোগ পাবে। ভয়ালকে দেখে ভয় না পেয়ে তার কাছে এগিয়ে যাওয়াই ত সাধক জীবনের পরম সংকেত, এতেই ত সার্থকতা সব দিক দিয়ে। এই পথেই আনন্দের পদধ্বনি শোনা যায়। আর যদি তোমাদের মনে আতঙ্ক হয়, সন্দেহ জাগে, আমি তোমাদের সুবিধার জন্য অন্য পথও দেখিয়ে দিতে পারি, যাতে সত্বর লোকালয়ে উপস্থিত হতে পার।

উভয় সাধুই এখন স্ব স্ব চিত্তকে সংযত করে দৃঢ়স্বরে জানালেন: না, না, আমরা আপনার সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করব না—আপনার সঙ্গে এই মহাবনের রহস্য দেখে ধন্য হব।

ছয়

কিন্তু এর পর প্রায় সমস্ত দিনটা সেই বনের আরও অনেকখানি দুর্গমতম অংশ পর্যটন করে তাঁদের মনে এমনি নৈরাশ্যের সঞ্চার হোতে লাগল যে, নূতন রহস্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা তার আবর্তে কোথায় যেন গুলিয়ে গেল।

উভয়ের সঞ্চিত খাদ্য পূর্বদিনেই নিঃশেষ হয়েছিল ; বনপথে যেতে যেতে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েও ভক্ষণযোগ্য কোন প্রকার ফল মূল পাননি—কোন কোন গাছে অপরিচিত কিছু কিছু ফল অপক্ক অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরমাগ্রহে সংগ্রহ করেও শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল। সে-সব ফল এমনি তিক্ত বা কষায় যে, কার সাধ্য সেগুলির রসাস্বাদন করে। অরণ্যের অজ্ঞাত ফল ভক্ষণ করতে বালানন্দজী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেও এঁরা দুজনে ক্ষুধার তাড়নায় তাঁকে গোপন করেই এই শ্রেণীর অখাদ্য ফল সংগ্রহ করে শেষে হতাশ হন।

বালানন্দজী এঁদের অবস্থা দেখে এক সময় বিরক্তির সঙ্গেই বললেন : ভোজনের দিকে তোমাদের যখন এত লালসা শহর থেকে বেশী রকম খাদ্য সঞ্চয় করেই তোমাদের উচিত ছিল বনভ্রমণে আসা। এইজন্যই আমি বলেছিলাম, তোমরা গ্রামের পথ ধরে যাত্রা বদল কর। অন্য পথ ধরলে তোমরা সম্ভবতঃ এতক্ষণে কোন গ্রামের কাছাকাছি যেতে পারতে, সেখানে খাদ্যেরও সন্ধান পাওয়া হয়ত সম্ভব হোত।

জংলীবাবা রুক্ষ দৃষ্টি স্বামীজীর মুখে নিবদ্ধ করে শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার মনে কি কিছুমাত্র খাবার লালসা হয় নি, গুরুজী—ক্ষুধা কি আপনাকে কাতর করে তোলেনি, সত্য বলুন--চাপবেন না।

এরূপ প্রশ্নে রাগ হবার কথা, কিন্তু তেমনি মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন : আমার মুখের পানে চেয়ে দেখলেই তোমার কথার জবাব পাবে। আমাকে কি তোমাদের মত ক্লান্ত এবং আর্ত মনে হচ্ছে ? প্রভাতে যেমন দেখেছিলে, চতুর্থ প্রহরেও আমি কি ঠিক সেই অবস্থায় নেই ? নিজের মুখ নিজে না দেখতে পেলেও আমি ঠিক আছি, তার কারণ—যখন পরিক্রমা করি, আমি শুধু মনে মনে মায়ীকে চিন্তা করি, ক্ষুধার কথা কখনো ভাবি না, তাই সেও প্রশ্রয় পায় না।

সনকজী জিজ্ঞাসা করলেন : কিন্তু আপনি ত বলেন গুরুজী, দিন শেষ হলেই আপনি খাবার পান—কোন দিন আপনাকে অভুক্ত থাকতে হয় না।

স্বামীজী বললেন : হঁ্যা, একথা আমি বলিছি। মায়ীর কাজ আমি যেমন করি, মায়ীও তেমনি তাঁর কাজ করেন। যখন মনে করেন, আমার কিছু খাওয়া উচিত—সারাদিন অভুক্ত আছি, তিনিও তার ব্যবস্থা করে

রাখেন। কিন্তু তোমরা ত মায়ীর ওপর আস্থা রাখতে পারছ না; তার কারণ—তোমাদের মনে বিশ্বাস নেই।

জংলীবাবা বললেন: সকাল থেকে এক ঝোঁকে আমরা এতদূর এসেছি, দু এক জায়গায় ঝরণার জল ছাড়া কিছুই মুখে দিতে পারি নি। আকাশের পানে তাকিয়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে—দিনও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর খানিকটা পথ গেলেই, কোন জায়গায় আস্তানা নিতে হবে রাত কাটাবার জন্য। আপনি কি মনে করেন গুরুজী, আজও মায়ী আপনার জন্যে খাবার যোগাবেন; আর আপনার সঙ্গে থেকেও আমরা সে খাবারের কিছুই পাব না?

সহাস্যে স্বামীজী উত্তর দিলেন: সে মায়ীই জানেন। তবে আমি এটুকুও বলতে পারি—আমরা যেখানে আস্তানা পাতব আর কিছুক্ষণ পরে, সেখানে আমরা কিছু না কিছু পাবই। আর, এও জেনো—এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। আমি যা পাব, একলা পাব না—তোমরাও তার ভাগ পাবে।

জংলীবাবা একথা শুনে বেশ শক্ত হয়ে বলে উঠলেন: কুচ পরোয়া নেই—এর পর গুরুজীর পানে চেয়েই আমরা পরিক্রমা চালাব, ক্ষুধা যখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন আপনাকেই দেখব—মনে মনে আপনার দোহাই দিয়ে ঐ দুষমনটিকে দমন করব।

স্বামীজীর মুখখানি পলকে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বললেন: আমি কে? সংসার ছেড়ে এসেও তোমরা এখনো ভুলের বোঝা বহে বেড়াচ্ছ? পরমাত্মাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না! কত বারই ত বলেছি—মনে যখনই কোন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে বিকার ঘটাতে চাইবে, তখনই মায়ীর শরণ নেবে, তাঁকেই ডাকবে, তিনি সব সঙ্কট মোচন করে দেবেন।

দুই শিষ্যই ঘাড় নেড়ে স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানালেন। এর পর পুনরায় নূতন উদ্যমে চলল তাঁদের বনপরিক্রমা। স্বামীজীই আগে আগে চলেছেন, চলার পথে গাছের শাখা প্রশাখা, বা লতার বেষ্টনি যষ্টির সাহায্যে তিনিই অপসারিত করে এগিয়ে চলেন, সারাদিনের ক্লান্তি এবং ক্ষুধাজনিত অবসাদ শিষ্যদুটিকে আচ্ছন্ন করায় তাঁরা কোনরকমে গুরুজীকে অনুসরণ করছিলেন মাত্র, অগ্রগামী হোয়ে জঙ্গলভাঙ্গার উৎসাহ তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

নিবিড় বনের মধ্যে দিনের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে দেখেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় অজ্ঞাত বনপথে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত কিনা দুই শিষ্য এই প্রশ্ন তুললেন। তাঁদের মতে জঙ্গলের যে অংশে তাঁরা এসে পড়েছেন, এখানে রাত্রিবাস কোন দিক দিয়েই সুবিধাজনক নয়।

স্বামীজী এতক্ষণ নীরবে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠল ; তখনই সহাস্যে বললেন : আমি কিন্তু এই জায়গাটিকেই নিরাপদ স্থান মনে করছি, এখানেই আস্তানা পেতে রাত্রিবাস করা যাবে। শুধু তাই নয়, জায়গাটি সাধন ভজনের উপযুক্ত মনে হোচ্ছে, এখানে আরো দুটো দিন থাকাও চলতে পারে।

দুই শিষ্য অবাক হোয়ে স্বামীজীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন ; উভয়েরই মনোমত প্রশ্ন—স্বামীজী এ কি বলছেন। যে-জায়গায় তাঁরা এসে পড়েছেন, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাবার জন্য তাঁরা হয়েছেন ব্যস্ত, আর স্বামীজী বলছেন, এই জায়গাটাই থাকবার পক্ষে প্রশস্ত।

এঁদের মনোভাব বুঝে স্বামীজী বললেন : তোমরা লক্ষ্য করনি, কাছেই ঝরণা আছে। আমি তার আভাস পেয়েছি। তাহলে এ জায়গাটা পাহাড়ের অংশ। আমরা অনেকদূর থেকে চড়াই ভেঙে উঠেছি, তাই বুঝতে পার নি। তারপর, পাকা ডুমুরের গন্ধ পেয়েছি—নিশ্চয়ই এখানে যজ্ঞ ডুমুরের গাছ আছে। তাহলে তোমাদের খাবারও সংস্থান হবে।

জংলীবাবা বললেন : কিন্তু এতখানি পথের কোথাও ডুমুরগাছ আমরা দেখিনি। পাকা ডুমুর যদি পাওয়া যায় খুব ভাল কথা, কিন্তু রুটির সঙ্গেই ও জিনিষটা খাপ খায়। মনে হয় যেন অমৃত।

মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন : পেটের চিন্তাতেই তুমি অস্থির, খাবার তদবিরও খুব জান। যাক্, চল আমরা সামনে আর না গিয়ে ডানদিকের ঐ বাঁকটা ঘুরে দেখি, ও পাশের জায়গাটা কেমন—খুব সম্ভব, ঐ দিকে কোথাও ঝরণা আছে।

কথা বলতে বলতেই স্বামীজী সেখান থেকে ডানদিক ধরে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে তিনজনেই বুঝলেন, জঙ্গলের এ দিকটা অনেকখানি নীচু—খানিকটা গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাতেই জানা গেল, তাঁরা বরাবর উঁচু

পথেই উঠে এসেছেন—এ জায়গাটা পার্বত্য অঞ্চলই বটে। আরও কিছুক্ষণ পরে তাঁরা জঙ্গলাকীর্ণ বাঁকটি অতিক্রম করতেই সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁরা দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় এসে পড়েছেন। ডানদিকের পাহাড়টি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ, কিন্তু বামদিকের পাহাড়টি ঠিক একটা বড় টিলার মত। এরই একটা অংশ দিয়ে ঝরণার জল অবিশ্রান্ত গতিতে একটা সুশ্রাব্য শব্দ তুলে নির্গত হোচ্ছে এবং ঝরণার মুখ থেকে একটা প্রণালী বা নালার ভিতর দিয়ে সেই জলধারা পাহাড়টির পাশ দিয়ে এমন ভাবে বয়ে চলেছে, যেন অপচয় না করে যথাস্থানে সঞ্চিত হচ্ছে।

স্বামীজী বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললেন: এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে জনসমাগম হয়ে থাকে; নিকটে বা দূরে লোকের বসতি আছে। ঝরণার জল তাদের চেষ্টাতেই এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখন আমরা টিলাটির উপর উঠে আস্তানা পাতব। মনে হচ্ছে—ওখানেই ডুমুরগাছ আছে।

শিষ্যদ্বয় উৎফুল্ল হয়ে বললেন: গুরুজীর অদ্ভুত অনুমান শক্তি। এমন স্থান থাকতে আমরা ভেবে অস্থির হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি সামনে এগিয়ে গেলে জঙ্গলের শেষ আর পেতাম না। এ জায়গাটা দেখে মনে আশার সঞ্চার হোচ্ছে।

স্বামীজী বললেন: উপরে উঠলে তখন আর নামতে ইচ্ছা করবে না। ওখান থেকে তাকালেই বুঝতে পারবে, আমরা নিজেদের অজ্ঞাতে কত উঁচু চড়ায়ে উঠেছি।

তিনজনেই সাবধানে উপরে উঠতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই টিলার আকৃতি পাহাড়টির উপরে উঠে মনোরম স্থানটি দেখে তাঁদের সকল কষ্টের যেন অবসান হলো। চারদিকের পরিবেশ দেখে স্বামীজী বললেন: মায়ী ঠিক জায়গাতেই আমাদের এনেছেন। যথেষ্ট শুকনো কাঠও দেখা যাচ্ছে, ধুনি জ্বালবার পক্ষে এগুলো খুব উপযোগী। ঐ দেখ—যজ্ঞডুমুর গাছও অনেক রয়েছে, পাকাফলও পাবে। এসো, এখানেই আমাদের আস্তানা পাতা যাক।

বড় একটা গাছের ঠিক কাণ্ডটির নীচে স্বামীজী তার আসন পেতে বসলেন। দুই শিষ্যও কাছাকাছি আর দুটি গাছের তলায় নিজেদের স্থান করে নিলেন। সঙ্গের সামান্য বস্ত্রাদি গাছের ডালে ডালে লতার আনলা বেঁধে তার উপরে ছড়িয়ে দিলেন। স্থানটি এখন তাবুর মত দর্শনীয় হয়ে উঠল। উপর থেকে

তখনও পর্য্যন্ত দিনের আলো নিশ্চিন্ত হয় নাই— তখনও পর্য্যন্ত দিনের দেবতা পশ্চিমাকাশে নামতে নামতেও তার রক্তিম কিরণ ছড়াচ্ছিলেন।

জংলীবাবা ও শনকজী ডুমুরের সন্ধান করতে লাগলেন। গাছের উঁচু বড় বড় পরিপুষ্ট ডুমুর গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলছিল, তবে এখনও পাক ধরে নি, কোন কোন গাছে দু' চারটি পক্ক ডুমুরও দেখা গেল। সেগুলি সংগ্রহ করতে তারা ব্যস্ত হয়েছেন, এবং এদিকে প্রকাণ্ড গাছটির তলায় বসে স্বামীজী ঝুলি থেকে চকমকি পাথর বের করে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালছেন, এমন সময় সমগ্র বনভুমি প্রকম্পিত করে ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ উঠল। জংলীবাবা লোষ্ট্র তুলেছিলেন পরিপক্ক এক থোলো যজ্ঞডুমুরের উদ্দেশে, শনকজীও একখণ্ড কাষ্ঠ উঁচিয়েছেন এই একই উদ্দেশ্যে, অমনি এই ভীষণ কাণ্ড। উভয়েই স্ব স্ব প্রহরণ ত্যাগ করে স্বামীজীর দোহাই দিয়ে তাঁর পাশে এসে বসে পড়লেন; আতঙ্কে তাঁদের চক্ষুগুলি তখন কপালের দিকে উঠে গেছে। স্বামীজী কিন্তু নির্বিকার তিনি তখন ধুনীর কাষ্ঠে ঘর্ষিত চকমকির বহ্নি সংযোগ করেছেন, ধুনার শুষ্ক ইন্ধন অগ্নি পুষ্ট হয়ে জ্বলে উঠেছে। সেই অবস্থায় ভয়ার্ত দুই শিষ্যের পানে একটিবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েই নীরবে তিনি চিত্তকে ধ্যানে নিবিষ্ট করলেন।

ঠিক এই সময় আবার সেই ভীষণ আওয়াজ উঠল। অধিকন্তু, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক নিঃসৃত গুলি তাঁদের আস্তানার উপর পড়তে লাগল। স্বামীজী নিজেই স্বহস্তে স্বল্প ব্যবধানে মুখোমুখী দুটো ডালে লতার ধরণী তৈরী করে তার উপর কৌপীন ও গায়ের মোটা চাদরখানা শুকাবার জন্য মেলে দিয়েছিলেন, কর্ণবিদারী শব্দের সঙ্গে বন্দুকের গুলি সেই চাদর ও কৌপীন ভেদ করে গাছটি গায়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল। এবার দুই শিষ্য প্রাণভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। জংলীবাবার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীব্র, তিনি সেই স্বরে ঝঙ্কার তুললেন: য়িহ কৌন্ গোলী ছোড়রহা হ্যায়- য়িহ সন্ত্ মহারাজজীকি ডেরা, রোখো—শনকজীও তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন।

একটু পরেই গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল—একটিও গুলি এর পর আর নিক্ষিপ্ত হলো না। খানিকক্ষণ পরে ঢালু পথে একসঙ্গে বহুলোকের পদশব্দ শুনতে পাওয়া গেল—সেই সঙ্গে ভারী জুতার মস্ মস্ শব্দ, বহু

কণ্ঠের মিশ্রধ্বনি, অস্ত্রের ঝনাৎকার—সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি সেই নিস্তব্ধ স্থানটির শান্তিভঙ্গ করল।

ব্যাপারটি জানবার জন্য জংলীবাবাবা এগিয়ে চলেছেন, এমন সময় উষ্ণীষ ও উজ্জ্বল রাজ পরিচ্ছদধারী এক যুবক পারিষদবর্গ এবং দেহরক্ষী সৈনিকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হোলেন। প্রথমেই স্বামীজীর উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো; দেখলেন ঋষিকল্প এক সাধুপুরুষ বৃহৎ একটি শিশুবৃক্ষের তলদেশে তাঁর আসনে ধ্যানমগ্ন, সামনেই ধুনির অগ্নি প্রজ্বলিত। গাছটির গায়ে এবং সাধুর ব্যবহার্য কৌপীন ও উত্তরীয় বসনগুলিতে নিক্ষিপ্ত গুলির চিহ্ন রয়েছে। সাধুর দুই শিষ্য বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলেন—এঁরাই গুলিবর্ষণে চীৎকার তুলেছিলেন। তখন তিনি পাদুকা ত্যাগ করে স্বামীজীর আসন সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর উষ্ণীষমণ্ডিত শির সেখানে নত করে শ্রদ্ধা জানালেন। স্বামীজী তখনও সমাধিমগ্ন! গুলিবর্ষণের সময় তিনি মাতৃচরণে আত্মনিবেদন করে সেই যে ধ্যানমগ্ন হন, ক্রমে তা সমাধিতে পরিণত হয়। জংলীবাবা এই সময় মহাউল্লাসে উচ্চকণ্ঠে 'জয় নর্মদামায়ী' ধ্বনির সঙ্গে 'গুরু মহারাজজী!' বলে সম্বোধন করতেই তার সমাধি ভঙ্গ হলো। সামনেই রাজ পরিচ্ছদধারী যুবাকে তাঁর পদতলে নতজানু অবস্থায় উপবিষ্ট দেখে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারে অভ্যর্থনা করলেন, ঝুলির ভিতর থেকে একখণ্ড হরিণ-চর্ম্ম বিছিয়ে দিয়ে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

আগন্তুক ভেবেছিলেন, তাঁর অশিষ্টাচারে সাধুজী হয়ত রূঢ়ভাবে তিরস্কার করবেন, অভিশাপ দেবেন, কিন্তু এখন শিশুর মত তাঁর সরল ব্যবহার দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। স্বামীজীই হাসতে হাসতে বললেন: চারদিক থেকে গুলি ছুটছে দেখে আমার দুই সাথী যখন হতচকিত হয়ে পড়ে, আমি তখন মনে মনে পরমাত্মার শরণ নিই—তিনিই আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন।

তখন প্রকাশ পেল যে, আগন্তুক নরসিংহগড় রাজ্যের রাজা। মধ্য-প্রদেশে ভুপালের পার্শ্বেই নারায়ণগড় নামে সমৃদ্ধ রাজ্যটির রাজধানী হচ্ছে নরসিংহগড়। রাজা সেদিন দলবল নিয়ে এই পার্বত্য জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। এস্থানটি দুর্গম, মানুষের গতিবিধি নেই, তাঁদের মনে এই ধারণাই ছিল। সেই জন্যেই তাঁরা পাখীর ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন, কিন্তু

সাধু মহারাজ যে এখানে আসন পেতেছেন তা'ত জানা ছিল না, তাই বিভ্রান্তি ঘটে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁরা কি সাংঘাতিক কাজ করেছিলেন। তাঁদেরই শুভাদৃষ্ট বশতঃ সাধু মহারাজের পরমাত্মাই সব দিক রক্ষা করেছেন।

সব শুনে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে এমন মিষ্ট ব্যবহার করলেন, যেন কিছুই হয় নি। রাজা অনুতপ্ত ভাবে যতই ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে এমন মিষ্ট বাক্যে আপ্যায়ন করতে থাকেন—যেন কিছুই হয় নি; 'সবই পরমাত্মার ইচ্ছা, তোমার মঙ্গল হোক, সমান দৃষ্টিতে সবাইকে দেখবার তোমাকে শক্তি দিন পরমাত্মা।' এইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেই ঐশ্বর্যশালী রাজাকেও চমৎকৃত করে দিলেন। তিনি তখন সাগ্রহে অনুরোধ করতে লাগলেন: অধীনের রাজধানী এখান থেকে বেশী দুরে নয়, সাধু মহারাজ যদি অনুমতি করেন তাহলে হাতী পাঠিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে প্রভুকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে ধন্য হই।

কিন্তু তেমনি মৃদু হেসে স্বামীজী রাজাকে জানালেন: আপনার এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে এখন সম্ভব হবে না, কারণ, আমরা সঙ্কল্প করে নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়েছি। গৃহীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করবার সামর্থ্য আমাদের নেই;' এর জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। এখান থেকেই আমি আপনার পরিজনবর্গকে আশীর্ব্বাদ করছি, তাঁদের কল্যাণ হোক।

এরপর রাজা সকাতরে অনুরোধ করলেন: মহারাজজী আমাদের সঙ্গে যে সব খাদ্য বস্তু এসেছিল, তার মধ্যে কিছু অংশ শুদ্ধভাবেই রাখা আছে। দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে, সেই ভেবেই আনা হয়েছিল; কিন্তু পথে আমরা কোথাও দেবস্থান পাইনি। সাধু মহারাজকে দর্শন করে আমরা ধন্য হয়েছি, মনে হচ্ছে আমরা দেবদর্শন করেছি। এখন এই উপচারগুলি দেবসেবায় লাগলে এ দাস কৃতার্থ হবে, দয়া করে এই অনুমতি করুন।

স্বামীজীর পক্ষে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হলো না। তাঁর সম্মতি পেয়েই রাজাজ্ঞায় শিবির থেকে বেদানা, আপেল, আঙ্গুর, খর্জ্জুর, কিসমিস, বাদাম, পেস্তা,' প্রভৃতি প্রচুর দুষ্প্রাপ্য ফল, রাজভোগ্য মেওয়া, জীনের ব্যাগে বাঁধা আটা ও চিনি প্রভৃতি প্রকাণ্ড একটা টুকরিতে বোঝাই করে রাজভৃত্যগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানে রেখে, স্বামীজীকে প্রণাম করে চলে গেল।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীজী শিষ্যদের দিকে তাকালেন। জংলীবাবা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: নর্মদামায়ী কি জয়—তাঁর কৃপায় আমাদের দুর্ভোগ কেটে গেল। এখন বুঝছি, গুরুমহারাজজী খাঁটি কথা বলেছিলেন—

সনকজী সোল্লাসে ও সহাস্যে বললেন:

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।'

সাত

জংলীবাবা ও শনকজীব অন্তরে আর আনন্দ ধরে না—সেই সঙ্গে বিস্ময়-ভাবটাও মাত্রা ছাপিয়ে পড়ে। উভয়েই বিস্ময়োল্লাসে বার বার বলতে থাকেন—কি আশ্চর্য, জঙ্গলের মধ্যেও পরমাত্মাজী ভোজনের ব্যবস্থা করে পাঠালেন। তাও কি যেমন তেমন মামুলী কিছু—রাজভোগের যোগ্য সব কিছু।

উল্লাসের সঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে বালানন্দজীর উদ্দেশেও নানাভাবে প্রশস্তি চলে। পরমাত্মাজী যেন স্বামী মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন, সময় হলেই প্রয়োজনমত সামগ্রীপত্র যোগান দেন। কি তাজ্জবেব কথা।

মৃদু হেসে বালানন্দজী বললেন: তাজ্জব নয়, গীতায় শ্রীভগবানের বাণী মনে কর - তিনিই বলেছেন:

'এবং সতত যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং'

এ থেকেই বুঝতে হবে - আমরা সতত তাঁতে যুক্ত হয়ে আছি। এটা বুঝতে পারলে, মনে বিশ্বাস থাকলে, আপদ বিপদে অধীর হতে হয় না।

সেই সন্ধ্যায় সাধুরা রীতিমত ভোগের ব্যবস্থা কবলেন। উপাদেয় গব্যঘৃতযুক্ত রুটি-পুরি, ভাজি, নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন—বহুদিন পরে জনহীন জঙ্গল মধ্যে রাজভোগের আয়োজন। ধুনীর সামনে বসে বালানন্দজী এক একবার অপাঙ্গে দুই শিষ্যের দিকে চেয়ে তাদের সেই কর্মব্যস্ত অবস্থা, আনন্দময় ভঙ্গি লক্ষ্য করেন, সেই সঙ্গে নিজেও পরিতৃপ্ত হন।

কিন্তু এত যত্নে ভোজের বিপুল ব্যবস্থা করেও তারা স্বামীজীকে পূর্ণ-ভোজনে সম্মত করতে সমর্থ হলেন না। তাঁরা যতই অনুরোধ করেন, তিনি মৃদু হেসে প্রসন্নভাবেই বলেন: তোমরা দুজনে ভালভাবে ভোজন করে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করবে বলেই আমি এ পর্যন্ত কোন কথা বলিনি। তোমরা

ত জান, যেদিন জোটে একখানি রুটি আর সামান্য কিছু উপচার হলেই আমার পরম তৃপ্তি। আজও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

শেষে তাদের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে অক্ষম হয়ে, ঘৃতপক্ক দুখানি রুটি এবং কিছু কিছু ফল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্গে বললেন: তোমরা দুজনে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন কর, আমি তাই দেখি; আর এতেই আমার পূর্ণতৃপ্তি।

স্বামীজীর ভোজনের পর তাঁরা দুজনে পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন করলেন। আচমনের পর স্বামীজী স্বয়ং তাদের কাছে এসে বসলেন স্বহস্তে সাহায্য করবার জন্য, যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়।

শিষ্যদের আনন্দে আনন্দময় গুরুজীর সমগ্র চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল—মনে মনে তিনি পরমাত্মাজীকে স্মরণ করে তাঁর অপার করুণায় অভিভূত হলেন।

প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্যাদির পর জংলীবাবা বালানন্দজীকে প্রাত্যহিক বন্দনার পর নিবেদন করলেন: যদি মহারাজজীর মর্জি হয়, এই আস্তানাটি না ছেড়ে দু' চারদিন এখানেই আমরা থাকি। জায়গাটি খাসা, এখান থেকে প্রকৃতিমায়ীর শোভাও উপভোগ করা যায়, কাছেই ঝর্ণা—জলকষ্টের ভয় নেই, তারপর আমাদের এই আস্তানাটি যেন কেল্লার মত, কাল ত দেখা গেল—বন্দুকের গুলীও কার গায়ে বিঁধল না। তাই এখানে আরও কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা প্রবল হচ্ছে।

বালানন্দজী সহাস্যে বললেন: আসল কারণ হচ্ছে—রাজবাড়ীর সিধা। কাল রাতের রাজভোগেও ফুরায় নি, এখনো অনেক মাল মজুত আছে—সেইজন্যই জায়গার উপর মায়া পড়েছে—এই ত?

স্বামীজী জোরে হেসে উঠলেন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। স্থানটিও গমগম করে উঠল হাসির রোলে। ঈষৎ লজ্জিত হয়ে জংলীবাবা হাত দু'খানি কচলাতে কচলাতে বললেন: গুরুজী ঠিকই ধরেছেন। বনে বনে ভ্রমণ ত বহুদিন ধরেই চলেছে, কিন্তু এভাবে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে রাজভোগ আসা, তারপর পেটভরে খেয়েও মালপত্র নিঃশেষ না হওয়ায় সঞ্চয় করে রাখা—এর আগে কখনো এ নসীবে দেখিনি। সেইজন্যেই এখন মায়া পড়েছে। তবে একথাও বলি গুরুজী, মায়া পড়েছে ঐ খাদ্যগুলির উপর—

স্থানটা অবিশ্যি উপলক্ষ মাত্র। স্বামীজী বললেন: স্থানটিই কিন্তু আমার ভাল লেগেছে। এখান থেকে দূরের চারদিকের অনেক দৃশ্য দেখা যায়। ঝরণার ঝিরঝির আওয়াজটিও ভারি মিঠে লাগে। কিন্তু একটা আশঙ্কাও মনে জাগছে।

"সে কি গুরুজী—কিসের আশঙ্কা?" বলতে বলতে সনকজীও এগিয়ে এসে বালানন্দকে বন্দনা করে নিকটেই বসলেন। গুরুর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস এখন এমনি দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, তাঁর মুখের কথা বৃথা হবে না, এ সত্য তাঁদের এখন মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। তাই আশঙ্কার কথা শুনে উভয়েই শঙ্কিত দৃষ্টিতে গুরুর দিকে চেয়ে রইলেন।

বালানন্দজী স্মিতমুখে বললেন: আশঙ্কাও অনেক দিক দিয়ে অনেক রকমেই আসে; প্রত্যেকটিই সে কালকের মত বন্দুকের গুলী ছুঁড়ে জানায় সে এসেছে—তা নয়। আমি যে আশঙ্কার কথা ভাবছি, আমার পক্ষে ভারি রকমের হলেও, তোমাদের দিক দিয়ে 'শাপে বরের' মতনও হতে পারে।

দুই শিষ্যের মুখেই কৌতূহলের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এর পর কোন প্রশ্ন না করেই উভয়ে স্বামীজীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বালানন্দজী বললেন: আমার আশঙ্কাটির কথা তাহলে বলি শোন। কাল তো নরসিংগড়ের রাজাকে দেখলে। চেহারা আর মেজাজ দুটোই রাজার মত। কালকের ব্যাপারটা চাপা নেই—রাজধানীতে গিয়েই রাজাসাহেব ব্যাপারটাকে ফলাও করে নিশ্চয় বলেছেন। রাজপুরীতেও ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। তাঁরা অবাক হয়ে শুনছেন—ওভাবে গুলী বর্ষণের পরও সাধুজী বহাল তবিয়তে বেঁচে গেছেন। তাহলে সেই সাধু সামান্য লোক নন—হয়ত বন্দুকের গুলীগুলো গিলেই ফেলেছেন। এখন মুস্কিল বাধছে, সাধুর কথা শুনে রাজবাড়ীর ভক্তিমতী মায়ীরা যদি সাধুদর্শনে এসে পড়েন, তখন আমরা কি করে সামলাব, কোথায় বসাব, কিভাবে রাজঅতিথিদের সৎকার করব—এইগুলোই হচ্ছে ভাবনার কথা, আর—এইটিই হচ্ছে আমার আশঙ্কা।

সনকজী বললেন: ওখানকার রাজা এলে আমরা যেভাবে অভ্যর্থনা করেছিলাম, ওখান থেকে রাজপরিজনেরা এলেও তেমনি খাতির করব।

জংলীবাবা বললেন: বড় বড় গাছ চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গাছ-গুলোতে ফলের নামগন্ধ নেই, কিন্তু ইয়া বড় বড় পাতা- যেন এক একটা

ছাতা, বৃষ্টি হলে মাথায় দিয়ে দেহ বাঁচানো যায়। কেটে এনে এখানে বিছিয়ে দেব। এ ত আর বৈঠকখানা নয়, ঋষির আশ্রম।

বালানন্দ বললেন: যদি সত্যই কেউ আসেন রাজবাড়ীর লোকেরা, তোমরা বরং রাজধানীতে যেও তাদের সঙ্গে। কেন আর বনে বনে ঘুরে কষ্টভোগ করবে। সেখানে গেলে আরামে থাকতে পাবে, খাবার পরবার কোন ভাবনা হবে না।

জংলীবাবা গুরুজীর কথায় ক্লিষ্ট হয়ে বললেন: আরামের কথা আর শোনাবেন না গুরুজী, আমাদের সে ভুল ভেঙে গেছে। পরিক্রমা করব বলে বনে এসে, আমরা প্রথমে ভুলের পথই ধরেছিলাম। আপনার মতন ত্যাগী গুরুর কৃপা পেয়ে, সাথী হয়ে আর কিছুরই পরোয়া করি না।

সনকজীও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন: আমাদের মন বলুন, বুদ্ধি বলুন, ইচ্ছা বলুন—আপনাকেই ঘিরে আছে গুরুজী। যখনই ভুল চুক হবে, অন্যায় দেখবেন, অমনি সতর্ক করে দেবেন—এই আমাদের আর্জি।

বালানন্দ বললেন: তাহলে এই আস্তানায় জড়ের মত পড়ে থাকলে চলবে না। আমরা পরিক্রমার ব্রত নিয়েছি মনে রেখ। আস্তানা এখানে থাকুক, এখান থেকেই এদিককার জঙ্গলটা ঘুরতে হবে; পরিব্রাজকের পক্ষে এটাও একটা সাধনা।

পরিক্রমার নির্দেশটি দিয়েই দীর্ঘ যষ্টিটি হাতে করে বালানন্দজী উঠে পড়লেন। সম্মুখে সমাসীন দুই শিষ্যকেও সঙ্গে সঙ্গে উঠতে হলো। টিলাটির একপাশে ইতিমধ্যেই খাদ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডারটি এমনভাবে এঁরা নির্মাণ করে ফেলেছেন যে, পশুপাখী এসে তার সন্ধান না পায় এবং সহজে তার সংস্পর্শে যেতে না পারে।

তিনজনেই উপর থেকে নামতে লাগলেন। সেখান থেকেই বড় পাহাড়টি দেখতে পেয়ে বালানন্দজী বললেন: নীচে নেমেই আমরা ডান দিকের বড় পাহাড়টির উপরে উঠব।

জংলীবাবা বললেন: ওর ওপরে কিন্তু ভীষণ জঙ্গল, হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকাও আশ্চর্য নয়।

স্বামীজী সহাস্যে বললেন: জন্তু জানোয়ারের বাসস্থানই ত জঙ্গল।

তাদের সেখানে থাকাটা আশ্চর্যের বিষয় হবে কেন? আমরা বরং তাদের আস্তানায় চলেছি আতিথ্য গ্রহণ করতে। মানুষের উদ্দেশ্য ওরা বুঝতে পারে।

নীচে উপত্যকার মত সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে নেমেই তাঁরা পুনরায় অন্য দিকের উঁচু পাহাড়টির উপর উঠতে লাগলেন। বালানন্দ বললেন: এই পাহাড়েই কাল নরসিংগড়ওয়ালীরা শিকার করতে এসেছিলেন। তাঁদেব উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই এখানকার পাখীগুলো আমরা যে ছোট পাহাড়টির উপরে আস্তানা পেতেছিলাম, সেখানকার গাছগুলোর উপরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁরাও সেটা বুঝতে পেরে গুলী চালিয়েছিলেন।

আগের পহাড়টির চেয়েও এটি যেমন বড়, তেমনি উঁচু; সুতরাং উপরে উঠতে এঁদের অনেকখানি সময় লাগল। কিন্তু উপরে উঠেই সেখান থেকে পেছনের দিকে দূরের দৃশ্যাবলী দেখে প্রত্যেকেই মুগ্ধ হলেন। সর্বত্রই দিগন্তবিস্তারী গভীর অরণ্যের সমারোহ—স্থানে স্থানে পর্বত-শৃঙ্গের অস্পষ্ট রূপরেখা মেঘের সঙ্গে মিশে আছে।

এরপর সামনে বনের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করলেন। আগে বালানন্দজী, তাঁর হাতের দীর্ঘ যষ্টি—তারই সাহায্যে অভ্যাসমত যেতে যেতে বৃক্ষগুলির শাখা-প্রশাখা সরিয়ে দিয়ে নিজের ও সহযাত্রীদের যাবার পথ করে নেন। এদিন এই পাহাড়টির উপর বিবিধ বিচিত্র বিচিত্র আয়কর মনোহর বৃক্ষরাজির সমাবেশ দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। বনমধ্যে সেই সব বৃক্ষের সারি—বৃক্ষের পর বৃক্ষ, সরল সতেজ সুদীর্ঘ, তাদের শাখায় শাখায় আকাশ সমাচ্ছন্ন; কোন কোন পুষ্টাঙ্গ বৃক্ষে স্থূলাঙ্গী লতা, লতায় লতায় ফুল—অপরূপ দৃশ্য। আর এক অংশে বংশবন—ঈষৎ হরিদ্রাভ নবীন নধর শ্যমল পত্রাবলী সমাকীর্ণ ঘন সন্নিবিষ্ট বংশগুলি প্রভাতী সূর্যকিরণে স্নাত হয়ে যেন জীবন্ত সৌন্দর্যের বিকাশ করছে। ক্রোশের পর ক্রোশ—যতদূর দৃষ্টি চলে, এই সৌন্দর্য-বারিধি তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এখান থেকে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতেই আর এক অপরূপ দৃশ্য—শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তারপর আরও উন্নত শৃঙ্গ, সেখানেও গাছের সমারোহ—কিন্তু সেখানে সারিবদ্ধ নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর উপরে যেন জ্বলন্ত অগ্নিরাশি শিখা বিস্তার করে ধ্বংসের নাচ সুরু করেছে।

জংলীবাবা সেই ভীষণ দৃশ্য দেখে চীৎকার করে উঠলেন: গুরুজী, দেখুন, দেখুন—পাহাড়ের উপরে ঐ গাছগুলোর মাথায় আগুন জ্বলছে।

সনকজীও শঙ্কিতকণ্ঠে চীৎকার করলেন : কি সর্বনাশ। আমরা যে দাবানলের কথা শুনেছি, বোধহয় সেই আগুন !

বালানন্দজী এতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে উপরের দিকের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সহসা সঙ্গীদের চীৎকারে প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : ভাল করে দেখ, ঘাবড়িও না—চেয়ে চেয়ে অনুভব কর, তাহলেই বুঝবে পরমাত্মাজীর এও এক অপরূপ লীলা। পাহাড়ের উপরে ঐ যে গাছ্‌গুলি দেখছ—গায়ে গায়ে মিশে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, ওরাই বিখ্যাত জারউল গাছ্। ওদের শাখা প্রশাখাগুলি গোলাপী ফুলে ভরে গেছে—তার ওপর পড়েছে নবারুণের রক্তবর্ণ আভা। তাতেই মনে হচ্ছে—অত উঁচুতে গাছের মাথায় আগুন জলছে।

জংলীবাবা জিজ্ঞাসা করলেন : জারউল গাছ্—তার ফুলের ওপর সূর্য-নারায়ণের কিরণ পড়তেই এই কাণ্ড !

সহাস্যে বালানন্দজী বললেন। প্রকৃতিমায়ীর এক অদ্ভুত সজ্জা। আর ঐ যে জারউল গাছ্ দেখছ, পাহাড়ের উপরেই জন্মায়। এই গাছ্ খুব আওলাতী ; এ থেকে গৃহস্থলোকের ঘরবসতের অনেক দরকারী আসবাবপত্র তৈরী হয়, জলপথে চলবার জন্য নৌকা তৈরীর উপাদান এই গাছের কাঠ।

উপরের চক্ষুচমৎকারী শোভা দেখতে দেখতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হতেই জংলীবাবা পুনরায় বিস্ময়ের স্বরে চীৎকার করে বললেন : এদিকে দেখুন গুরুজী, গাছ্ নেই, খালি পাতা উঠেছে জমিন থেকে, আর কি ভীষণ চেহারা !

সনকজী সমর্থন করে বলে উঠলেন : সত্যিই, দেখলে ভয় হয়। ভৌতিক কিছু নয় ত গুরুজী ?

গুরুজী দৃষ্টি ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকাতেই বিশাল আয়তনের সারিবদ্ধ পাতাগুলি দেখতে পেলেন। মনে হলো. কে যেন নিপুণভাবে এক একটি অতিকায় পাতা জমির উপর সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি পাতা এত বড় যে, এক একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি তার উপর অনায়াসে শয়ন করতে পারে। স্বামীজী দীর্ঘকালীন পর্যটনের ফলে বনের গাছ্‌পালা লতাপত্রাদির তথ্য নিখুঁতভাবে জানবার সুযোগ পান। এমন কি, কোন গাছের কি গুণ গার্হস্থ্য ব্যাপারে তাদের কি উপযোগিতা, সে সবও অভিজ্ঞতা

স্মত্রে জ্ঞাত ছিলেন। প্রস্তরময় ভূমি সংলগ্ন বৃহদায়তনের পাতাগুলি দেখেই তিনি সহাস্যে বললেন: প্রত্যেক জিনিসটি ভাল করে দেখে তার পর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত। সাহস করে একটু এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে, গাছের ডাল থেকে এ সব পাতা নির্গত হয়নি বটে, কিন্তু মাটি থেকেই উঠেছে। এগুলি হচ্ছে কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্‌, পাহাড় অঞ্চলেই জন্মায়; কন্দের শিকড় থাকে মাটির মধ্যে, আর কন্দ থেকেই পাতা ওঠে—এর নাম আনার কলি।

এর পর আর গুরুজীকে বলতে হলো না, উভয়েই তখন নির্ভয়ে মহোৎসাহে পাতাগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নীচু হয়ে ভূমির উপর বসে পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারলেন, গুরুজীর কথাই সত্য।

জংলীবাবা বললেন: গুরুজী, আমরা এই পাতা দু'চারখানা সঙ্গে নিয়ে যাব। যদি সত্যই কোন অতিথি অর্থাৎ রাজবাড়ী থেকে কেউ আমাদের আস্তানায় আসেন, এই পাতা দেব বিছিয়ে—আসনের কাজ হবে।

বড় বড় ঢাউস ঢাউস পাতাগুলো বাঁধবার জন্য জংলীবাবা বন্ধনীর সন্ধানে একটু এগিয়ে গেলেন। নির্জন অরণ্য মধ্যে বন্ধন রজ্জু আর কোথায় পাবেন, যদি কোন লতা বা এই জাতীয় কোন কিছু পান, তাহলেই তাঁর কাজ হবে।

এদিকে একস্থানে বিশাল আয়তনের দুটি প্রাচীন বৃক্ষ বালানন্দজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। গাছ দুটির শাখা প্রশাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরেছে, তার সৌরভে স্থানটিও যেন আমোদিত হয়ে উঠেছে—পথচারীরাও এখানে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। সনকজী পাতাগুলি গুছাতে গুছাতে জিজ্ঞাসা করলেন: গুরুজী, ও দুটো কি গাছ? ওদের কাণ্ড ও ডাল পালা একই রকমের, কিন্তু পাতা আর ফল আলাদা। কচি কচি ফলের এমন মিষ্টি গন্ধ ফুলের গন্ধ না জানি আরো কত মিষ্টি হোত।

একটু হেসে বালানন্দজী বললেন: এ সব গাছের ফুল হয় না—সুরু থেকেই ফল ধরে। প্রকৃতিজীর অদ্ভুত সৃষ্টি। ঋষিরাও তাই এই মহাবৃক্ষকে বনস্পতির শ্রেণীভুক্ত করে গেছেন। এই যে দুটি বিশাল বৃক্ষ দেখছ, এরা অশ্বত্থ ও বট নামে পরিচিত। আর গুটি তিনেক বৃক্ষ এদের সঙ্গে এখানে মিশলেই স্থানটি পঞ্চবটি হোত।

সনকজী জিজ্ঞাসা করলেন : সে তিনটি বৃক্ষ কি কি গুরুজী ?

বালানন্দ বললেন : আমলকি, অশোক ও বিল্ব। এখানে কিন্তু ও তিনটির একটিও নেই। তবুও এই স্থানটি খুবই মনোরম—সাধন ভজনের উপযুক্ত। এখানে এসে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম।

সহসা জংলীবাবার আর্তনাদ শুনে উভয়েই চমকে উঠলেন। স্বর লক্ষ্য করে তাকাতেই এঁরা দেখতে পেলেন—অদূরে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে জংলীবাবা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন আর তাঁর কণ্ঠ থেকে আর্তস্বর নির্গত হচ্ছে —গুরুজী—মরলাম !

ওদিকে হয়েছে কি—অদ্ভুত পাতাগুলি একস্থানে জড়ো করে বাঁধবার উদ্দেশ্যে রজ্জুর মত কার্য্যকরি হয়, এমন কোন লতার সন্ধানে জংলীবাবা এগিয়ে যান। একটা ঝোপের মধ্যে তাঁর বাঞ্ছিত লতার মত কোন বস্তু দেখে সেটি আহরণ করবার জন্য হাতের যষ্টিটি চালনা করতেই বুঝলেন যে, তাঁর নসীবে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' কথাটা বাস্তব হয়ে উঠেছে। সেই লতাটি পরক্ষণে বিষধর সর্পে পরিণত হয়ে ফণা বিস্তার করে তর্জন করতে থাকে। জংলীবাবা সে অবস্থায় সলম্ফে পিছিয়ে এসে স্থাণুর মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঐভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন। সর্পটিও ফণা উদ্যত করে দারুণ ক্রোধে দুলতে থাকে ; পরস্পরে চোখাচোখি হতে জংলীবাবা এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তাঁর চলচ্ছক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্রমে কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ হয়—কেবলমাত্র পদযুগল থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। স্তূপের মত বৃক্ষবল্লরী সমন্বিত সাধারণ একটি ঝোপের ভিতর থেকে অসাধারণ এক কৃষ্ণকায় মহাসর্প বিশাল ফণা উদ্যত করে বিসর্পিত-ভঙ্গিতে আন্দোলিত হচ্ছে ; তার ক্রুদ্ধকণ্ঠের হিস্ হিস্ শব্দ এমন এক ভীষণ মধুর ঝঙ্কার তুলছে, সন্নিহিত গাছগুলিও বুঝি আতঙ্কে শিউরে উঠছে—মানুষের অবস্থার কথা বলাই বাহুল্য।

স্বামীজী স্তব্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র অথচ সাংঘাতিক দৃশ্যটি দেখলেন এবং ব্যাপারটি উপলব্ধিও করলেন। সনকজীও দূরে থেকেও আতঙ্কে এমনি আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হল না—আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে তাকালেন মাত্র।

স্বামীজী অবস্থাটি বুঝলেন। বুঝলেন যে, জংলীবাবা সর্পদৃষ্টিতে বিহ্বল

হয়ে যে ভাবে কাঁপছে—হয়ত এখনি পড়ে যাবে, আর তৎক্ষণাৎ ঐ ভীষণ সাপটা তার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাভাবিক হিংস্র প্রবৃত্তি তার চরিতার্থ করবে। তিনি আর অগ্রসর না হয়ে সেখানে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরকে অধিকতর গম্ভীর ও উচ্চতম করে ওঁকার ধ্বনির সঙ্গে স্তোত্রের ঝংকার তুললেন :

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরি ওঁ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।
ওঁ সহ নাব বতু
ওঁ সহ নৌ ভুনক্তু
ওঁ সহ বীর্য্যাং করবাবহৈ
ওঁ তেজস্বি নাবধীত মস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ—
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরি ওঁ॥

উদ্যত কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে ওঁকার শব্দটির মধ্যে সঙ্গীতের গুরু গম্ভীর রাগ ও রাগিণীর সঞ্চার করে বৈদিক স্তোত্রের আলাপ আরম্ভ করলেন বালানন্দজী। অপূর্ব স্বর, অপূর্ব সুর, অপূর্ব তার শব্দযোজনা! অপূর্ব ও অপরূপ সুরের ঝংকার উঠে সমগ্র বনভূমিকে বুঝি স্তব্ধ ও নিমগ্ন করে তুলল। এমন কি, সেই হিংস্রপ্রকৃতি ক্রুদ্ধ মহসর্পটির কণ্ঠনিঃসৃত হিস্ হিস্ শব্দের তর্জ্জনও স্তব্ধ হয়ে গেল—ওঙ্কার ধ্বনির গম্ভীর মধুর ঝঙ্কার বুঝি উদ্যত ফণা দংশনোন্মুখ প্রত্যক্ষ কালস্বরূপ বিষধরটির হিংস্র প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। সুরের সঙ্গে সঙ্গে বালানন্দজী উপর দেহভার সমর্পণ করে উভয় হাতের করতালি সংযোগে এমন সুসঙ্গত তাল দিতে লাগলেন যে, মৃদঙ্গ করতালের মিলিত সঙ্গতের কোন আভাষই বুঝা গেল না।

দেখতে দেখতে সর্পদেহের বিসর্পিত ভঙ্গী স্তব্ধ হয়ে গেল, পক্ষান্তরে বালানন্দজীর উন্নত দেহখানিই তখন ভাবাবেগে দুলতে লাগল। ক্রমেই সুরের ঝংকার লীন হয়ে এল, সেই সঙ্গে সাপটিও ফণা সঙ্কুচিত করে ধীরে ধীরে ঝোপের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখনও বালানন্দজীর কণ্ঠ থেকে ভাবাবেগে ওঙ্কার ধ্বনির ঝংকার উঠছে এবং উভয় করের মিলিত ধ্বনির সঙ্গে সমগ্র দেহখানি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। ঋষি সৃষ্ট সুমধুর স্তোত্র এবং স্বকণ্ঠের অপরূপ সুর তাঁর আপন সত্তাকে

বুঝি বিহ্বল করেছে বা হারিয়ে ফেলেছে। উভয় শিষ্য এই সময় সান্নিধ্যে এসে ভক্তিনম্রস্বরে আবাহন করলেন : ধন্য—গুরুজী ধন্য।

ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে সম্মুখে তাকালেন বালানন্দজী। দেখলেন, জংলীবাবা ও সনকজী তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করছে। তৎক্ষণাৎ বর্তমানে ফিরে এলেন বালানন্দজী। মৃদু হেসে বললেন : কি প্রাণময় স্তোত্রের সৃষ্টি করেছিলেন এই ভারতের ঋষি মহাত্মারা। দেখলে ত এর মাহাত্ম্য ? কালসর্পও হিংসা ভুলে শান্ত হয়ে চলে গেল। সত্যই ঋষি মহাত্মাদের শান্তিমন্ত্র সকল অশান্তি বিনাশ করে জগতকে আনন্দ দেয়। কিন্তু কাল ধর্মে ভারতবাসী এর মাহাত্ম্য ভুলে যাচ্ছে, এর প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে। যাক, তোমার একটা ফাঁড়া কেটে গেল জংলী ; এখন আশ্রমে ফিরে চল।

এই যে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, স্তোত্র গান করে সর্পের গ্রাস থেকে বালানন্দজী বিপন্ন শিষ্যকে রক্ষা করলেন, তার জন্য কোন আত্মশ্লাঘা নেই, নিজের বাহাদুরির জন্য কোন রকম বাক্‌বিন্যাস নেই ; যেন কিছুই হয় নি—এমনি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সহাস্যে উভয় সাথীকে আশ্রমে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজেই পিছনে-ফেলে-আসা পথে পুনরায় পদক্ষেপ করলেন।

আট

উভয় শিষ্য-সাথীকে সঙ্গে করে বালানন্দজী পুনরায় পূর্বের আশ্রয় স্থানে এসে যে দৃশ্যটির সম্মুখীন হন, যাত্রাকালেই তিনি সেটি অনুমান করেছিলেন। পূর্বদিন নরসিংহগড়ের তরুণ রাজা সশিষ্য সাধু মহারাজকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সূত্রে বালানন্দজীর আশঙ্কা ছিল, রাজধানীতে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটার কথা রাজা রাজবাড়ীতে নিশ্চয়ই বলবেন ; তখন রাজপুরীর ভক্তিমতী মহিলাদের পক্ষে সাধু দর্শনে আসা অসম্ভব নয়। সে অনুমান এখন বাস্তব হয়েছে দেখা গেল।

ঢালু পথে উপরে উঠতে উঠতেই উপর থেকে নারীকণ্ঠের মিশ্রধ্বনি তিনজনকেই আকৃষ্ট করল। বালানন্দজী মৃদু হেসে বললেন : তাড়াতাড়ি চলো, অতিথিরা আমাদেরই প্রতীক্ষা করছেন মনে হচ্ছে। শিষ্যদ্বয়ের মুখ দুখানি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জংলীবাবা বললেন : রাজবাড়ীর

পরিজনরা আসবেন জেনেই ত বসবার আসন নিয়ে চলেছি—এর জন্যে সাপের মুখে পড়েছিলাম ; ঘটনাটা মনে থাকবে।

উপরের প্রশস্ত স্থানটিতে রাজমাতাকে পরিবেষ্টন করে রাজপরিবারের কতিপয় মহিলা ও পরিচারিকাগণ সাধুজীর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। সাধুসন্তের ব্যবহার্য কিছু কিছু দ্রব্যাদি দেখে তাঁরা অনুমান করেছিলেন, সাধুজীরা সম্ভবতঃ সন্নিহিত ঝরণার জলে স্নানাদির জন্য গিয়েছেন, এখনই ফিরে আসবেন।

পিছনে দুই সাথী, বালানন্দজী অগ্রবর্তী হয়ে উপরে উঠতেই রাণীও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মাটির উপর বসে মাথা নত করে সাধুজীকে প্রণতি জানালেন। গুরুর সঙ্গে শিষ্যদ্বয়ও সভক্তি অর্চিত হলেন।

বালানন্দজী ভক্তিমতী রাজমাতার মাথার উপর হাতখানি রেখে মিষ্টস্বরে বললেন : কল্যাণ হোক, ভক্তিমতী হও। কিন্তু রাজবাড়ী থেকে এত কষ্ট করে এই দুর্গম বনের মধ্যে কেন এসেছ মা ? ওঠ, ওঠ তোমাদের পরণের দামী বস্ত্র সব মাটির পরশে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে যে !

রাজমাতাকে অনুসরণ করে অন্যান্য মহিলাগণও গুরুজী ও তাঁর দুই শিষ্যকে মাটির উপর নত হয়ে একে একে প্রণাম করছিলেন এই সময়। রাজমাতা বললেন : কত বড় পুণ্যের জোরে সাধু মহারাজের চরণ স্পর্শ করতে পেরেছি—এর জন্যে দেহকেও তুচ্ছ মনে করি প্রভু, বস্ত্র কোন্ ছার।

সকলের ভক্তি নিবেদনের পর বালানন্দজী তাঁর আসনের দিকে এগিয়ে চললেন এবং তারই মধ্যে জংলীবাবার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতেই দুই শিষ্য আনারকলির বড় বড় পাতাগুলি তাড়াতাড়ি খুলে স্বামীজীর আসনের সম্মুখ দিকে বিছিয়ে দিয়ে বসবার জন্য রাজমাতা ও তাঁর সঙ্গিনীদিগকে অনুরোধ জানালেন।

বালানন্দজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার স্বরে বললেন : সাধুদর্শনের জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, এখন সাধুর স্থানে এসে গাছের পাতায় বসে কল্পনা করুন স্বর্ণাসনে বসেছেন।

রাজমাতা যুক্ত করে বললেন : সাধুস্থানের মাটিই আমাদের সোনা ; মহারাজজী সেই সোনার উপর তার আসন পেতে আমাদের মনে লজ্জা দিচ্ছেন। আমরা জমিনের উপরেই বসবো॥

বালানন্দজী বললেন : তাহলে আমার দুই ভক্ত শিষ্য বড়ই ব্যথা পাবে। গত কাল রাজাজীর শুভাগমন হলে আমরা তাঁকে এখানে বসাতে পারি নি আসনের অভাবে। আজ জঙ্গল পরিক্রমায় বেরিয়ে ওরা এই পাতাগুলো দেখেই স্থির করে ফেলে—এর পর কোন অতিথি সজ্জন এলে যত্ন করে বসাবে। পাতাগুলি বাঁধবার সময় সাপের মুখে পড়েছিল এরা, পরমাত্মার কৃপায় বেঁচে গেছে। রাজমাতা প্রসন্ন মনে এই পত্রাসন গ্রহণ করলে ওরা ধন্য হবে। সঙ্গে যাঁরা এসেছেন; তাদেরও বসবার জন্য অনুরোধ করছি।

রাজমাতা সবিনয়ে নিবেদন করলেন : আমরা সাধুসন্তের আশ্রমে আসি সেবার সঙ্কল্প নিয়ে; তাঁদের চরণতলে বসে যথাশক্তি সেবা অর্চনার সুযোগ পেলেই নারীজন্মকে সার্থক মনে করি। বসবার জন্য আসন পা'বার, কিম্বা অতিথিদের মত আদর আপ্যায়নের কোন আশা নিয়ে আসি না। সাধু মহারাজের করুণার অন্ত নেই, মহারাজের শিষ্যরাও গুরুর মত সদাশয়, তাই আমাদের জন্য পাতার আসন বিছিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, রাজমাতাকে বাধ্য হয়ে পত্রাসন গ্রহণ করতে হল; তাঁর সঙ্গিনীরাও সঙ্কুচিতভাবে আস্তৃত পাতাগুলির কিনারা ঘেঁষে বসলেন। প্রৌঢ়া রাজমাতা বালানন্দজীর পুরাণবর্ণিত তপোবনবাসী ঋষিসুলভ অপরূপ আকৃতি দেখে মাতৃস্নেহে এমনি অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, কথা বলতে বলতে কেঁদেই আকুল হয়ে ওঠেন। তাঁর এই ব্যাকুলতার কারণ হচ্ছে—সাধু মহারাজের জননী কেমন করে সংসারে জীবন ধারণ করে আছেন? তিনি বারবার বলতে লাগলেন—'আমি মা হলে—কখনই এমন ছেলেকে সন্ন্যাসী হতে দিতাম না—পথ আগলে পড়ে থাকতাম।'

বালানন্দজী মৃদু হেসে বললেন : আমি জানি, সব মায়ের অন্তরে একই প্রকারের স্নেহের উৎস থাকে। আমার মা'ও ছিলেন এমনি স্নেহশীলা। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সামর্থ আমার ছিল না বলেই, আমি তাঁর অগোচরে গভীর রাত্রে উপনয়নের পর দণ্ডীঘর থেকে গোপনে পালিয়ে আসি। তবে আমার মনে এই সান্ত্বনা, নর্মদামায়ী আমার স্নেহাতুরা মায়ের মনে শান্তি দিয়েছেন। আর একথাও ধ্রুব সত্য রাজমাতা, সন্ন্যাসের আকুতি অন্তরে জাগলে সংসার তাকে ধরে রাখতে পারে না। পুরাণে এমন শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাজমাতা বললেন : জানি। পণ্ডিতরা যখন পুরাণ পাঠ করেন, ঐ সব ত্যাগী সন্তানদের কথা শুনতে শুনতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। তখন আমার মনে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মহারাজ—সন্তানের জন্যে মায়ের মনে যে অগাধ স্নেহ দিয়েছেন ভগবান, সন্তানের বুকে তার একটু কণাও দেন নি। সেই জন্যেই তারা কঠিন হয়ে মায়ের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে পালাতে পারে। যখনি মনে আমার এ কথা জেগে ওঠে মহারাজজী, আমি তখন ব্যাকুল হয়ে উঠি—চোখের ধারা কিছুতেই থামে না; কেবলই ভাবি, সন্তান মায়ের স্নেহকে তুচ্ছ ভেবে বৈরাগ্যকেই বড় জেনে তারই কাছে যেতে চায় কেন ? হায়রে—সংসার।

বালানন্দজী গম্ভীর হয়ে বললেন : বৈরাগ্য কি সামান্য বস্তু রাজমাতা। সুমাতার গর্ভজাত সন্তানই পূর্ব জন্মের সুকৃতির পুণ্যে শৈশবেই বৈরাগ্যের সন্ধান পান। সব বাসনার যখন শেষ হয়েছে, ভোগের কোন কামনাই থাকে না, জীবনের সেই অবস্থাকেই বৈরাগ্য বলে। সেইজন্যই, একথাও মায়েদের মনে রাখা উচিত, বহুকাল তপস্যা করেও যে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না, শৈশব জীবনেই সন্তান তাঁর সুকৃতিবলে সেই পরম পদার্থ পেয়েছেন। তখন সে সন্তানকে আর ধরে রাখবার চেষ্টা করা মহা ভুল, মায়ের স্নেহও সেখানে হার মানতে বাধ্য; বুদ্ধিমতী মায়ের উচিত, স্নেহ দিয়ে সন্তানের সঙ্কল্পে বাধা না দেওয়া।

রাজমাতা মন দিয়ে সাধু মহারাজের কথাগুলি শুনলেন। কথাগুলি তাঁকে যেন মুগ্ধ করল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে নীরব থেকে তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা মহারাজজী, মনের সঙ্কল্প কি সিদ্ধ হয় ?

বালানন্দজী উত্তর করলেন : 'সঙ্কল্প শুদ্ধ হোনেসে সিদ্ধ হোগা।' যদি সৎ শুদ্ধ বা পবিত্র সঙ্কল্প হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

রাজমাতা পুনরায় প্রশ্ন করলেন : মহারাজজী, সংসারে ত কতরকমই লোক দেখি, তার মধ্যে সুখী দুঃখী, ভাল মন্দ কত প্রকৃতির লোকই থাকে। কিন্তু অনেকেরই জীবন নিস্ফল হয়—কেন হয় জানতে ইচ্ছা করে।

বালানন্দজী বললেন : সংসারে সবার জীবনই যদি সফল ও সার্থক হত রাজমাতা, তাহলে সংসারটাই স্বর্গ হয়ে উঠত। শুধু সংসারের মানুষই বা বলি কেন—জীবজন্তু, প্রকৃতির মধ্যেও এই নিস্ফলতা দেখি। আর কি অভাবের

দরুণ এই নিষ্ফল ভাব, তারই বিচার করে ঋষিরা যে কথা বলে গেছেন, আমি তারই উল্লেখ করছি :

"রাজা ধর্ম্মং বিনা, দ্বিজ স্তপো বিনা, জ্ঞানং বিনা যোগিন: ।
লক্ষ্মী দানং বিনা, ব্রতং তপো বিনা, কণ্ঠং বিনা গীতিকা ।
শূরো যুদ্ধং বিনা, গজো মদং বিনা, তেজং বিনা দামিনী,
নারীং পুরুষং বিনা, পুরুষো ধনং বিনা, শূন্য সদা তিষ্ঠতি ॥"

অর্থাৎ—ধর্মহীন রাজা, তপোবিমুখ দ্বিজ, জ্ঞানহীন যোগী, দানবিহীন ধনসম্পদ, তপস্যাহীন ব্রত, সুকণ্ঠবিহীন সঙ্গীত, যুদ্ধবিমুখ শৌর্য, মদমত্ততা শূন্য হস্তী, তেজোহারা বিদ্যুৎ, স্বামী বঞ্চিতা নারী এবং ধনহীন পুরুষের জীবন সব সময়েই নিষ্ফল হয়ে থাকে ।

রাজমাতা স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : কি সুন্দর কথা, বিচার করলে মানতেই হবে । সাধুসঙ্গে এইত লাভ, শুনলে জ্ঞানলাভ হয় । সংসারে কত জ্বালা, কত ঝন্ঝাট, সেখানে এ সব দুর্লভ ।

বালানন্দজী সহাস্যে বললেন : পরম সাধক তুলসীদাসজী তাঁর দোঁহাতে ও এই কথা বলেছেন :

"সাধুসঙ্গ, হরি কথা, তুলসী দুর্লভ দোয়,
সুত, দারা, লছ্মী, পাপীকোভি হোয় ।"

অর্থাৎ—তুলসীদাস বলছেন যে, সাধুসঙ্গ আর ভগবৎপ্রসঙ্গ এ দুটোই সংসারে দুর্লভ—পুণ্যবান সুকৃতিশালীদের ভাগ্যেই এ দুটি লভ্য হয় । আর যদি স্ত্রী পুত্র সম্পদের কথা বল, যারা পাপী, এগুলি ত তারাও পেয়ে থাকে ।

রাজমাতা সানন্দে বললেন : খুব খাঁটি কথা । গোঁসাইজী তাই স্ত্রী পুত্র সম্পত্তির নাম না করে সৎসঙ্গ আর হরিকথাকেই দুর্লভ বলেছেন । আর এই দুর্লভ বস্তু আমরাও এখানে এসে লাভ করলাম ।

বালানন্দজী রাজমাতার সময়োচিত কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : দেখ রাজমাতা, সাধুসঙ্গ আর হরিকথা যেমন দুর্লভ বলার গুণে মুখের কথাও তেমনি অমূল্য হয়ে থাকে । তাই গোঁসাইজী বলেছেন :

"বুলি বোল্ অমূল্য হ্যায় যো যানে বোল্ ।
বুলি য্যায়সা বোলিয়ে—কাটে অন্দর তৌল ॥"

অর্থাৎ—কথা বলতে জানলে অমূল্য কথা হয়ে থাকে । তাই যা-তা না

ব'লে বিচার করে ভেবে চিন্তে কথা বলা চাই, তখন সে কথায় অনেক কাজ হয়।

রাজমাতা বললেন: কিন্তু মহারাজজী মানুষের মন যে অনেক সময় সব গুলিয়ে দেয়, শুভ ইচ্ছা তাতে উলটে যায়—উলটো দিকে ফিরিয়ে দেয়। মনকে বাগে আনবার কি উপায় প্রভুজী?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বালানন্দজী বললেন: উপায় হচ্ছে উল্‌ট যাওয়া। অর্থাৎ—মন বিগড়ে গেলে তাকে ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী করা। অন্তর্মুখী বলতে, যে সদ্‌ইচ্ছার কথা বললে, সেই ইচ্ছা কিম্বা ভগবদ্‌চিন্তা- সেই দিকে নিয়ে যাওয়া। মনকে আয়ত্তে আনা সাধনার একটা অঙ্গ। তাই একটা কথা আছে—'মনকে হারে হারিয়ে, মনকে জিতে জিৎ।' অর্থাৎ মনের বশ হলেই হেরে যাওয়া, আর মনকে জয় করতে পারিলেই জয় হয়। সৎসঙ্গ থেকেই মনকে সংযত করা যায়। সঙ্গের প্রভাব সহজ নয়; কুসঙ্গ সাধু মানুষকেও নষ্ট করে, আবার সৎসঙ্গ মানুষের স্বভাব বদলে দেয়—নষ্টপ্রকৃতির মানুষও সৎসঙ্গের ফলে সৎ হয়; এইজন্যই সৎসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন।

সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় রাজমাতা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বালানন্দজীকে অনুরোধ করলেন: অন্তত: দু চার দিনের জন্যও মহারাজজী আমাদের গরীবখানায় চলুন, শিষ্যদেরও সঙ্গে নিন, আমরা সেখানে ভগবদ্‌প্রসঙ্গ আলোচনার ব্যবস্থা করব। বিশ পঁচিশ গাঁয়ের লোক জড় হবে, সাধু দর্শনে তাদের জীবন ধন্য করবে, আমরাও পরম আনন্দ পাব।

বালানন্দজী বললেন: রাজবাড়ীতে গিয়ে আতিথ্যগ্রহণ করা আমার পক্ষে এখন সত্যই অসম্ভব, রাজমাতা। একটু আগেই সঙ্কল্পের কথা বলেছি। নর্মদা পরিক্রমার জন্য আমাকেও সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হয়েছে। এই পরিক্রমা শেষ হবার পূর্বে কোন গৃহীর ভবনে বাস করবার সামর্থ আমার নেই, রাজমাতা। তাহলে আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হতে হবে। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, পরিক্রমার পথে নরসিংগড়ের কাছাকাছি গেলে, আমি সংবাদ দেব। সে সময় আপনারা যদি অস্থায়ী আশ্রয়স্থানে আসেন, ভগবদ্‌ আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা যাবে।

বুদ্ধিমতী রাজমাতা সাধু মহারাজের মনোভাব বুঝেই আর যাবার জন্য অনুরোধ করলেন না। তবে সবিনয়ে বললেন: সাধুসেবার জন্য আমরা

সামান্য কিছু উপচার সঙ্গে করে এনেছি, এগুলি দয়া করে গ্রহণ করতে হবে, নতুবা আমরা বড়ই ব্যথা পাব।

বালানন্দজী বললেন : আগের দিন রাজা তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। যাবার সময় তিনি যে সব উপচার দিয়ে গেছেন, এখনো আমার শিষ্যরা সঞ্চয় করে রেখেছেন। আবার কেন এত সব খাদ্য বস্তু সঙ্গে করে এনেছ, রাজমাতা?

রাজমাতা সবিনয়ে বললেন : সাধু মহারাজ নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, দেবতা, সাধু ও রাজদর্শনে রিক্ত হস্তে যেতে নেই—কিছু না কিছু উপচার নিয়ে যাওয়া উচিত। আর, এভাবে কিছু ব্যয় হলে অর্থ সার্থক হয়, যে দেয় তারও অনেক পুণ্যি হয়। আপনারাই ত বলে থাকেন মহারাজজী—"যিস্ কা চুণ্, তিস্ কা পুণ্।" তবে?

হো হো করে এবার হেসে উঠলেন মহারাজজী। বললেন : রাজমাতা বিচার করে কথা বলায় আমার যুক্তি ফাঁস হয়ে গেল; আমার আপত্তিও তাহলে টিকল না। বেশ, তোমাদের যা অভিরুচি তাই কর। সাধুসেবায় যখন এনেছ, আমি আর বাধা দেব না।

বেতের তৈয়ারী বৃহৎ একটি পাত্র ভরে নানাবিধ উপচার, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সঙ্গে এনেছিলেন রাজমাতা। সেই বৃহৎ পাত্রটি সিধারূপে পরিচারিকারা মহারাজজীর সামনে উপস্থিত করল তাঁর ইঙ্গিতে। সনক ও জংলীবাবার গম্ভীর দুখানি মুখ এখন হাসি ও আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

নয়

সেই টিলার আশ্রমে আরও সাতটি অহোরাত্রি কাটিয়ে সশিষ্য বালানন্দজী স্থানটি ত্যাগ করে পুনরায় পরিক্রমায় বেরুবার জন্য উদ্যোগী হলেন। শিষ্যদ্বয় আর আপত্তি করতে বা মিনতি ও অনুরোধে তাঁর সঙ্কল্প ভঙ্গ করতে ভরসা পেলেন না। রাজবাড়ীর প্রচুর পরিমাণ খাদ্যসম্ভারে এখানকার অস্থায়ী ভাণ্ডার পূর্ণ থাকায়, এই কটা দিন ক্ষুধার নিগ্রহের কথা এঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন। সঙ্গে আনা একখানা লোহার থালার উপর যখন রাশিকৃত আটা ঢেলে হাতের থাবা ভর্তি ঘৃত সংযোগ করে পরিপাটি রূপে মিশিয়ে জল ঢেলে প্রচণ্ড উৎসাহে সেগুলি দলাইমলাই করতেন, তখন অদূরবর্তী

আসনে উপবিষ্ট গুরুজী শ্বেত পাথরের একখণ্ড চাঙড়ের মত সেই বৃহদায়তন বস্তুটির পানে তাকিয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠতেন। আপন মনে ভাবতেন তিনি, আট দশজন সাধারণ গৃহীর উদর পূরণের উপযুক্ত আহার্য এবা দু'জনে উদরসাৎ করবার জন্য পরমোৎসাহে কত তদ্বিরই করছে। মনে পড়ে—শাস্ত্র নির্দ্দেশ ও গুরুর তত্ত্বকথা—সঞ্চয় করা গৃহীর কর্তব্য, সন্ন্যাসীর নয়। আহার্য সঞ্চিত থাকলে আলস্য বাড়ে, ভগবদ্ চিন্তায় বিঘ্ন ঘটায়। বৌদ্ধ যুগে সংঘারামগুলি সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ খাদ্যসম্ভারে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকত বলেই, যত সব নিষ্কর্মা আলস্যপরায়ণ লোক 'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি' মন্ত্রের ঝংকার তুলে সাংঘারামগুলিতে প্রবেশ করত এবং সুলভ রাজভোগে পরিপুষ্ট হয়ে অন্যায়াচারের এক একটি প্রতিমূর্তি হয়ে উঠত। পরমপুরুষ তথাগত বুদ্ধদেবের মহান আদর্শ থেকে পরিভ্রষ্ট হয়েই ধর্মান্ধ অশোকের আমলেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যব্যাপী সংঘারামগুলিই বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটিয়েছিল। এই জন্যই আর্য ঋষিরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ পরিক্রমায় সাথী দুই শিষ্যকে বালানন্দও এইজন্যই আহার সম্পর্কে সংযমী হবার জন্য প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কিন্তু শিষ্যদের ভোগস্পৃহা তখনো বর্ষার নদীর মত উদ্দাম, মধ্যে মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলেও আকস্মিক ভাবে কোন সুযোগ ঘটলে, পুনরায় সেই স্পৃহা দুর্দমনীয় হয়ে উঠত। বালানন্দজীও অবস্থা বুঝে ইদানীং তূষ্ণিভাব অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। সময় হলে স্বাভাবিক ভাবেই ভোগের আকাঙ্ক্ষার অবসান হবে ভেবেই নীরব থাকেন। শিষ্যদ্বয়কে মহোৎসাহে তিনজনের উপযুক্ত আহার্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত দেখেন বালানন্দ। এখানে তাঁর নিষেধ বাক্যও শিষ্যদ্বয় বিস্মৃত হন। অথচ, আহার্য প্রস্তুত হলে গুরুর অংশ তাঁকে নিবেদন করতে গিয়ে প্রতিবারই তাঁরা দেখেছেন যে, গুরুজী মাত্র দুইখানি রুটি এবং কিছু ভাজি সহাস্যে গ্রহণ করে অবশিষ্ট সব কিছুই পরিত্যাগ করেছেন। তথাপি স্থূলবুদ্ধি শিষ্যদুটির সংজ্ঞা হয় না। গুরুজী এর পর মুখে আর কিছু বলেন না, নীরবে একটু হাসেন মাত্র। শিষ্যদ্বয় প্রত্যেকেই রুটির এক একটি ক্ষুদ্র স্তূপ নিজেদের সামনে সাজিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন—মাত্র দুইখানি রুটিই গুরুজীর ক্ষুন্নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট, এমন কি—সেই সামান্য আহার্য থেকেই কীটপতঙ্গ বা পাক-পক্ষীরাও অংশ পায়। সাত্ত্বিক প্রকৃতি

নিলেও গুরুজীর আহার সম্পর্কে এই কঠোর সংযম শিষ্যদ্বয়কে এক এক সময় অভিভূত করে তুলে।

রাজমাতা সাধু দর্শনে এসে বিদায় নেবার সময় যখন প্রচুর খাদ্যসম্ভার দিয়ে যান, তদ্দৃষ্টে দুই শিষ্যের আননযুগল আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। তাদের সেই উৎফুল্ল ভঙ্গি গুরুজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করায়, তিনিও তৎক্ষণাৎ রাজমাতাকে সহাস্যে বলেন: দেখুন রাজমাতা, আমার এই শিশু দুটির ভোগ-স্পৃহায় এখনো শান্তিজল পড়েনি—ভোগ বলতে আমি অবশ্য উপযুক্ত উপচার দিয়ে আত্মাকে তুষ্ট করবার কথা বলছি। কিন্তু দুর্গম বনপথ পরিক্রমার সময় ক্ষুধার্ত আত্মাকে সব সময় তৃপ্ত করবার মত কোন উপচার বা উপাদান পাওয়া যায় না। বেচারাদের তখনকার অবস্থা দেখে আমার আত্মাও ব্যথিত হযে ওঠে। তখন পরমাত্মাজীর কছে প্রার্থনা জানাতে হয় এঁদের আত্মতৃপ্তির জন্যে। সেইজন্য আমি আপনাকে বলছি—এ দুটিকে বরং আপনি রাজধানীতে নিয়ে যান। এঁরাও তৃপ্তি পাবেন, আপনারাও সাধু দর্শন করে ধন্যা হবেন।

বালানন্দজীর মুখে একথা শুনে রাজমাতা আনন্দে অধীরা হয়ে সনক ও জংলীবাবাকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে থাকেন: সাধু মহারাজের শ্রীমুখের কথা আপনারা শুনলেন ত। আমাদের পক্ষেও পরম সৌভাগ্য—মহারাজের কথামত আপনারা তাহলে আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে চলুন। কোনপ্রকার অসুবিধা আপনাদের যাতে না হয়, আমরা সে চেষ্টা করব। আপনারা উঠুন।

অন্য সময় হলে শিষ্যদ্বয় হয়ত রাজমাতার অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না; কিন্তু তাঁরা জেনেছেন যে, তাঁদের ভাণ্ডার তখন পূর্ণ, অন্ততঃ একটি সপ্তাহ আত্মাকে পরিতৃপ্ত করবার মত পর্য্যাপ্ত উপাদান সঞ্চিত আছে। এ অবস্থায় গুরুজীর মত মহাত্মা ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই তাঁরাও বেশ দৃঢ় হয়ে রাজমাতার অনুরোধ উপেক্ষা করে বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন যে, গুরুজী তাঁদের সুবিধার দিকে চেয়ে রাজমাতাকে যে ব্যবস্থার জন্য বলেছেন, তাঁদের পক্ষে সেটা খুব সৌভাগ্যের বিষয় হলেও, এই দুর্গম জঙ্গলে তাঁরা কিছুতেই গুরুজীকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তবে, এর পর রাজধানী বা নদীর কাছাকাছি কোন জায়গায় গিয়ে যদি গুরুজী

আশ্রয় নেন, বরং সেখান থেকে তাঁরা রাজধানীতে গিয়ে রাজমাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন।

শিষ্যদের কথা শুনে তাঁদের প্রতি রাজমাতার শ্রদ্ধাভক্তি আরও গভীর হয়ে উঠে। এর পর তাঁরা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁদের উদ্দেশে রাজধানীতে পদার্পণ করবার জন্য আমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

সদলবলে রাজমাতার প্রস্থানের পর বালানন্দজী উভয় শিষ্যকে সকৌতুকে লক্ষ্য করে বলেন : ভোগীদের বিষয়বুদ্ধি অকাট্য বলে যে কথা শুনেছিলাম, তোমরা দেখিয়ে দিলে—সেটা সত্য। তোমাদের হিতের দিকে চেয়েই আমি প্রস্তাবটা রাজমাতার কছে তুলেছিলাম। কিন্তু দু'দিনে তোমাদের ভাঁড়ারে যে হরেকরকমের রাজভোগ সঞ্চিত হয়ে আছে, সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তোমাদের বিষয়বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ আমার ভুলটা ভেঙে দিলে। তাইত, রাজমাতার সামনে আর কোন কথাই বলতে পারলাম না।

এরপর প্রত্যহ অভ্যাসমত বালানন্দজী তাঁর পরিক্রমা বজায় রাখতেন। কিন্তু এ সময় উভয় শিষ্যের পক্ষে গুরুজীর অনুসরণ করা সম্ভব হত না। একজন যেতেন, আর একজন আশ্রমে থেকে খাদ্যভাণ্ডার রক্ষা করতেন। বালানন্দজী তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে নীরব থাকতেন। কথা বাড়িয়ে আর ভক্তদের মনে ব্যথার সৃষ্টি করতেন না।

ক্রমে খাদ্যসম্ভার শেষ হয়ে এল এবং দেখতে দেখতে সাতটি অহোরাত্র অতীত হয়ে গেল। এখন যাত্রার কথা তুলতে শিষ্যদ্বয় আর কোন আপত্তি তুললেন না—নীরবেই গুরুজীর অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই পরিচিত পার্বত্য জঙ্গলভুমি অতিক্রম করে তাঁরা অপরিচিত এক দুর্গম জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

জংলীবাবা সভয়ে বললেন : গুরুজী, কোথায় সেঁধুচ্ছেন? এ যে ভয়ঙ্কর জঙ্গল।

সনকও কথাটা সমর্থন করলেন : এখনই এই, এর পর যতই এগুব—জঙ্গলের মধ্যেই ডুবে যেতে হবে।

গম্ভীরভাবে বালানন্দ বললেন : জঙ্গল কি এই প্রথম দেখছ—না, এটা নুতন কিছু বিরাট কাণ্ড?

সনক উত্তর দিলেন : নতুন নয়, তবে এর আগে গোড়াতেই জঙ্গলের এমন ভয়ঙ্কর রূপ কোথাও দেখিনি।

বালানন্দ বললেন : গোড়াতেই ভয়ঙ্কর দেখে তোমরা যেমন ভয় পেয়েছ, আমারও তেমনি প্রচুর আনন্দ হয়েছে। এখন এই ভয়ঙ্করের হাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতির একটা মাত্র উপায় আছে।

উভয়েই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গুরুজীর দিকে তাকালেন। গুরুজীও এ অবস্থায় বিশেষ কোন ভূমিকা না করেই বলতে আরম্ভ করলেন : তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—নরসিংহগড়ের রাজমাতা তাঁদের বাড়ীতে যাবার জন্য যে পথের কথা সেদিন বলেছিলেন, সে পথ আমরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছি। তোমরা মনে করলে খানিকটা পথ ফিরে গিয়ে এখনি সে পথ ধরতে পার। আর, মনে করে দেখ—রাজমাতার কাছে তোমরা দুজনেই কথা দিয়েছ, সুযোগ সুবিধা হলেই রাজবাড়ীতে যাবে। আমিও বলছি, দু দশ দিন সেখানে থেকে, রাজমাতার শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা ভক্তি নিয়ে, আবার ফিরে এস। আর, তোমরাও ত জান, আমাকে এখন নর্মদামায়ীর কোলে আশ্রয় নেবার জন্যেই যেতে হবে, পথের মাঝে কিম্বা জঙ্গলে কোথাও বিশ্রাম করবার ইচ্ছা নেই—অবিরাম যাত্রা, কেবলই—হরদম। নর্মদামায়ীকে স্পর্শ না করে আমার আর নিবৃত্তি নেই। এভাবে আমার সঙ্গে ক্রমাগত জঙ্গল ভেঙে চলতে তোমাদেরও কষ্ট হবে, তাই এ প্রস্তাব করেছি।

প্রস্তাবটি উভয়ের মনে রীতিমত আনন্দের সৃষ্টি করল। গুরুজীর কৃপাতে যখন জঙ্গলে রাজার সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেছে, রাজমাতাও আমন্ত্রণ করে গেছেন, আর, ফেলে আসা পথের ঐ বাঁক থেকে রাজধানীর দূরত্বও যখন খুব বেশী নয়। এখনই যদি রওনা হওয়া যায়, দিনে দিনেই রাজধানীতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কিন্তু পরক্ষণেই যেই গুরুজীর কথা মনে পড়ে যায়—তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে, অমনি দুটো মনই এক সঙ্গে মুসড়ে পড়ে। সনকজী বললেন : আমরা বেশ বুঝতে পারছি, গুরুজীর আদেশ মাথায় করে রাজবাড়ীর দিকে গেলে, আরও দিন কতক সুখে যত্নে সেখানে থাকতে পারব। কিন্তু তেমনি আপনার সঙ্গ হারাব। একদিকে সুখ, আনন্দ, আর একদিকে বিরহ দুশ্চিন্তা। আপনাকে কিন্তু ছেড়ে যেতে আমাদের মন চাইছে না গুরুজী।

জংলীবাবাও সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করলেন : দুদিকই বজায় থাকে গুরুজী, আপনিও যদি আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে যাবার ইচ্ছাটি প্রকাশ করেন। তাহলে আমরাও ধন্য হই।

বালানন্দের প্রসন্ন মুখখানা পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠল জংলীবাবার অনুচিত কথাগুলি শুনে। তৎক্ষণাৎ তিনি সংযতকণ্ঠে বললেন : সব জেনে শুনেও তোমরা যদি আমাকে বিরক্ত কর তাহলে আমার অবস্থা কি হয় বল ত ? রাজা ও রাজমাতার অনুরোধও যেখানে রাখতে পারি নি, এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই জানবে। আমার সঙ্গ তোমরা আবার পাবে। রাজধানী থেকে নর্মদার তীর লক্ষ্য করে এলেই আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি এবার নর্মদামায়ীর আস্তানায় গিয়েই আশ্রয় নেব। তোমরা আর সময় নষ্ট না করে, ফিরে গিয়ে ঐ পথ ধর, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমাদের কল্যাণ হোক।

এমন স্নেহার্দ্রস্বরে কথাগুলি বলে বালানন্দজী উভয়কে অভিভূত করলেন যে, তাঁরা উভয়েই তাঁর বচনে আকৃষ্ট হয়ে সাশ্রুলোচনে বিদায় নিয়ে সেই পথেই ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। বালানন্দজী একাই প্রবেশ করলেন জনহীন সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যে—পদক্ষেপের যোগ্য মুক্ত স্থানটুকুর দিকে লক্ষ্য রেখে।

যে সব অরণ্যে সাধারণতঃ মানুষের গমনাগমন জনিত পদচিহ্ন পড়ে না, সেখানে পথের সন্ধান করে অগ্রসর হওয়াও কঠিন। কিন্তু দুর্গম দুর্ভেদ্য দিগন্তবিসারী অরণ্য অন্যের পক্ষে যতই ভয়াবহ বিপজ্জনক বা বিভীষিকা স্বরূপ হউক না কেন, আশৈশব অরণ্য ভ্রমণে অভ্যস্ত অধ্যবসায়শীল পরিব্রাজকের পক্ষে সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যই যেন অপরূপ রহস্যময়ীর মত বহু অজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব তথ্য প্রদর্শনে প্রলুব্ধ করে তাঁকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করতে লাগল এবং তিনিও সে আহ্বান স্বীকার করে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথমে হয়ত অরণ্যের স্বাভাবিক গভীরতার মধ্যে পদক্ষেপ করবার মত ছিদ্রেরও সন্ধান মিলছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলেন, সেই নিচ্ছিদ্র অরণ্যাঞ্চলে স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যেন স্বহস্তে চলার পথ রচনা করতে করতে অগ্রবর্তিনী হয়ে চলেছেন ; তখন আর পথের জন্য কোন চিন্তা চিত্তকে ক্ষুব্ধ করবার অবসর পেল না।

সঙ্গীদ্বয় বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন, বালানন্দ এখন একাই এই নিবিড় বনমধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। এক হাতে দীর্ঘ দণ্ড, অন্য হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে একটা ঝোলা। নির্ভীক, নিশ্চিন্ত ও উদ্বেগহীন তাঁর ভঙ্গি। মধ্যে মধ্যে এক একটা বন্যজন্তু দণ্ডধারী আগন্তুকের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে পরক্ষণে কর্কশস্বরে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে আরও গভীর ও নিরাপদ অংশ লক্ষ্য করে ধাবিত হচ্ছে। কোথাও বা কোন একটা বৃহৎ গাছের স্থূল শাখায় দেহের অধিকাংশ পাক দিয়ে বেষ্টন করে অজগর জাতীয় এক একটা সাপ শুধু করাল মুখখানা নীচে ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে। কিন্তু নির্ভীক পরিব্রাজকের পক্ষে এসবই পূর্বপরিচিত, সুতরাং অভ্যস্ত কৌশলে এদের অতিক্রম করেই অগ্রসর হলেন। এই অবস্থায় সহসা শিষ্যদ্বয়ের কথা তাঁর মনে পড়ল। ঐ ধাবমান বন্য জন্তু ও বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান সরিসৃপদের সম্পর্কে তারা কতই শঙ্কিত হয়ে উঠত! ক্রমে ক্রমে বালানন্দ যতই অগ্রসর হন, অরণ্যের অংশ বিশেষও যেন ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় নির্ণয় করবার কোন উপায়ই নাই। অথচ, সন্ধ্যার পূর্বে তাঁকে এই অরণ্য অতিক্রম করতেই হবে। অগত্যা তাঁকে আরও দ্রুত পদচালনা করতে হল।

সহসা ভীষণ একটা গর্জনে সমগ্র বনভূমি যেন কেঁপে উঠল। এতক্ষণ কীট পতঙ্গের যে মিশ্র একটা একটানা সুর উঠেছিল, সেও স্তব্ধ হয়ে গেল। আবার সেইরূপ গর্জন, বালানন্দের মনে হলো—গর্জনের ধ্বনি যেন ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। সাধারণতঃ এ তর্জন বাঘ ছাড়া অপর কোন জন্তুর যে নয়, বালানন্দ সেটা অনুমান করলেন। তখন তিনি দণ্ডটি হাতে করে এক স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই সময় আবার সেই গর্জন, এবং এবারকার গর্জন যেন আরো গম্ভীর ও কর্ণবিদারী। সহসা সামনের দিকে তাকাতেই তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল; দেখলেন, বিরাটকায় একটা বাঘ ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি বড় বড় গাছের তলদেশে বসে ঐ ভাবে গর্জন করছে। বালানন্দজীও তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের দণ্ডটি মাটির উপর সবলে ঠুকে বাঘের জ্বলন্ত চোখদুটোর সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সংলগ্ন করলেন। বাঘটা এ অবস্থায় তার একবার হুঙ্কার করে যেই ভুমির উপর সশব্দে তার লাঙ্গুলটি আছড়াতে লাগল, অমনি সেই সময় গাছের উপর থেকে একটা বানর যেন পদস্খলিত হয়ে নীচে

পড়ে গেল। বাঘটাও বুঝি এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করছিল। বাঘের গর্জনে ত্রস্ত হয়ে বানরটা ভূপতিত হতেই বাঘটাও তার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মুখে করে পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপরে উপবিষ্ট বানরগুলো সমস্বরে আর্ত চীৎকার তুলে গাছের পর গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বাঘটার অনুসণে করে ধাবিত হলো। বালানন্দজী অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তাঁর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, নীচে বসে সগর্জনে উপরের কপিকুলকে ত্রস্ত করে আহার সংগ্রহ করাই ছিল বাঘটার উদ্দেশ্য। সেইজন্যই সে তাঁর মত দণ্ডধারী দৃঢ়চেতা নির্ভীক আগন্তুকটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। এ অবস্থায় বানরটার দুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বেদনা পেলেন, কিন্তু হতভাগ্য জীবটিকে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করবার তখন আর কোন উপায়ই ছিল না।

এর পর তিনি ভাবতে লাগলেন, কোন্ পথটি ধরে বনভূমি অতিক্রমের চেষ্টা করবেন? যে দিকে বাঘটা ছুটে গেছে, সে পথ যে বিপজ্জনক, হিংস্র জীবজন্তুর প্রাচুর্য্য সে দিকে, এটা অনুমান করেই, তিনি অন্য কোন পথের সন্ধান করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, বনপথে প্রবেশ করে অবধি বালানন্দজী নর্মদামায়ীকে স্মরণ করে, তাঁরই শরণাপন্ন হন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, দৈবী কৃপায় তিনি সকল বিপত্তি অতিক্রম করে নর্মদার পবিত্র সৈকতে উপস্থিত হতে পারবেন। সকাতরে তাঁকেই আহ্বান করছেন বালানন্দজী, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড সজারু তারই পাশ দিয়ে সেই গভীর বনের আর একটা দিক লক্ষ্য করে তীরের বেগে ছুটে চলে গেল। বালানন্দ আর কালবিলম্ব না করে, সেই সজারুটার অনুসরণ করে তারই গমন পথ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। তাঁর মনে হলো, এই ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ জন্তুটা তার সর্বাঙ্গের তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি সংযত করে যে দিকে অনায়াসে ধাবিত হলো, সেখানে কোন বিঘ্ন না ঘটাই সম্ভব এবং অভিষ্ট পথের সন্ধানও এদিকে মিলতে পারে।

দশ

বালানন্দজীর অনুমান বাস্তবে পরিণত হল। ধাবমান সজারুটির অনুগমন করে খানিকট এগিয়ে যেতেই ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজি-সমন্বিত নিবিড় অরণ্যের এক অংশ তাঁকে চমৎকৃত করল। এদিকের বন-সম্পদ ক্রমশঃ যেন দেউলে

হয়ে এসেছে; বড় বড় বৃক্ষগুলির দিগন্তবিসারী সে সমারোহ নেই, মাঝে মাঝে এক একটা পাথরের স্তূপ যেন নির্ভীক ভাবে মাথা তুলে বনানীর নৈরন্তর্যে বিঘ্নের সৃষ্টি করছে। স্থানে স্থানে কূর্মাকৃতি উর্বর ভূমি। কোনপ্রকার উদ্ভিদের সংস্পর্শও নেই। সম্ভবত, স্বাস্থ্যরক্ষা তথা বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত আহার্য প্রাপ্তির অভাবেই বনানীর অগ্রগতি এভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বহুক্ষণ ধরে বিবিধ বিঘ্নসঙ্কুল অরণ্যভূমি পর্যটনে বালানন্দজী শ্রান্ত হয়েছিলেন; এখানে এসেই একটা স্তূপের তলদেশে একখানা পাথরের উপর আশ্রয় নিলেন। হাতের দণ্ড ও কাঁধের ঝুলিঝোলাগুলি দুইপাশে রেখে প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবতে লাগলেন। মাত্র এক দণ্ডের পথ, তার পরেই কি গভীর মহাবনের সমারোহ, পদে পদে দারুণ বিঘ্ন, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা, অথচ অপরাংশে সেই বিরাট বিশাল অরণ্যানীর শোচনীয় অবস্থা। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বালানন্দজী ধ্যানমগ্ন হলেন—দৈহিক শান্তি, মানসিক অবসাদ, সারাদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একবার ধ্যানমগ্ন হলে সমাধিপ্রাপ্তির মত তাঁর অবস্থা হয়। তাঁকে তখন দেখলে স্বভাবতই মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, কোন জীবন্ত ব্যক্তি এমন নিশ্চল ভাবে দণ্ডের পর দণ্ড ধরে কি করে ধ্যানমগ্ন থাকেন। যখনই পথশ্রমজনিত ক্লান্তি অথবা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তিনি অনুভব করতেন, কোনও নিরাপদ স্থান বেছে নিয়ে সেইখানেই পরমাত্মাকে স্মরণ করে ধ্যানমগ্ন হতেন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অবস্থায় অতিবাহিত হয়। আবার ঠিক সময়েই যেন পরমাত্মাই কোন কিছু ঘটনাকে উপলক্ষ করে আবার তাঁকে সচেতন করে দেন। এমন ঘটনা বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

এদিনও বালানন্দ ধ্যানে বসেই গভীরভাবে সমাধিমগ্ন হলেন। পারিপার্শ্বিক শান্তি ও নিশ্চিন্ত পরিবেশ তাঁকে যেন অভয় দেয়; ক্ষুধা, বিশেষতঃ তৃষ্ণার প্রাচুর্যে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েই যেন আত্মশাসনের উৎসাহে পরমাত্মার চরণেই অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। অবিলম্বেই গভীর সমাধির অবস্থা। নিকটে কেউ নেই, সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিন স্থান, তেমনি নূতন পরিবেশ। সমাধি থেকে জাগ্রত করতে কেউ নেই। কিন্তু পরমাত্মার প্রতি একান্ত বিশ্বাসী তাপস তাঁর প্রতিই নির্ভর করে সমাধিমগ্ন হলেন। দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হতে থাকে, সূর্যকরোজ্জ্বল উর্দ্ধাকাশের দীপ্তি ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু সাধু বালানন্দের

হুঁস নেই। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতীত হল। এমন সময় ক্রোড়দেশে তুহিন শীতল একটা স্পর্শের সঙ্গে ভীষণ ভারক্রান্ত অবস্থা তাঁকে সচেতন করে দিল। সেই অবস্থায় উপলব্ধি করলেন, কে যেন কতগুলি বড় বড় তুষারের খণ্ড ক্রমাগত তাঁর ক্রোড়ের উপর গুটিকার মত গড়িয়ে দিচ্ছে। ধ্যানভঙ্গ হতেই নিমীলিত দু'টি চোখও খুলে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যে দৃশ্য তাঁর চোখের উপর সুস্পষ্ট হল, তাতে যে কোন অসমসাহসী বীর পুরুষও বিস্ময়াতঙ্কে বিহ্বল না হয়ে পারেন না।

বালানন্দজী নিষ্পলক নয়নে দেখলেন—দশ বারো হাত দীর্ঘ ও সেই অনুপাতে স্থূল এক ভীষণ অজগর তাঁর ক্রোড়ের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর সেই বিশাল দেহ নিয়ে পূর্বোক্ত মহাবন অভিমুখে চলেছে। শুধু নীরবে এইভাবে যাওয়া নয়, তার মুখের হিস্ হিস্ শব্দের সঙ্গে নিঃশ্বাসের শব্দ মিশে এমন একটা নৈকৃতিক ধ্বনির সৃষ্টি করেছে, তার সুর কানে প্রবিষ্ট হলেই আতঙ্কে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। স্থিরভাবে বসে সদ্যোজাগ্রত সাধু তাঁর ক্রোড়দেশ বাহিত সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য মহা সরীসৃপের ভীষণ সুন্দর গতিভঙ্গি দেখতে লাগলেন।

সর্পদেহের অর্দ্ধাংশ অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর দীর্ঘ দেহের নিম্নাঙ্গ অবলম্বন করে। যদি সাপটা জানতে পারত যে, কোন দুঃসাহসী মানুষ এই নির্জন স্থানে স্তূপের সংস্পর্শে প্রস্তরের মত অসাড় অবস্থায় ধ্যানমগ্ন, যদি মানুষটির মুখশ্রী সেই ভীষণ জীবটির জ্বলন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে ধরা পড়ত, তাহলে এতক্ষণ সাধুদেহ তার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মহাসমাধি লাভ করত। এখনো যদি জাগ্রত স্পর্শের প্রভাব এই দুর্দান্ত জীবটি কোন প্রকারে উপলব্ধি করে, তখনি বিসর্পিত লম্বমান দেহটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মুখব্যাদন করাও আশ্চর্য নয় এই মহা অজগর জাতীয় জীবটির পক্ষে। সর্পপ্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ সাধু এ অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসকেও বুঝি আয়ত্ত করে স্থিরভাবে বসে রইলেন। এই সময় তাঁর ইচ্ছা করছিল, এই দুর্লভদর্শন বিচিত্র অজগরটির সুচিত্রিত অপরূপ দেহটির উপর ধীরে ধীরে করস্পর্শে অঙ্গ সংবাহন করে সৌখ্যস্থাপনে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত তর্জন থেকে দারুণ একটা হিংসার আভাষ পেয়ে তাঁকে সেই প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত হতে হল।

অবশেষে অজগরের সংস্পর্শ থেকে তিনি পেলেন অব্যাহতি। সমস্ত দেহ

তখন সর্পদেহের তুহিন স্পর্শে যেন আড়ষ্ট। তথাপি, তিনি সেইভাবে বসে সাপটির অগ্রগতির ভঙ্গি দেখতে লাগলেন। ক্রমে দূরবর্তী বনমধ্যে অজগরটি অদৃশ্য হতেই বালানন্দও তাঁর দণ্ড ও ঝুলি, কমণ্ডলু নিয়ে উঠে পড়লেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থাদৃষ্টে বুঝলেন, অপরাহ্ন উপস্থিত। এই পথেই তাঁকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হতে হবে। দুর্গম বনানী মধ্যে যখন পথের সন্ধান পেয়েছেন, নর্মদামায়ীর ক্রোড়ের পরশও তিনি পাবেন, পাওয়া চাইই।

যেমন সঙ্কল্প, সঙ্গে সঙ্গে কার্যোদ্যম। আবার দ্রুতপদে চলল পরিক্রমা। তিনি যে পথে চলেছেন—নদীর অববাহিকা বলেই বুঝতে পারলেম। অর্থাৎ বর্ষায় নদীবক্ষে বন্যা এলে, এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়; অন্য সময় স্বাভাবিক অবস্থায় আকাশ-বন্যায় সমগ্র অঞ্চল জলময় হলে, সমস্ত জলরাশি স্রোতের বেগে নদীবক্ষে পড়ে তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। জমির উপর কান পেতে এবং পারিপার্শিক লক্ষণগুলি দেখে ক্ষিপ্ত্যপতেজমরুৎব্যোমে অভিজ্ঞ পর্যটক বালানন্দ সত্য উপলব্ধি করেন।

দিকদর্শন ও অনুভূক্তির প্রত্যক্ষ যন্ত্র-দেবতা সূর্যের অস্তিত্ব যতক্ষণ আকাশে প্রকাশ পায়, বালানন্দের পক্ষে সময়টির অবধারণ করা অনেকটা সহজ হয়। ক্রমে সেই সূর্য যন্ত্রিকাও আকাশ পথে অদৃশ্য হতে থাকে। বালানন্দ উদ্বিগ্নভাবে আরও দ্রুত পদচালনা করেন—সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁকে নদীকূলে উপনীত হতে হবে। অবগাহন স্নানের আনন্দ তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে আহ্বান করে।

কিন্তু আরও অনেকখানি পথ অতিক্রমের পর তিনি অন্তরে অন্তরে দারুণ পিপাসা অনুভব করে অস্থির হয়ে ওঠেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আর একবার এমনি তৃষ্ণার আগ্রহ তাঁকে ক্লিষ্ট করেছিল, তিনি তখন ধ্যানমগ্ন হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণে সেই তৃষ্ণা পুনরায় প্রকট হয়ে বালানন্দকেই আর্ত করে তুলেছে। তখনো সন্ধ্যার বিলম্ব আছে, সুতরাং জলপানে বাধা নেই; কিন্তু জল কোথায়? তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিক লক্ষ্য করে দেখেছেন—কোথাও কোন জলাশয়ের অস্তিত্বও নেই। অথচ তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, আর বেশী দূর নাই—তিনি যেন তার সত্তা উপলব্ধি করছেন, নর্মদামায়ীও যেন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে অভয় পাণি উদ্যত করে তাঁকে আহ্বান করছেন—ওরে ছেলে, আয়, আয়, আয়। আমি যে মায়ের স্নেহ দরদ নিয়ে তোর জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু পক্ষান্তরে নর্মদামায়ীর আবার এ কি অদ্ভুত মায়া। বালানন্দের পথপর্যটনে চির অভ্যস্ত অক্লান্ত দুটি পা যে ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে তাঁর চিত্তের প্রমত্ত আগ্রহকেও বাধা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে তৃষ্ণাও দুর্নিবার হয়ে উঠেছে, অথচ কোথাও জলের কোন নিদর্শনই পাওয়া যাচ্ছে না—আর্তকণ্ঠে একান্ত অশক্ত ও অশান্ত পদযুগলকে কোন রকমে বাধ্য করে তিনি এগিয়ে চলেছেন; এর পূর্বে তাঁর শক্তদেহ কোনদিন এভাবে ক্লিষ্ট বা বিকৃতি-ভাবাপন্ন হয় নি। নিজের প্রতি নিজেই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আরও দ্রুত পদচালনা করলেন। আরও খানিক পথ অতিক্রম করতেই সহসা নিকট-তম কোন স্থান থেকে পয়স্বিনী গাভীর 'হাম্বা'ধ্বনি তাঁর কর্ণে ধ্বনিত হল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি আরও দ্রুত এগিয়ে চললেন সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে। সহসা এক মাধুর্যময়ী দৃশ্য তাঁকে আশায় ও উল্লাসে বিহ্বল করে তুলল। সেই অবস্থায় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাতেই অদূরে বিভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি পরিচিত বৃক্ষ-বিটপীর ভিতর থেকে কয়েকখানি কুটিরের পর্ণচালা তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করল। তিনি বুঝলেন, কোন পল্লী-অঞ্চলের সান্নিধ্যেই তিনি এসে পড়েছেন। সামনেই মনুষ্য-গমনাগমনের পদচিহ্ন-গুলিও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সন্দিগ্ধভাবে ধীরে ধীরে সামনের পথ ধরে কিছুটা যেতেই নারীকণ্ঠে পরিচিত একটি ভজনের মধুর সুরধ্বনি তাঁকে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত করল। আপন মনেই প্রশ্ন উঠল—কে এখানে এমন মিষ্ট গলায় তুলসীদাসের মধুর ভজন গাইছেন! যেমন গান তেমনি কণ্ঠ। গানের সুর অনুসরণ করে কিছুদূর গিয়েই তিনি মুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। অদূরে কি অপরূপ দৃশ্য। পীতবসনা পরমা সুন্দরী এক তরুণী তাঁর সুমধুর কণ্ঠে গানের ঝঙ্কার তুলে পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ দোহন করছেন। অপরূপ দৃশ্য। তরুণীর কোমল করে আকর্ষিত দুগ্ধধারা সশব্দে দোহনা-পাত্রের দুগ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়ে সঙ্গতের মত তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত গানকে মনোজ্ঞ করে তুলছে যেন। বালানন্দ নীরবে গানখানি শুনতে লাগলেন। তরুণীকণ্ঠে তখন গানের ঝংকার উঠেছে—

জীয়া যো চাহে তো জীবকো রক্ষা করোরে,
ধন যো চাহে তো ধরমকো বাচাওরে।
নাচা যো চাহে তো নাচ গোবিন্দ আগে,

গাওয়া যো চাহে তো রামগুণ গাওরে।
ভাগা যো চাহে তো, ভাগে বুরা করমসে,
আয়া যে চাহে তো রাম শরণমে আওরে।

অর্থাৎ—দীর্ঘজীবী হতে চাও তো জীবহত্যা না করে জীবকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হও। ধনের প্রার্থী যদি হতে চাও তবে ধর্মবৃদ্ধি করতে চেষ্টা কর। নাচে আগ্রহ যদি থাকে তো গোবিন্দের সামনে নৃত্য কর। আর গানের ভক্ত হওতো রামচন্দ্রের গুনগান কর।' গায়িকার যেমন মধুর কণ্ঠ, তেমনি তাঁর রূপশ্রী—সর্বাঙ্গে যেন নবযৌবনের জোয়ার বহে চলেছে। বালানন্দ তাঁর তীব্র পিপাসার তাড়নাও বুঝি বিস্মৃত হয়ে সাগ্রহে সেই তরুণীর গানের মধ্যে নিমগ্ন হলেন।

দুগ্ধ দোহন শেষ হতেই তরুণীর গানের ঝংকারও থেমে গেল। বাছুরটি বন্ধনহীন অবস্থাতেই তরুণীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তিনি এই সময় তাকে সাদরে ডেকে বৎসমাতার কাছে সমর্পণ করে সস্নেহে বললেন: পিয়, পিয়, তোর ভাগ ঠিক আছে।

দুগ্ধপাত্র কক্ষে তুলে উঠতেই বালানন্দজীর সঙ্গে তরুণীর চোখোচোখি হল, ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়েই তরুণী রুক্ষস্বরে বলল: তুমিও তো দেখছি ভারী বেহায়া মানুষ, সাড়া শব্দ না দিয়ে চুরি করে আমার গান শুনে নিয়েছ।

নারীর সঙ্গে সংলাপে বালানন্দজী বরাবরই অপটু। এভাবে প্রশ্ন শুনে তিনি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেই মৃদু হেসে বললেন: চোরের মতন আমি গান শুনে হয়ত অপরাধ করেছি, কিন্তু এই গান শুনিয়ে দিয়ে গায়িকা শ্রোতাকে ধন্য করেছেন; এর জন্য যা কিছু পুন্য সবই তাঁর পরমাত্মাজীর ভাণ্ডারে জমা হয়েছে।

এ ধরণের কথা শুনে সন্তুষ্ট হবারই কথা, কিন্তু তরুণী কথাগুলি যেন গায়ে না মেখেই উগ্রকণ্ঠে বললেন: এঃ। চুপ রও। নিজের ত ভারি মুরদ, জোয়ান বয়সে ভিক্ষের ঝুলি সার, উনি আবার জাঁক করে আমার পরমাত্মাজীর ভাঁড়ার দেখাচ্ছেন। আসল মতলবখানা তোমার শুনি?

বালানন্দ এতক্ষণে যেন অকূলে কূল পেলেন। নারীকণ্ঠের শেষের কথাগুলির মধ্যে সহানুভূতির আভাষ পেয়ে তাঁর কক্ষস্থিত দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ডটিকে লক্ষ্য

ক'রে আসল মতলবটিই বলবেন : দীর্ঘপথ পর্যটন করে বড়ই ক্লান্ত হয়েছি, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটবার অবস্থা হয়েছিল, তোমার গানই সে অবস্থায় বাঁচিয়েছে। এখন আর্ত আত্মাকে তৃপ্ত করবার মতলবে কিছু দুধ ভিক্ষা চাইছি ; এখন—

আর বলতে হল না বালানন্দকে। তরুণীর মধুর কণ্ঠ থেকে যে স্বর নির্গত হল, কাংসপাত্রে লৌহদণ্ডের তীব্র আঘাত করলে যেমন ঝন্‌ঝন্ শব্দ ওঠে—তেমনি নিদারুণ কর্কশ। ঝাঁঝিয়ে সে বলে উঠল : ক্যা ? পহলে তো চোরী করকে গানা শুন রহে থে, আবি বোল্ রহে হ্যায়—দুধ দিজীয়ে ! জোয়ন আদমী হ্যায়—খাটকে খানে নেহি সকতা—

বালানন্দ নীরবে দুধওয়ালীর রূঢ় কথাগুলি শুনলেন, তার পর মৃদু হেসে বিনীতভাবে বললেন : মায়ী পেটমে আউর কুছ্ তো নেহি হ্যায় ? যব কুছ্ রহে গিয়া তব নিকাল দে।

কিন্তু বালানন্দের কথাগুলি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। দুধওয়ালী আরো উগ্রভাবে বাক বর্ষণ করতে লাগল। তার কটূক্তি থেকে প্রকাশ পেল যে, চুরি করে গান শোনার মত, তার কাছে কিছু দুধ পান করবার জন্যে ভিক্ষা চেয়ে আগন্তুক গলদের ওপর গলদ করেছে, শুধু তাই নয়—দুধওয়ালীকে তার জন্যে অপমানও করা হয়েছে।

বালানন্দ জীবনে কখনো এমন অদ্ভুত ধরণের নারীর সংস্পর্শে আসেন নি এবং তরুণী নারীর এমন মারমুখা মূর্তি এর আগে কখনো দেখেন নি, সুন্দর মুখ থেকে এমন কর্কশ কথাও কখনো শুনেছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

বাছুরটিকে ক্ষিপ্রহস্তে পুনরায় বেঁধে রেখে দুধওয়ালী মুখ তুলে তাকাতেই বালানন্দ তেমনি মৃদু হেসে মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : মায়ী, সব তো নিকাল গিয়া, ইস্‌কা বাদ কেয়া করেগী ?

দুধওয়ালীও তার সুন্দর মুখখানা আরক্ত ও বিকৃত করে তর্জনের সুরে বলে উঠল : আভি তোমারি শিরমে পাথর মারেঙ্গী।

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর দৃষ্টিতে বালানন্দের পানে একটিবার চেয়েই সে একরকম সবেগে ছুটে সন্নিহিত একটা ক্ষুদ্র পর্ণকুটির মধ্যে প্রবেশ করল। বালানন্দ বুঝলেন যে, মায়ী যে ভাবে মারমুখা হয়ে কুটিরে সেঁধুলেন, নিশ্চয়ই সেখান থেকে পাথর বা লাঠি সোঁটা নিয়ে এখনি তেড়ে আসবেন এবং

যে রকম এঁর কঠোর মেজাজ, হয়ত—তার তীব্র পরশ দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। সুতরাং তিনিও সভয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন।

যেতে যেতে বালানন্দজীর মনে হল, দুধওয়ালীর সঙ্গে এভাবে বাকবিতণ্ডার ফলে তাঁর সেই দুর্দমনীয় পিপাসার অবসান হয়েছে। একটা অপ্রীতিকর অবস্থার পর এইভাবে মানসিক শান্তি তাঁর কাছে মঙ্গলময়ী নর্মদামায়ীরই করুণা বলে মনে হল। ঠিক এই সময় উর্দ্ধাকাশে একটা সুমিষ্ট শব্দ শুনতে পেয়ে মুখখানা তুলে আকাশপানে তাকাতেই দেখলেন—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে একদল বলাকা সামনের দিকে পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে; এক যোগে পক্ষসঞ্চালনের সঙ্গে তাদের মধুর কুজন সঙ্গীতের মত তাঁর কানে যেন অমৃতবর্ষণ করতে লাগল। সেইসঙ্গে একটা শুভ সম্ভাবনায়ও তাঁর অন্তর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আকাশপথে বলাকাশ্রেণীর এভাবে শোভাযাত্রা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নিকটে নদীর সন্ধান পেলেই তারা এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সানন্দে ধাবিত হয়ে থাকে। বলাকাশ্রেণীকে পথ প্রদর্শক ভেবে বালানন্দজী তাদের উদ্দেশে নমস্কার করলেন; সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ স্বরে বলে উঠলেন: তোমাদের দেখে ঋষিবাক্য মনে পড়েছে- চরৈবতি, চরৈবতি, চলো, চলো; আমিও চলেছি তোমাদের পিছু পিছু।

এগারো

আকাশপথে বলাকাশ্রেণীর মিছিল অনুসরণ করে বালানন্দজীও দ্রুত পদচালনা করলেন। দুধওয়ালীর সঙ্গে সংলাপসূত্রে তার কটূক্তি বালানন্দের দারুণ পিপাসা নিবৃত্তির উপলক্ষ হয়। এজন্য তিনি পরমাত্মার উদ্দেশে দুধওয়ালীর কল্যাণ কামনা করলেন। সেই সঙ্গে মর্মব্যথাও জানালেন, তিনি যাকে অকাতরে প্রচুর রূপ ও স্বাস্থ্য দিয়েছেন, কি অপরাধে সে নারী স্বভাব-জাত করুণা ও মধুর স্বর থেকে বঞ্চিতা হয়েছে? এর আগে কোন নারীকে তিনি এমন কঠিন হতে দেখেন নি, তাই নারীর মমতাময়ী প্রকৃতির এই দৈন্য বা বৈষম্যভাব তাঁকে রীতিমত বেদনা দিল।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুধওয়ালী নারী তার স্বভাবসিদ্ধ বাহ্যিক রূঢ় প্রকৃতিটাই অসঙ্কোচে প্রকাশ করে বালানন্দকে বিভ্রান্ত করেছিল। তার সেই রুক্ষ কঠোর বাহ্য প্রকৃতির ভিতরে প্রচ্ছন্ন স্নেহকোমল অন্তরটি যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর

মত অফুরন্ত স্নেহে সর্বদাই ভরপুর, বালানন্দ তো সে সন্ধান পাননি। দুটি কজ্জলাক্ত আয়ত চোখের রহস্যাতুর দৃষ্টির বহ্নি বর্ষণ করে সেও তৎকালে সংঘর্ষটাকে চরমে তুলেই তার পর মধুরেণ সমাপয়েত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের অধিবাসী-সমাজে এ তরুণী দুধওয়ালী যেমন সুপরিচিতা, তার এই রহস্যময়ী প্রকৃতির বিচিত্র লীলাও তারা সকৌতুকে উপভোগ করতে অভ্যস্ত। বালানন্দজীর সমক্ষে তার বাহ্যিক কর্কশ প্রকৃতিটাই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু পরক্ষণেই পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল দৃশ্যটা উপভোগ করবার সুযোগ ঘটেনি তাঁর অদৃষ্টে।

'আভি তোমারি শিরমে পাথর মারেগি' কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলি বলতে বলতে দুধওয়ালী কৃত্রিম কোপকটাক্ষে বালানন্দের দিকে একটিবার চেয়েই দ্রুতবেগে সন্নিহিত একটা ক্ষুদ্র পর্ণশালায় প্রবেশ করে। তখন বালানন্দ ভাবেন যে, ক্রুদ্ধা তরুণী বুঝি সত্য সত্যই পাথর বা কোন প্রহরণ আনবার জন্যই এভাবে এত দ্রুত চলে গেল। সে অবস্থায় তিনি নারীর হাতে আরো অধিক লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হন।

দুধওয়ালী কিন্তু দ্রুতবেগে পর্ণশালায় ছুটেছিল পাথর বা ডাণ্ডা আহরণের জন্য নয়—সাধু অতিথিকে দুধ দেবার জন্য একটা পাত্রের সন্ধানে। যেমন তেমন পাত্রে তো আর সাধু মানুষকে দুধ পান করতে দিতে পারে না। তেমন শুদ্ধ পাত্র খোঁজাখুঁজি করতে কিছু বিলম্ব হল। শেষে কালো পাথরের বড় বাটিটাই তার মনে ধরল। এই পাত্রে সে নর্মদামায়ীর পানি ভরে শিবের মাথায় ঢালে পাল-পার্বণের সময়। এখন এতে দুধ ভরে সাধু অতিথির হাতে দিতে বাধা নেই। এরপর ধুয়ে মেজে নিলেই হবে। সাধু অতিথি আর ঠাকুর দেবতায় কি তফাৎ আছে? ছোট ঘরখানির ভিতরেই কুণ্ডায় ভরা জল ছিল, সেই জলে অত বড় বাটিটা ভাল করে ধুয়ে নিল। তারপর কি ভেবে মুখের হাসিটুকু চেপে আবার পূর্বের মত রাগের ভাবটাই জোর করে মুখে ফুটিয়ে সাধুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কিন্তু কোথায় সাধু? পলকে মুখের ভাব বদলে গেল তার; সারা মুখে পড়ল বিষাদের গভীর একটা ছায়া। তার মুখের চড়া কথা শুনে সাধু কি তবে চলে গেল। হায়রে, দুধওয়ালীর ভিতরটা তার চোখে পড়ল না? তখন মাটির ওপর বসে পড়ে তার কি কান্না। বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের

এই খেয়ালী স্বভাবের জন্য নিজেকেই দুষতে থাকে, কপালে বার বার করাঘাত করে কান্নার সুরে বলে দুধ দুয়ে যখন দেখি অন্য দিনের চেয়ে বেশী হয়েছে, তখনি ভেবেছিলাম ভাল করে সাধুর সেবা করব, সাধু তখনও দুধ চান নি, তাই তো শক্ত হয়ে যা তা বলেছিলাম সাধুকে, কিন্তু সেগুলি কি আমার অন্তরের কথা? সাধুজী ভিতরটা না দেখেই চলে গেলেন? এখন আমি কি করি? কোথায় গেলে সাধুর নাগাল পাই?

হঠাৎ কি ভেবে সে সোজা হয়ে বসল। বাছুরটা তখনো বাঁধা আছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে খুলে দিতেই আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে সে মায়ের কাছে ছুটে গেল, মাও সহর্ষে বৎসের সর্বাঙ্গ জিভ দিয়ে অবমর্ষণ করতে লাগল। দুধওয়ালীও ব্যস্তভাবে বৎসমাতার জাব পাত্রে মিশ্র খাদ্য ও পান-পাত্র জলে পূর্ণ করে, সুপ্রসন্ন গোমাতার পিঠে স্নেহের পরশ দিয়ে বলল: জাব দিলাম, পানি দিলাম, খাও, বাচ্চাকে নিয়ে মৌজ কর মা-জী আমি সাধু মহারাজকে তোরই দেওয়া দুধ পিইয়ে আসি। হুঁশিয়ার, বাচ্চা যেন—

কিন্তু বাচ্চার ব্যাপারে বোধ হয় মনে ভরসা পেল না। তাই এমনভাবে তাকে দড়ি দিয়ে একটা খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখল, মায়ের বাঁট থেকে দুগ্ধ পানের সুযোগটি বজায় থাকে, অথচ মায়ের কাছ থেকে সরে দূরে গিয়ে মাকেই আবার অস্থির করতে না পারে। এই সব ব্যবস্থার পর দুধের কেঁড়েটি কাঁখে ও পাথরের বাটিটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল সাধুর সন্ধানে। সে জানে, সাধু-সন্ত এদিকে এলে গাঁয়ের মোহ কাটিয়ে নর্মদামায়ীর কিনারায় গিয়ে আস্তানা পাতেন সেইখানেই ধুনি জ্বালিয়ে জপ তপ করেন, তাঁরাই তো বলেন—মায়ীর এমনি মাহাত্ম্য যে, তাঁর পবিত্র পরশ পেলেই ইহ-জন্মের পাপ তাপ সব নষ্ট হয়, পরম আনন্দে দেহ মন ভরে ওঠে।

অরণ্য-প্রান্তবর্তী এই স্বল্প বসতির অঞ্চল থেকে নর্মদামায়ীর দূরত্ব খুব বেশী নয়, সায়াহ্নের কিছু পূর্বেই দূর থেকে নদীর বেলাভূমি দেখেই সেটা বুঝতে পারলেন বালানন্দ। এখন মনে হতে লাগল, কি শুভক্ষণেই প্রভাতের শোভা প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছিল আজ। যদিও এর আগে দুর্গম বনভূমি অতিক্রম করতে বহু বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে—জীবন-সঙ্কট অবস্থাও বারবার ঘনিয়ে এসেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে দিবাবসানে তাঁর পরমারাধ্যা মাতাজীর স্নেহের আকর্ষণেই ঠিক স্থানটিতে

এসে পড়েছেন। যেতে যেতে সহসা নদীর অববাহিকার আভাস পেয়েই, দ্রুতপদে সেই সিক্ত স্থানের উপর শায়িত অবস্থায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভাবার্দ্র স্বরে বললেন: মাগো, বর্ষাকাল হলে এখানেই তোমার পুণ্যবারি স্পর্শ করে উপকূলে আশ্রয় নিতাম। তোমার সে দিগন্তবিসারী বিরাট রূপ কল্পনা করে তোমার পুণ্য অববাহিকায় অবলুণ্ঠিত হয়ে ভাবছি, ধন্য ত হলাম, সেই সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে পরিক্রমার সঙ্কল্প পূর্ণ করবার নূতন শক্তিও পেলাম।*

নদীকূল থেকে অনেকখানি স্থান বর্ষাকালে নদীর জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় বলেই চিহ্নিত বিস্তীর্ণ অংশ নদীর অববাহিকা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। বালানন্দজী নিজের অভিজ্ঞতায় এ তথ্য জেনেই অববাহিকা-অংশ স্পর্শমাত্রই এইভাবে অদূরবর্তিনী নর্মদার প্রতি ভক্তি নিবেদন করলেন। এ-থেকেই তাঁর নর্মদামায়ার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকদিন পরে নদীতীরে উপস্থিত হয়ে বালুকাময় সৈকত থেকেই তিনি বিমুগ্ধ নেত্রে তার অপরূপ শোভা দেখতে লাগলেন। স্থানটি যেমন মনোরম, তেমনি শান্তিময় ও নির্জন। নর্মদা এখনও শান্ত, প্রসন্ন সলিলা। বর্ষাবসানে শরতের প্রশান্ত পরিবেশ—আকাশ, বাতাস, ভূমিজাত বৃক্ষরাজি, পুণ্য তটিনী নর্মদার জলরাশি -যেদিকে দৃষ্টি পড়ে, প্রতিটিই শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল। কিছুক্ষণ স্থির ভাবে সেই শুভ্র নম্র বালুকারাশির উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য উপভোগ করলেন বালানন্দ। অন্তঃপর তাঁর দণ্ড ঝুলি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু ও শুক স্থানে রেখে শিশুর মত সরল ও নির্মল ভাবে অপরিসীম একটা উল্লাসের আবেগে নদীর বারিরাশি লক্ষ্য করে ছুটলেন।

---

* আচার্য শঙ্কর, পরমভক্ত দবাব, সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতির গঙ্গা ভক্তি প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক কাহিনীর কথা প্রচারিত আছে। সাধু বালানন্দজীরও অদ্ভুত নর্মদা ভক্তি এবং নদীরূপা কল্যাণময়ী দেবীর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস সম্পর্কে দৈবী কৃপা প্রাপ্তি—পূর্বোক্ত সাধকদের অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়। বালানন্দজীও মহাপরিক্রমায় সিদ্ধিলাভের পর ভক্তবৃন্দ সকাশে সাধনালব্ধ পরম বাণী প্রচার কালে নর্মদামায়ীর প্রতি নিজের ভক্তি ও বিশ্বাস এবং পরিক্রমাশীল ভক্তদের একান্ত সঙ্কটে বিভ্রান্তিকর মূর্তি পরিগ্রহ করে দেবীরও সাহায্য দানের অনেক বিস্ময়কর কাহিনী বলতেন। তন্মধ্যে তাঁর নিজের পরিক্রমা-জীবনেও সেই সব অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হয়েছিল।

জলস্পর্শের সঙ্গে মাথায় ও সর্বাঙ্গে সিঞ্চন করে, সেইসঙ্গে বার বার কর্দমাক্ত তটদেশে দীর্ঘ জটাময় শিরটি ঠুকে ঠুকে ভক্তি নিবেদন করতে লাগলেন। বালক যেন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূরস্থানে গিয়েছিল মায়েরই প্রয়োজনে; এইমাত্র ফিরে এসেছেন; সম্মুখে জননী আনন্দময়ী মূর্তিতে বিরাজিতা। আকুল আগ্রহে পুত্র এসেছে জননীর চরণে লুটিয়ে পড়ে ভক্তি নিবেদন করে ধন্য হতে। এইভাবে প্রাথমিক বন্দনা করেও মনে যেন তৃপ্তি এলো না তাঁর। এতদিন পরে ছেলে এল ফিরে—মায়ের কোল জুড়ে না বসলে কি পরিপূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব হতে পারে। তথাপি পরমাগ্রহে মায়ের নামে জয়ধ্বনি তুলে স্নেহরাশির আধার স্বরূপ সুদূর প্রসারী স্নিগ্ধ বুকখানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কি আনন্দ, সেই সঙ্গে কি পরম তৃপ্তি। সারাদিনের ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহ অপরূপ এক আনন্দে ভরে গেল। অবগাহন স্নানান্তে নর্মদার বক্ষে থেকেই দেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ ও অন্যান্য প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে তীরে উঠলেন। সিক্ত কৌপিন পরিবর্তন করে নূতন কৌপিন পরে যেখানে তাঁর ঝুলি ও দণ্ড রেখেছিলেন পরমানন্দে আসন করে বসলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় মিলিয়ে গেছে—তার কথাও মনে নেই। আপন মনে গীতিভঙ্গিতে স্তোত্র পড়তে আরম্ভ করলেন:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
তদ্দূরে তদান্তিকে—
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

* * *

'আছেন লুকায়ে হৃদ্‌মাঝারে
দূর বলে ভাবিস্ না ভাই।
ডাকের মত ডাকলে পরে
তার এক ডাকেতেই সাড়া পাই॥

বালানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে চলে বাতাসের বুকে। কিছুটা তফাত থেকে সেই সুললিত মিষ্ট স্বর দুধওয়ালীর শ্রুতিস্পর্শ করে। আরো দ্রুত পদচালনা করে নিকটে এগিয়ে আসতেই সে দেখল—পলাতক সাধু সানন্দে চোখ বুজে গান ধরেছেন। দুধের কেঁড়েটা তৎক্ষণাৎ একখণ্ড পাথরের উপর

রেখে, পাথরের পাত্রটা হাতে করে সে বলল : বারে, সাধু মতলবিয়া।

তীব্র স্বরের ঝংকারে বালানন্দের গীতায়ন বিঘ্নিত হল। ভাবমগ্ন দুটি চোখের দৃষ্টি স্বরের দিকে নিবদ্ধ করতেই সচকিত হয়ে সহাস্যে বললেন : কি ব্যাপার ? পাথরের বাড়ি আমার মাথায় হানবার জন্য এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছ নাকি ? তোমার রাগ আর রোখ্ ত সাধারণ নয় দেখছি।

হাতের পাত্রটি বালানন্দের সামনে উঁচু করে দুধওয়ালী ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল : হাঁ, হাঁ, এমনি একটা কিছু খুঁজে পেতে আনবার জন্যই ডেরায় সেঁধিয়েছিলাম, তা—তোমার আর সবুর সইল না। যেমন চোরী করে আমার গানা শুনেছিলে, দুধ চেয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছিলে, তেমনি আমাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। কিন্তু তুমি ত দুধিয়া দুধউলিকে চেন না, তার চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে—এমন ঠাঁই দুনিয়ায় কোথাও নেই। দেখছ ত, সন্ধান করে ঠিক এসে কেমন ধরেছি ?

বালানন্দ স্মিতমুখে বললেন : সে ত দেখছি। কিন্তু ভাবছি, তোমার চেহারা মিষ্টি, দুধিয়া নামটিও মিষ্টি, কিন্তু মুখের বুলি এমন তিরিক্ষি কেন ?

কথাটা শুনেই দুধিয়ার মুখে চোখে যেন দামিনীর একটা ঝিলিক খেলিয়ে গেল ; সেইসঙ্গে হাসিরও একটি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়ে বলল : তুমি সাধু সন্ন্যেসী মানুষ, বুলির মর্ম কি বুঝবে বল ? এই বুলিই তো দুধওয়ালী দুধিয়ার হাতিয়ার ঠাকুরজী।

মৃদু হেসে বালানন্দ বললেন : কিন্তু ভারি শক্ত হাতিয়ার, আমার তো জানা আছে। আর দেখ, হাতিয়ার কাছে থাকলেই রাগটাও চেপে বসে। এই দেখ না—পালিয়ে এসেও তোমার হাতিয়ারকে ঠেকাতে পারিনি, এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছ। এখন আমার কথা শোন দুধিয়া, তোমার ঐ বুলিকে সামলাও। সাধুসন্তরাও এই বুলি সম্বন্ধে কি বলেছেন শোন—

বুলি বোল্ অমূল্য হ্যায় যো জানে বোল।
বুলি য়্যায়সা বলিয়ে, কাটে অন্দর তোল॥

দুধিয়া বলল : বারে সাধু, তুমি বুঝি আমাকে এই কটোরা হাতে হাজির দেখেই ভেবেছ, তোমার মাথায় এর বাড়ি মারতে এসেছি ! আ, আমার পোড়া কপাল।

দিব্যি মিষ্টি ভঙ্গি ও সুরে কথাগুলি বলেই তর তর করে সে উপরের

দিকে উঠে গিয়ে দুধের কেঁড়েটা কাঁকালে করে সাধুর সামনে এসেই নামিয়ে রেখে বলল : দেখছ সাধুজী—সেই দুধ। গানা গেয়ে দুইছিলাম, তুমি পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলে, তার পর বললে পিয়াশ লেগেছে, দুধ দাও। আমার ঐ স্বভাব বাদ সাধল সাধু, যে বুলি বলেছিনু—দিলের নয়, মুখের। তোমার মাথায় পাথর মারব বলে একটা লোটার সন্ধানে একছুটে ঘরে যাই, খুঁজেপেতে শেষে পাথরের এই কটোরা নিয়ে বেরিয়ে আসি ; নর্মদার জল এতে রাখি। তুমি সাধু মানুষ, যেমন তেমন লোটায় তো তোমাকে দুধ দিতে পারি না। এর পর এসে দেখি, ও মা। তুমি উধাও। বুঝনু, পাথর পাছে মাথায় পড়ে—সেই ভয়ে পালিয়েছ। কি কষ্ট যে হল দিলে, দিলের ঠাকুর বই কে বুঝবে। রাগ হল নিজের ওপর, এই বুলির ওপর। তুমি সত্য বলেছ সাধু—হিসেব করে, ওজন করে, মুখের বুলি বলতে হয়। আমার কসুর আমি বুঝিছি সাধু। আমি এখন থেকে আমার জীভকে—সামলে হিসেব করেই বুলি বলব।

বালানন্দও প্রসন্ন হয়ে বললেন : ব্যস্, ব্যস্, সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন থেকে তোমার রসনাকে সামলে বুলি ছেড়ো দুধিয়া। সাধুসন্ত কি বলেছেন শোন—

ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরিবী বেশ।
শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি তুমহারা দেশ॥

দুধিয়া এই দোঁহাটি শুনতে শুনতেই বালানন্দের পায়ের গোড়ায় নত হয়ে ঢিপ করে একটিবার মাথাটি ঠুকল। তারপরই তাড়াতাড়ি মাথা তুলে উঠে হাতের লোটাটি দুধের কেঁড়ের কাছে রেখে হাত দুখানি জোড় করে কোমল স্বরে বলল : হুকুম হোক সাধুজী, দুধ ঢালি এই কটোরায়, খুশি মনে পান কর তুমি।

বালানন্দ হো হো করে হেসে বললেন : তুমি ত দেখছি অদ্ভুত মেয়ে দুধিয়া, আমাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে গাঁ ছেড়ে এতদূরে এসেছ।

দুধিয়া চোখে মুখে অভিমানের ভঙ্গি ও গম্ভীর স্বরে আব্দারের ভাব ফুটিয়ে বলল : আনব না। তুমি কি বুঝবে আমার কষ্টের কথা—দুধ চাইতে মুখনাড়া দিয়ে যা বলেছিনু, সে যদি দিলের আপন কথা হত, তাহলে কি এত কষ্ট পাই ? এখন দুধিয়ার সব কষ্টের অবসান কর, অবসান কর গোঁসাই।

এক নিঃশ্বাসে দুখিয়া কথাগুলো বলেই কেঁড়ে থেকে দুধ ঢেলে কটোরায় ভরল, তারপর দুধভরতি সেই প্রকাণ্ড কটোরাটির নিচের দিকটা দুহাতে ধরে মিনতির স্বরে বলল: নাও সাধুজী, পান কর।

বিচিত্র প্রকৃতির এই গ্রাম্যভাবাপন্না মেয়েটির মনের প্রচ্ছন্ন ভাবধারার সন্ধান পেলেন মানবদরদী বালানন্দজী। আর কোন কথা বা কোনরূপ আপত্তি না তুলেই তিনি দুগ্ধপূর্ণ পাত্রটি তার হাত থেকে নিয়ে প্রসন্ন চিত্তে পান করতে লাগলেন। দুখিয়ার নির্নিমেষ দৃষ্টি এখন সাধুর মুখে নিবদ্ধ; তার ব্যাকুল অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটি এতক্ষণে পূর্ণতার আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

বারো

পাত্রটি নিঃশেষ করে বালানন্দ বললেন: হয়েছে তো? সত্যই আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছি। এখন বুঝতে পারছি, সে-সময় তোমাকে ভালো করে বুঝবার চেষ্টা না করে আমিই ভুল করেছিলাম। মুখের বচন তোমার ছুরির মতন ধারালো হলেও, দিলটি খুবই কোমল। নর্মদা-মায়ীর কাছে প্রার্থনা করি—তাঁর কৃপায় তোমার রসনাও এমনি কোমল হোক, তুমি যেন তাকে আয়ত্ত করতে পার।

দুখিয়া বলল: মায়ী আমাকে কৃপা করেছে ঠাকুরজী। তাঁর কৃপা না হোলে কি তোমাকে দুধ খাওয়াবার কিসমৎ আমার হয়!

বলতে বলতে বালানন্দের হাত থেকে শূন্য পাত্রটি নিয়েই সবেগে নদীর কিনারা লক্ষ্য করে ছুটল। সেখানে পাত্রটি ধুয়ে মেজে তাড়াতাড়ি উপরে এসে দুধের কেঁড়ে থেকে পুনরায় পরমোৎসাহে দুধ ঢালতে লাগল।

বালানন্দ তার উদ্দেশ্যটি বুঝেই বাধা দিলেন: ওকি, আবার দুধ ঢালছ যে।

হাতের কাজ করতে করতে ভ্রূভঙ্গি করে দুখিয়া বলল: কেন ঢালছি, সে কি মালুম হোচ্ছে না?

কথার সঙ্গেই পূর্ণপাত্রটি পূর্ববৎ বালানন্দের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দুখিয়া বলল: এই নাও।

নেবার উৎসাহ না দেখিয়ে বালানন্দ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং একটু

বিরক্তভাবেই বললেন : নিজের খেয়ালেই কাজ করে চলেছ, আমার খেয়ালের দিকে হুঁস নেই। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এ দুধ ঢেলে রাখ।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দুখিয়া : বারে ঠাকুরজী। খুব তো খেয়ালওয়ালা মানুষ তুমি দেখছি। সারাদিন খাওয়া হয়নি তোমার, সাঁঝের পর খাবার সময় ; নসিবে যখন পরমাত্মাজী খাবার জিনিষ মিলিয়ে দিয়েছে, খেতেই হবে। এ খেয়াল তোমার না থাকলেও আমার আছে। খাও জলদি।

সেই অবস্থায় বালানন্দ মনে মনে ভাবেন, বন্যা নারীরা সামান্য একটু আস্কারা পেলেই এমনি বে-পরোয়া হোয়েই ওঠে। তিনি একটু শক্ত হয়েই কথাটাকে ঈষৎ তিক্ত করে বললেন : তুমি আমাকে ঠাওরেছ কি ? আমরা ব্রহ্মচারী মানুষ, বেশী কথা ভালবাসি না, দিল্লাগীরও কোন তোয়াক্কা রাখি না। আমার যেটুকু খাবার প্রয়োজন ছিল, আগেই হাত বাড়িয়ে নিয়েছি, আর নেবার ইচ্ছা নেই। ও দুধ তুমিই খেয়ে ফেল।

দুখিয়ার দীর্ঘায়ত দুটি চোখ বুঝি জলে উঠল, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও উত্তপ্ত হয়ে নির্গত হলো : একথা বলতে তোমার দিলে সরম এল না ঠাকুরজী ? আমি দুধ খাব বলেই কি গাঁও থেকে নর্মদামায়ীর কিনারায় ছুটে এসেছি সাধুর সন্ধানে ? তোমার মত সাধুর সামনে বসে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে এই কটোরার দুধ খাব। ছো। ছো। এখন ভালো চাও তো চুক্ চুক্ করে খেয়ে ফেলো, তা' না'হলে মায়েরা বাচ্চাকে যেমন করে দুধ খাওয়ায় জোর করে, আমাকেও তেমনি শক্ত হ'তে হবে।

এভাবে ধমকি দিয়েই দুখিয়া দুধভরা পাত্রটি আরো এগিয়ে একেবারে বালানন্দজীর মুখের কাছে নিয়ে গেল। বালানন্দ অনুভব করলেন যে, অবস্থাটা তখন এমনি দাঁড়িয়েছে—এরপর দুধের পাত্রটি বালানন্দের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করবার দুশ্চেষ্টাও মেয়েটার পক্ষে বিচিত্র নয়।

নিরুপায় হয়ে বালানন্দকে তখন এই দুরন্ত ভক্তের উপরোধটি পালন করবার জন্য পুনরায় তাঁর পূর্বাসনে বসেই দুখিয়ার এ আবদারও রক্ষা করতে হলো। এ-ভাবে দুগ্ধ পানের সঙ্গে শৈশবে মায়ের শাসনের কথা মনে পড়ল তাঁর - ছেলের আপত্তি সত্বেও মায়ের শাসন যেভাবে আপত্তি খণ্ডন করে নিজের জিদ রক্ষা করে। পানান্তে পাত্রটি দুখিয়ার সামনে মাটির উপরে রাখতে যাচ্ছিলেন বালানন্দ, খপ করে তাঁর হাত থেকে পাত্রটি নিয়েই সে

পূর্বের মত পুনরায় নদীর জলের দিকে ছুটে গেল এবং ধুয়ে মেজে জল ভরে উপরে উঠে এল।

বালানন্দ বললেন: জল ভরে আনলে কেন, কেঁড়েটা কিনারার দিকে নিয়ে গিয়ে বাকি দুধটুকু খেয়ে ফেললেই পারতে।

দুধিয়ার ঝাঁজ তখনও নিঃশেষ হয় নি, একটু খর স্বরেই বলল: পানি এনেছি তোমার তরে—হাত মুখ ধুয়ে নাও। আর, দুধ এখনো অনেক আছে, বল ত আবো দিই। তোমার সঙ্গে আরো অনেক সাধুসন্ত আছে ভেবে আমি কেঁড়ে ভরে দুধ এনেছি যে। আর, এ কথাও মনে রেখো,—সাধু-সজ্জনকে খাওয়াবো বলেই ও-দুধ এনেছি, নিজের খাবার তরে নয়।

বালানন্দ বললেন: তুমি যখন নদীতে যাও, কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে হাত মুখ আমি ধুয়েছি। কিন্তু তুমি যে এটা মনে করে জল এনেছ, সেজন্য তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। এখন কথা হোচ্ছে, তুমি যখন এ দুধ খাবে না, আমারও প্রয়োজন হবে না, তখন দুধটার গতি কি হবে?

দুধিয়া বলল: তোমার জন্যেই যখন এ দুধ বয়ে এনেছি—তোমারই ভোগে যাতে লাগে, তার ফিকির বের করতে হবে বৈকি। দুধওয়ালি দুধিয়াকে তুমি ঠাওরেছ কি?

বলতে বলতে হাতের পাত্রটি দুধের কেঁড়ের কাছে রেখে সন্ধানী দৃষ্টিতে আশে পাশে তাকাতে লাগল দুধিয়া।

বালানন্দ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: কি দেখছ অমন করে—খুঁজছ কিছু?

দুধিয়া গম্ভীর মুখে বলল: হুঁ। আখা বানিয়ে আগ লাগিয়ে তার ওপরে বসিয়ে দেব কেঁড়েশুদ্ধ দুধ। ফুটে ফুটে ঘন হয়ে এলে ক্ষীর করে লাড্ডু বানিয়ে তোমার ঝুলিতে পাতায় মুড়ে রাখব, কাল পরশু দুটো দিন খাওয়া চলবে।

দুধিয়ার কথা ও ব্যবস্থা শুনে বালানন্দ স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। সম্পর্কহীন অনাত্মীয়—পর ভিন্ন তিনি এর কে। নিজ প্রয়োজনেই প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। ভুল উপলব্ধি বশতঃ আতিথ্যসৎকারে বাধা পড়ে। সেই বাধার অবসান ঘটিয়েও সে অতিথিকে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত নয়—

পূর্বের ত্রুটি কি ভাবে পূরণ করে তৃপ্তি পাবে, সেই চিন্তায় এখন অস্থির হয়ে উঠেছে।

পুনরায় প্রশ্ন শুনে এ-অবস্থায় বালানন্দ চমকে উঠলেন: তোমার ঐ ঝুলিতে আগুন জ্বালাবার পাথর আছে ঠাকুর?

পাথর। ও,—চকমকি পাথরের কথা জিজ্ঞাসা করছে দুখিয়া। পথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে এখন আগুন জ্বালতে চায় সে; সেই অগ্নিতে দুধ জ্বাল দেবে, ক্ষীর করে লাড্ডু পাকাবে—বালানন্দের জন্য।

সহানুভূতির স্বরে বালানন্দ বললেন: কি দরকার দুখিয়া ও-সব হাঙ্গামা করবার? তার চেয়ে দুধের কেঁড়ে নিয়ে তুমি বাড়ী ফিরে যাও। রাত বেশী হলে এর পর যেতে ভয় পাবে, হয়ত আমাকেই সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। তাই বলছি, আর রাত ক'র না, আমার কথা শোনো—

বালানন্দের কথায় বাধা দিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে দুখিয়া বলল: আমার কথা কি তোমার কানে ঢোকেনি ঠাকুর আগুন করবার পাথর আছে তোমার ঝুলিতে? থাকে ত চটপট বার করে দাও, নৈলে আমাকেই খুঁজে নিতে হবে! আগে তো দুধের গতি করি, তার পরে বাড়ী।

বালানন্দ এবার সুবোধ বালকের মত দুখিয়ার প্রার্থিত বস্তু—অগ্নি উৎপাদক পাথর দুটি তাঁর ঝুলির ভিতর থেকে বের করে দিলেন। চিলের মতন ছোঁ মেরে সেই দুটি বস্তু নিয়ে দুখিয়া নীচের দিকে নেমে গেল।

বালানন্দ ভাবলেন, দুধওয়ালীর যে ইচ্ছা হয়েছে করুক সে। তিনি এখন তাঁর কাজ নিয়ে পড়বেন। সুতরাং আর কোন দিকে না চেয়েই তিনি ধ্যানে বসলেন। ওদিকে দুখিয়া কতকগুলি কাঠ-পাতা ও কয়েকখণ্ড পাথর সংগ্রহ করে এনে নদী-সৈকতে সেগুলির সাহায্যে উনান তৈরী করে দুধ জ্বালের ব্যবস্থা করে ফেলল। চকমকি পাথর-দুটো ঠুকে ঠুকে উনানে প্রদত্ত শুকনো কাঠপাতায় তার আগুন সংযোগ করে দিল। তিনটি পাথরের মাথায় লোহার কেঁড়েটি বসালো। দেখতে দেখতে উনানটি দিব্য সক্রিয় হয়ে উঠল।

দুখিয়ার মনে আনন্দ ধরে না। তার দুধ আজ সত্যই সার্থক হবে। সাধু মহারাজের ভোগে লাগবে, তার জীবনও আজ সার্থক। জ্বলন্ত উনানের সামনে বসে কাঠ পাতাগুলি তার মধ্যে যোগান দিতে লাগল দুখিয়া, আগুনের আভায় তার গৌরবর্ণ মুখখানা অপরূপ হয়ে উঠল।

হঠাৎ হাওয়ায় হাওয়ায় মিলিত কণ্ঠের একটা ভজনের সুর ভেসে এলো এই নদী সৈকতে। দুধিয়া সচকিত ভাবে একবার স্থানটির পরিবেশ দেখে নিল। তার চোখে পড়ল, একটু উপরে ঠাকুরের ধ্যানমগ্ন দিব্য মুর্তি। ক্ষণকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর হাত দু'খানা কাপড়ের আঁচলে মুছে নিয়ে যুক্ত করে নীরবে প্রণাম জানাল তাঁকে।

আবার গানের সেই সুর এবং সেই সঙ্গে স্বরবদ্ধ কথাগুলিও স্পষ্টভাবে শোনা গেল :

'সর্‌ব রোগ কা ঔষধ নাম।
কলিয়ান রূপ মঙ্গল গুণগাম॥
পবিত্র পবিত্র পবিত্র পুনীত।
নাম জপৈ, নানক মন প্রীত॥'

দুধিয়া ভাবে কে গান করে এই অসময়ে? শব্দ অনুভব করে সে বুঝতে পারল—একের কণ্ঠ নয়, একাধিক কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি নদী-সৈকতে রীতিমত প্রতিধ্বনি তুলেছে। তাব সামনে পাক-পাত্রের দুধ অগ্নির উত্তাপ পেয়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে অদূবে ধ্যানমগ্ন ঠাকুবটিবও নির্ব্বিকল্প অবস্থা, উপরে চলার পথে আগন্তুক পান্থ-কণ্ঠেব দোঁহা গানের ধ্বনি ক্রমশ: নিকটতর হচ্ছে। এখন সে কি করবে? যদি আগন্তুকরা এখানেই আসে। পরিব্রাজকদের পক্ষে এই তো একান্ত বাঞ্ছিত স্থান। আর তার চুল্লীর আগুনের আকর্ষণী শক্তিও তো উপেক্ষা করবার মত নয়। এই ঠাকুবটির মতই অপর ঠাকুরদের শুভাগমন যদি হয় এখানে, দুধিয়াকে দেখে তারা কি ঠাওরাবে? এমন অসময়ে নদীর কিনারায় বসে ঠাকুরের সেবার জন্য দুধ জ্বালে বসিয়ে ক্ষীর তৈরী করছে সে, শুনে যদি···

এর পর আর চিন্তাও যোগায় না দুধিয়ার মগজে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় একটু আগে ঠাকুবের কথাগুলি : 'কি দরকার দুধিয়া ও-সব হাঙ্গামা করবার তার চেয়ে বাড়ী যাও, আমার কথা শোনো।' কিন্তু দুধিয়া তো ঠাকুরের কথা শোনে নি। এখন তার মনে হয়, সাধু-সন্ত ঠাকুর - এঁরা দরকার বুঝেই কথা বলেন, এঁদের কথা ঠেলতে নেই। কিন্তু সে তো অন্যায় কিছু করে নি। নর্মদামায়ী তো সবই জানেন—তার দিলের অন্দরটাও। তবুও যদি কেউ তাকে দোষ দেয়, ঠাকুরের ওপর

মনে মনে ভজন করে ওঠে সুখিয়া, সে কি তাহলে চুপ করেই থাকবে— চুলী থেকে তখন জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তার মুখে ছেঁকা দেবে না।

ওদিকে দূর থেকে অগ্নির আলোকে নদীসৈকতে নারীমূর্তি লক্ষ্য করে আগন্তুকদ্বয়ও আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে এসে একসঙ্গে উভয়েই বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে, তাদের স্বর পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকটা তফাৎ থেকেই এরা চুল্লীর অগ্নির প্রখর আলোকে নারীমুখের শোভা লক্ষ্য করেছিল, এবং সেই সূত্রে নদীতীরে এভাবে নিঃসঙ্গ রূপসী নারীর উপস্থিতিতে বিস্ময়াপন্ন হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। এই সময় উপরে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন পরিচিত সাধু মূর্তির দিকে এদের দৃষ্টি পড়তেই দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা উল্লাস উভয়কে একসঙ্গে চমৎকৃত করল। তাদের মনে হল, কে যেন তাদের দু'জনকেই অন্ধকারের দারুণ ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার করে উজ্জ্বল একটা আলোর মাঝখানে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ক্ষণকাল নীরবে ও নিঃশব্দে এখানকার পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে সনকজী ও জংলীবাবা পরস্পর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে অপরিচিতা নারীমূর্তিটিকে নির্দেশ করে জানতে চাইল—এ কি কাণ্ড ?

প্রশ্নটা উভয়েই একই সঙ্গে করল নীরবে অর্থাত্মক ভঙ্গিতে।

চাপা গলায় সনক বলল : নর্মদার কিনারায় গুরুজীকে পাবার কথা যা বলেছিলাম, ঠিক মিলে গেছে। কিন্তু ঐ 'মায়িজী' মানুষটি'কে দেখে যে অবাক হয়ে গেছি। কখনো তো এভাবে চুলী জ্বেলে কোনো মেয়েকে রান্না করতে দেখি নি।

জংলীবাবা বলল : তাইত, কাণ্ড দেখে যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ছি। আমরা সঙ্গ ছাড়া হোতেই গুরুজী শেষে শিষ্যা যোগাড় করে নিয়েছেন। তাও যেমন তেমন নয়—পরীর মত রূপসী।

মনে মনে কি ভেবে সনক বলল : আগে জানা দরকার ব্যাপারটা কি— তারপর ওসব কথা। গুরুজী তো ধ্যানে বসেছেন দেখছি। তাহলে বরং চল চুপি চুপি দু'জনে আচমকা দু' পাশ থেকে ঐ মায়িজীকেই জিজ্ঞাসা করা যাবে।

জংলীবাবা বলল : মন্দ নয় একথা—তাই চলো। কিন্তু খুব সাবধানে— হঠাৎ গিয়ে চমকে দেওয়া চাই।

দুধিয়া তখন পাত্রে ফুটন্ত দুধের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ক্রমাগতই কাঠি দিচ্ছিল। একটা বেলগাছের কাঁচা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পাথরে ঘষে দুধ জ্বাল দেবার কাঠি তৈরী করে নিয়েছিল দুধিয়া। সেই কাঠি দিয়ে দুধ ঘন করছিল; সেই দিকেই ছিল তার লক্ষ্য।

সনক ও জংলীবাবা এই সুযোগে আস্তে আস্তে নীচু হোয়ে মাটি ধরে ধরে পিছন দিয়ে দুধিয়ার দু' পাশে জেঁকে ব'সে মুখ দু'খানা বিকৃত করে একসঙ্গে নাকি সুরে বলে উঠল: ভুঁখা হুঁ—ভুঁখা হুঁ।

এ অবস্থায় মেয়ে তো দূরের কথা, সাহসী পুরুষেরই ভয় পাবার কথা। দুধিয়াও অবিশ্যি প্রথমে চমকে ওঠে; কিন্তু পরক্ষণে আগন্তুকদ্বয়ের কৃত্রিম বিকৃত মুখ দু'খানা এক নজরে দেখেই ঝাঁ করে চুল্লী থেকে জ্বলন্ত একখানা কাঠ টেনে নিয়ে দ্বিমূর্তির দিকে তুলে ধরলো। অমনি দুই বীরপুরুষ সভয়ে পিছিয়ে পড়ে জোড়হাতে মাপ চাইতে লাগল: মাপ কীজিয়ে মায়িজী—মাপ কীজিয়ে।

দুধিয়া তখন জ্বলন্ত কাঠখানি যথাস্থানে রেখে ভ্রূভঙ্গি করে বলল: বাহারে ফন্দীবাজ। সাধু সেজে দিল্লাগী করতে সরম লাগে নি? কি মতলব নিয়ে এখানে এসেছ শুনি?

সনক বলল: গুরুজীর সঙ্গে ভেট করতে এসেছি আমরা। উনি এখন সমাধিতে আছেন, তোমাকে এখানে দেখেই মনে চমক লাগে।

চোখ দুটো পুনরায় পাকিয়ে দুধিয়া সনকের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: চমক লাগল কেন- দুধিয়ার রূপ আর যৌবন দেখে?

দাঁতে জিভটা চেপে সনক বলল: উঁহুঁ—তা কেন। আমরা সাধু সন্ন্যাসী, মেয়ে মাত্রকেই মায়ের জাত মনে করি। চমকাবার কারণ হোচ্ছে – গুরুজী যেখানে আসন পাতেন, কোন মেয়ে কখনো সেখানে আমল পায় নি।

একটু হেসে দুধিয়া বলল: আর এই মেয়েটাই সেখানে জেঁকে বসে গেছে দেখে বুঝি ভাবলে, গুরুজী ভ্রষ্ট হোয়ে গেছেন—এই তো?

জংলীবাবা এতক্ষণ চুপ করে এদের সংলাপ শুনছিল, এই সময় ঝাঁ করে বলল: তার চেয়ে বলেই ফেল না মায়ী, গুরুজীর কৃপা কেমন করে পেয়েছ? উনি তো কোন স্ত্রীলোককে আস্তানায় থাকতে দেন না। তুমি কি করে স্থান পেলে এখানে?

পাত্র-পাত্রের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে দুখিয়া শ্লেষের সুরেই জংলীবাবার কথাটার উত্তর দিল : নর্মদামায়ীর কিনারায় স্থানের অভাব আছে নাকি—যে একথা জিজ্ঞাসা করছ ? আর, গুরুজী তো রাহী মানুষ, আজ এখানে—কাল ওখানে ; ওঁর আবার আস্তানা কোথায় -সবাই এখানে স্থান পেতে পারে।

জংলীবাবাও একটু খোঁচা দিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল : তাহলে বলতো মাজী—নর্মদামায়ীর কিনারায় কত জায়গাই ত পড়ে আছে, তুমিই বা এই স্থানটিতে এসে জমে গেছ কেন ? বলতে চাও বুঝি—কোনও মতলব তোমার এখানে নেই !

দুধে এ সময় ঘন ঘন কাঠি দিতে দিতেই আড় চোখে বক্তাকে একবার দেখে নিল দুখিয়া, তারপর তেমনি তীক্ষ্ণস্বরেই বলল : আমার কাজ দেখে বুঝতে পারছ না মতলবখানা কি ? ঠাকুরজীর তরে মেওয়া পাকাচ্ছি লাড্ডু বানাবার তরে।

উভয় সাধুই সবিস্ময়ে একসঙ্গে বলে উঠল : লাড্ডু ?

দুখিয়াও উভয়ের দিকে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত দৃষ্টির একটা ঝলক দিয়ে বলল : অন্ধ নাকি, দেখছ না - দুধ ঘন করছি। এ থেকেই লাড্ডু বানিয়ে ঠাকুরজীকে দেব, তাহলেই আমার ছুটি।

মেয়েটির রূপের জলুস অপরূপ হোলেও, মুখের কথায় পরুষ ভাব, ও তার সঙ্গে হেঁয়ালীর আলেপন কেমন যেন কানে লাগে। এখানে গুরুজীর জন্য এভাবে কায়িক শ্রম, মনে শ্রদ্ধা, অথচ মুখে উগ্রতার রহস্যটি ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে উভয়েই নীরবে পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে থাকে।

আড়-চোখে এদের মুখভাব দেখে দুখিয়াও তার বুদ্ধির প্রখর আলোকে এদের অবস্থাটা জানবার চেষ্টা করে। পরিক্রমাকারী সাধু-সন্তরা এ-অঞ্চলে এলে দুখিয়া তাদের সন্ধান রেখে দুধ যোগান দেয়। এতেই তার তৃপ্তি। সংসারত্যাগী সাধু মহাত্মাদের সেবা কল্পে তার একমাত্র সম্বল পয়স্বিনী ধেনুর দুধটুকু উপলক্ষ স্বরূপ হলেই সে নিজেকে ধন্য ভাবে। কিন্তু এই সেবার সঙ্গে স্বার্থিক সম্বন্ধ না থাকলেও, দুখিয়া কিন্তু তার জিভকে সংযত করতে পারে না। যেন, দুধের সঙ্গে তার মুখের দু' চারটে চোখাচোখা কথাও যোগান না দিলে তার দেওয়াটাই বুঝি সার্থক হলো না মনে করে। এমনও হয়েছে, হয়তো মাসাধিককাল ধরে কোনও সাধু পরিব্রাজকের শুভাগমন হয় নি

এদিকে, অথচ দুখিয়াও সন্ধানী দৃষ্টিতে খবর রেখে চলেছে প্রতিদিন—কেউ এলেন কি না ; এবং না এলে তার অন্তর্বেদনা সে ভিন্ন আর কে জানবে ?

আজ তার অদৃষ্টে যেন সেই সুযোগ সুবিধার বন্যা এসে গেছে। এখন সে সুখী, সত্যই সুখী। কর্মলিপ্ত অবস্থায় মনে মনে এই সব কথাই আগাগোড়া ভাবতে থাকে দুখিয়া।

কিছুক্ষণ নীরবে নিজের মনে চিন্তা করে সহসা সে বেশ সহজ ভাবেই বলল : আমি বুঝতে পারছি তোমরা খুবই ভাবনায় পড়েছ, আমাকে এখানে দেখে। তাই আমি আজকের সব কথাই বলছি গো,—তোমরা শোনো, তাহলেই তোমাদের মনের সংশয় সব কেটে যাবে।

দুখিয়া গোড়া থেকে সব কথাই একটি একটি করে বলে যায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে পাক-পাত্রে তার হাতখানাও অবিরাম গতিতে চলতে থাকল। সেই দুগ্ধ দোহন থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরজীকে পান করানো এবং অবশিষ্ট প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধও তাঁর ভোগে লাগাবার জন্যই তাকে যে কাণ্ড করতে হয়েছে, সবই বলে ফেলে যেন সে শান্তি পেল।

দুধের প্রসঙ্গে জংলীবাবা বলে উঠল : যদি আর খানিক আগে এসে পড়তাম—

দুখিয়া সোৎসাহে জানাল : ঠাকুরজীর যখন চেলা তোমরা, তাঁর সঙ্গে তোমরাও তাহলে পেট ভরে খেতে। বেশ ত, ক্ষীর হতে আর বেশী দেরীও নেই। লাড্ডু পাকিয়ে রেখে যাব। তোমরা ঠাকুরজীর সঙ্গে দু তিন দিন ধরে খাবে।

সনক বলল : আর, আজ কি শুধু গল্প শুনেই ক্ষুধাকে ঠেকিয়ে রাখব মায়ী ?

জংলীবাবাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : ক্ষীরে বোধ হয় পাক ধরে এসেছে - কি গন্ধই না বেরিয়েছে।

মৃদু হেসে দুখিয়া বলল : তা ব'লে দেবতার ভোগের আগে প্রসাদ মিলবে না। ঠাকুরজীকে ভোগ দিয়ে তারপর চেলাদের কথা। হ্যাঁ তবে বলে রাখছি, হতাশ হবার ভয় নেই।

সনক বলল : সে ত' জানা কথা—অন্নপূর্ণা মায়ী যখন পাকপাত্র নিয়ে বসেছেন।

দুখিয়া এই সময় পাকপাত্রটি উনান থেকে নামিয়ে নিয়ে কাঠি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল : থালা বা বড়সড় পাত্র কিছু আছে, তাহলে এটা ঢেলে ফেলি, লাড্ডু তৈরী করতে সুবিধা হবে।

জংলীবাবা বলল : আছে বৈকি। সন্ন্যাসী মানুষ হলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা যখন ছাড়তে পারিনি, তখন রুটির আটা মাখবার জন্য পরাত, চাটু আর লোটা সঙ্গে রাখতে হয় বৈকি।

উপরের দিকে – বালানন্দ যেখানে আসন পেতে বসেছিলেন, তারই কাছে এরা নিজেদের ঝুলি রেখেছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝুলি থেকে বেশ বড়সড় লোহার একখানা পরাত বের করে এনে দুধিয়ার সামনে রাখল। দুধিয়াও পাত্রের পদার্থটুকু সমস্তই প্রশস্ত পরাতের উপর ঢেলে দিল। একটু ঠাণ্ডা হলেই লাড্ডু পাকাবে।

এই অবস্থায় পরিক্রমা সম্বন্ধে কথা চলল। দুধিয়ার বড় আগ্রহ, ভালো করে শোনে – সাধুরা কেমন করে এই দারুণ কষ্টকর পরিক্রমায় ব্রতী থাকেন বছরের পর বছর ধরে। সহসা সে জিজ্ঞাসা করল : তোমরাও তো অনেক বন পাহাড় ভেঙে কত জায়গা ঘুরেছ, সে সব কথা বলবে আমাকে ? আমার শুনতে খুব ইচ্ছা হয়।

সনক ও জংলীবাবা দুজনেই জানাল যে, তাদের পরিক্রমা খুব সাধারণ ব্যাপার—তবে গুরুজীর সঙ্গে যে সব পরিক্রমা করেছ, সেগুলো বরং বলবার মত। এমন ঘটনাও অনেক ঘটেছে—প্রাণ নিয়ে টানাটানি কাণ্ড ; কিন্তু গুরুজীর জন্যেই উদ্ধার পেয়েছিল তারা।

শুনেই দুধিয়া ধরে বসল : আমাকে তাহলে বল, আমি শুনব। ঠাকুরজীর কথা যখন, শুনে নিশ্চয়ই আনন্দ পাব।

তখন সনক ও জংলী দুজনেই ভাগাভাগি করে বলতে লাগল—বালানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকে তাঁর সঙ্গে নানা দুর্গম স্থান পরিক্রমার বড় বড় ঘটনাগুলোর রোমাঞ্চকর গল্প। দু'হাতে লাড়ু তৈরী করতে করতে দুধিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শুনতে থাকে, সেই সঙ্গে ; ঠাকুরজীর প্রতি তার বিশ্বাস ও ভক্তি আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। তার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, ঠাকুরজী তাঁর অদ্ভুত তপোবলে বনের যত হিংস্র পশু, বিষধর সাপ প্রভৃতিকে যাদু করে রাখেন, তাঁর সামনে তাদের কোন জারিজুরি খাটে না।

ঠাকুরজীর সঙ্গে এদের পরিক্রমার গল্প শেষ হলে দুধিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা, ঠাকুরজী কেমন করে সিদ্ধ হন—তিনি যে সব জায়গা ঘুরেছেন, তার গল্প বলেছেন ? তোমরা শুনেছ ?

উভয়েই জানালেন যে, তাঁরা শুনেছেন—গুরুজী উপনয়নের পরই দণ্ডীঘর থেকে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেই থেকেই তাঁর পরিক্রমা চলেছে।

দুধিয়া বলল : বা রে চেলা লোক! ঠাকুরজীর সঙ্গে মেলামেশা করছ, সাথে সাথে ঘুরছ, আর কিছুই তাঁর কাছে জেনে নাও নি? আচ্ছা, সমাধি ভাঙলেই আমি ঠাকুরজীকে লাড্ডু খাইয়ে সব কিছু জেনে নেব।

জংলীবাবা বললেন : সত্যিই আমাদের জানা উচিত ছিল। নিজে থেকেই তিনি কিছু কিছু বলেছিলেন; কিন্তু আমরা এমনি বোকা ছিলুম যে, কিছুই আদায় করে নিতে পারি নি। দেখ মায়ী, তুমি যদি পার—সে সব কথা ওঁর মুখ থেকে বের করে নিতে!

সনক বলল : আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিনে মায়ী, গোয়ালার মেয়ে তুমি, দুধ আর গাই নিয়ে তোমার কারবার, তুমি সাধু সন্তদের সঙ্গে মিশলে কি করে? আর এই-যে ধ্যান, সমাধি, পরিক্রমা—এসব শিখলে কোথা থেকে?

দুধিয়া বলল : শোননি—সহবৎ বলে একটা কথা আছে? আমি যে ছোটকাল থেকে সাধু সন্তদের সঙ্গে মেলামেশা করে আসছি। তাই না, ওসব কথা শিখিছি। আর, ঠাকুরজী আমার উপরে যে প্রসন্ন হয়েছেন, সে আমারই হিম্মতের জোরে। জানো, তিনি যখন বলেন—দুধ খাবো না আমি, তখন আমাকেও শক্ত হয়ে বলতে হয়েছিল—তাহলে মায়ী যেমন করে বাচ্ছাকে দুধ খিলায়, তেমনি করে তোমাকেও খাওয়াব আমি ঠাকুরজী। ব্যস, ঠাকুরজীও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শোননি, সবাই শক্তের ভক্ত—ঠাকুর দেবতা পর্য্যন্ত।

ইতিমধ্যে বালানন্দের সমাধি ভঙ্গ হলে দুধিয়াই সবার আগে আনন্দে করতালি দিয়ে বলে উঠল : ঠাকুরজীর জয় হোক। চোখ মেলে দেখ ঠাকুর— তোমার দু'দুটো জবর গোছের সাবেক শিষ্য এসে হাজির—ঠিক যেন 'মাণিক জোড়'। আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। এখন দেখ ঠাকুরজী বিলকুল দুধ ক্ষীর হয়ে গেছে, তা থেকে কত লাড্ডু বানিয়েছি। আগে দুটো খাও তো—

এক নিশ্বাসে সব কথাগুলি বলে মনটাকে হাল্কা করে ফেলে দুধিয়া। সনক ও জংলীবাবা এই সময় এগিয়ে গিয়ে বালানন্দকে অভিবাদন করে বলে যে,

তাদের আর শহরের রাজবাড়িতে যাওয়া হয় নি। বনের মধ্যে তারা পথ হারিয়ে ফেলে দারুণ সঙ্কটে পড়েছিল ; গুরুজী সাথে না থাকায় কি মুস্কিলই তাদের ঘিরেছিল। শেষকালে নর্মদামায়ীই কৃপা করে কোলের কাছে টেনে আনেন—এখানে এসেই যেন আবার হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছে। গুরুজীকে ছেড়ে আর কোথাও তারা যাচ্ছে না।

তাদের কথা শুনে এবং দু' একটি প্রশ্ন করে বালানন্দ জানতে পারেন যে, সারাদিন তারা অভুক্ত আছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি স্মিতমুখে দুধিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন : দেখছ তো মায়ীর কি বিচিত্র লীলা! তুমি তখন দেদার দুধ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলে, সবটুকু আমার পেটে ঢেলে দিয়ে পেটটাকে জয়ঢাক করে তুলতে। এখন দেখ, দু' দুটো অভুক্ত সাধুকে মায়ী টেনে এনেছেন তোমার সেই দুধকে সার্থক করতে।

দুধিয়া তৎক্ষণাৎ সহাস্যে উত্তর করল : কিন্তু ঠাকুরজী, সবটুকু দুধই যে ক্ষীর হয়ে গেছে। তারপর সেই ক্ষীর ভেঙে কত লাড়ু পাকিয়েছি দেখ। এখন তুমি তো আগে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ করে দাও।

বালানন্দ এরই মধ্যে দুধিয়াকে ভালো করেই চিনেছেন। জানেন দুধিয়ার কথা না রাখলে এখনি সে খণ্ড প্রলয় বাধিয়ে বসবে। তখন তাঁকে তাড়াতাড়ি দুটি লাড়ু নিতে হল এবং মুখে দিয়ে বললেন : সত্যই দুধিয়া, এ যেন অমৃত খেলাম। এখন এই দুই উপবাসী ভক্তকে তৃপ্ত কর, নিজেও প্রসাদ নাও।

দুধিয়া তখন আবদারের সুরে বলল : কথা তোমার রাখব ঠাকুরজী। কিন্তু তুমিও কথা দাও – যখন থেকে তুমি ঘর গৃহস্থালী ছেড়ে সাধু হয়েছ, তখন থেকে তুমি যেদিন যেখানে গেছ, যে সব কাণ্ড দেখেছ, যে যে বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত পার হয়েছ—সব শোনাবে এই দুধিয়া দুধওয়ালীকে। আর, যদি রাজী না হও, সারারাত ধরে তোমাকে লাড্ডু খেতে হবে আমাদের চোখের সামনে বসে।

বালানন্দ হেসে বললেন : খাসা ব্যবস্থা তোমার দুধিয়া। বেশ, তোমার আবদারই রাখব আমি—সারা রাত ধরে আমি গল্পই বলব। সেই রাত্রে পুণ্যতোয়া রেবার তীরে দুটী কৌতূহলী শ্রোতা ও একমাত্র শ্রোত্রীকে উপলক্ষ করে বসে গেল গল্পের এক অপূর্ব আসর। তার কাহিনীও আর এক বিচিত্র গল্প।